সিনেমা সিনেমা

ডি. এম. লাইব্রেরী / কলকাতা—৭০০ ০০৬

প্রথম সংস্করণ / মাঘ, ১৩৬৬

কপিরাইট: / উমা পত্রী

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ / পূর্ণেন্দু পত্রী

প্রকাশক
আশিস্ গোপাল মজুমদার
ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, বিধান সরণী, কলকাতা-৬

মুদ্রাকর
কমলা সরকার
বীনাপাণি প্রেস,
১৯, কৃষ্ণদাস পাল লেন কলকাতা-৬

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়কে

সিনেমা যার কাছে স্বপ্ন নয়,

যার সারাজীবনের স্বপ্নে সিনেমা

দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে সিনেমা সম্পর্কে যা কিছু লিখেছি, তা থেকে খুচরো রচনা আর নিজের ছবি সম্পর্কে প্রবন্ধগুলো বাদ দিয়ে বাকি রচনার সংকলন এটি। বিভিন্ন সময়ে দেশ, আনন্দবাজার, কৃত্তিবাস, আনন্দলোক, ধনধান্যে, মহানগর, দক্ষিনীবার্তা ইত্যাদি পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল এগুলো। কিছু কিছু রচনা গ্রন্থভুক্তির সময় ঈষৎ সংশোধিত।

সিনেমা সম্বন্ধে আমার এই প্রথম বই বেরোনোর পিছনে উৎসাহ এবং কৃতিত্ব যে নবীন যুবকের, তিনি প্রকাশক আশিস্ গোপাল মজুমদার।

যথেষ্ট যত্ন নেওয়া সত্ত্বেও অনিচ্ছাকৃত কিছু ত্রুটি রয়ে গেছে ছাপায়। বিশেষ করে বানানে। পাঠকের সহৃদয়তায় এ-বই দ্বিতীয় সংস্করণের মুখ দেখার সুযোগ পেলে অবশ্যই আরো যত্নবান হওয়া যাবে ভুল-ত্রুটির সংশোধনে।

এ বই-এর প্রায় সমস্ত রচনার জন্যেই কিছু কিছু দুর্লভ বই-পত্র দিয়ে দীর্ঘকাল ধরে সাহায্য ও সহযোগিতা করে আসছেন সিনে সেণ্ট্রাল এবং ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি। উভয় সংগঠনকেই প্রকাশ্যে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

নির্দেশিকা রচনা করে দিয়েছেন সুনীল দাস। তার প্রতিও আমার কৃতজ্ঞতা।

পূর্ণেন্দু পত্রী

সংজ্ঞা

কী ঘটবে জানি না

প্রশ্নকর্তা গদার। উত্তরদাতা আন্তোনিওনি। একদা এইরকম এক সাক্ষাৎকারের শেষে গদারের উক্তি—

"আমি একটা ফিল্ম করব। প্রথম দৃশ্যে দেখতে পাবেন একটা লোক আণবিক মেঘ পেরিয়ে অন্যদিকে বেরিয়ে আসছে। এই লোকটি হল এডি কনস্টান্টিন। তারপরে কী ঘটবে জানি না।"

তারপরে কী ঘটবে জানি না, চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে এ এক অনিবার্য এবং অনতিক্রম্য সত্য। তারপরে কী ঘটবে না জেনেই পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক সৃষ্টিশীল পরিচালকই, তাঁর বুকের মধ্যে এখুনি যে তীব্র উজ্জ্বল ও দুর্বার বাসনা অবিরাম ঘণ্টাধ্বনির মত বেজে চলেছে, তাতেই নিমগ্ন হন। যা ঘটে ঘটুক। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কী ঘটে।

চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রতি পদক্ষেপেই এই কী ঘটবে জানি না-র হাতছানি। প্রতি মুহূর্তে অনিশ্চয়তা, অভাবিত বাধা বিঘ্ন ও বিপত্তি। গতকালের সুনিশ্চিত স্থির সংকল্পগুলো পরবর্তী দিনে সংশয় কিংবা সংকটে টলোমলো। কাল যেখানে ফুলের গাছ আজ সেখানে বেড়া। ডিঙিয়ে যেতে হবে। এই ডিঙিয়ে যাওয়ার মুখে অনির্বচনীয় কিছু আবিষ্কৃত হয়ে পড়ে হঠাৎ। এমন কিছু ঘটে যা আগে জানা ছিল না ঘটবে বলে।

চিত্রকর ছবি আঁকছেন। আঁকা শেষ হলেই তিনি বুঝতে পারেন কেমন হল ছবিটি। লেখক লিখছেন। লেখা শেষ হলেই তিনি অনুমান করতে পারবেন, তাঁর পরিকল্পনা বা প্রত্যাশা কতটা সার্থক হল বা হল না। গানের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার।

ফিল্ম তোলার বেলায় ব্যাপারটা ভিন্ন। কারণ যে কোন একটা ছবির শুরু থেকে শেষের মধ্যে অনেকগুলো ধারাবাহিক স্তর। একটা পেরোলেই আরেকটা। এবং প্রত্যেকটি স্তরের মাঝখানে অদ্ভুত এক অনিশ্চয়তাবোধ, এবং উদ্বেগ। কী ঘটবে জানি না।

গল্প বাছা হল। উদ্বেগ। চিত্রনাট্যটা কেমন হবে? চিত্রনাট্য শেষ। উদ্বেগ। কারা ফিনান্স করবেন ছবিটাকে? কেমন তাদের মর্জি বা রুচি? কতখানি অনুগত থাকার সুযোগ দেবেন চিত্রনাট্যের প্রতি ইত্যাদি চিন্তা। ধরা যাক প্রযোজক মিলে গেল মনের মতই। তখন উদ্বেগ, ঠিক মত শিল্পী, ঠিক মত লোকেশন জোগাড় করা যাবে কিনা। সে সবই হল। এবং শুরু হল দৃশ্য-গ্রহণের কাজ।

শুটিং-এর প্রত্যেকটা দিনের প্রত্যেক মুহূর্ত উদ্বেগে ভরা। এবং প্রতি মুহূর্তে কোন না কোন অঘটনের জন্যে প্রস্তুত থাকা। শুটিংএর মুহূর্তে প্রতিনিয়তই খান খান হয়ে যায় যা কিছু পূর্ব-ভাবনা, যা কিছু সাজানো-গোছানো চিন্তা।

বেলা বয়ে যায়। এদিকে একজন বিশিষ্ট শিল্পী অনুপস্থিত। অথচ এখুনি শট্ নিতে হবে। শুটিং-এর নির্ধারিত পরিকল্পনা বদলে গেল। ক্যামেরা ঘুরে তাকালো অন্য দিকে, অপ্রধান কোন চরিত্র অথবা ঘটনার উপরে।

শিল্পী তো অনেক বড় কথা। আরও সামান্য কারণে অনেক রকমের রদ বদল ঘটে যায় শুটিং স্ক্রীপ্‌টে। ধরা যাক, আজ যে বিশেষ একটি দৃশ্য গ্রহণ করা হবে, পরিচালক তার জন্যে গতকালই হুকুম দিয়েছেন যে, আমার জুম লেন্‌স চাই। পরিচালক বহুদিন ধরে মনে মনে গড়ে তুলেছেন ঐ দৃশ্যের একটা সুনির্দিষ্ট চেহারা বা ছক বা ছায়াময় ছবি। কিন্তু শুটিং-এর দিন তিনি ঐ বিশেষ জুম লেন্‌সটি পেলেন না। তা সত্ত্বেও দৃশ্যটি অবশ্যই চিত্রায়িত হল। তবে আগের ছকে নয়। নতুন ছাঁদে। এটা ভাল হল, না মন্দ হল, কে জানে। হয়তো জুম ব্যবহার করলে অনেক বেশী এফেকটিভ হত। হয়তো জুম চার্জ না করার ফলেই অনেক বেশী সরলতা এল। কিন্তু এল কি

এল না এটা এখুনি জানা যাবে না। যে নেগেটিভে দৃশ্যটি গৃহীত, সেটি ডেভেলাপ হবে, পজিটিভে ছাপা হবে। তারপর ওই দৃশ্যটিকে এডিট করে জোড়া হবে তার আগের ও পরের দৃশ্যের সঙ্গে। তখনই একটা আন্দাজ মিলবে কী ঘটেছে অথবা কী ঘটেনি-র। সুলিখিত, সুচিন্তিত, সুপরিকল্পিত চিত্রনাট্য সত্ত্বেও শুটিং-এর মুহূর্তে কত যে আকস্মিক বিপর্যয় ঘটে যায় তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন নীচের কথাগুলো। কথক বর্তমান বিশ্বের দিগ্বিজয়ী পরিচালক, বার্গম্যান।

"যখন কোনও ভাবনার ভ্রূণাকার সারাংশ থেকে আমি বুঝতে পারি এর মধ্যে একটা গোটা চলচ্চিত্র হয়ে ওঠার মত ক্ষমতা রয়েছে, তখন আমি তাকে নিয়ে গড়া-পেটার কাজে লাগি। তখনই আসে সবচেয়ে জটিল ও কঠিন দায়। ঐ ভাবনাকে একটি উপলব্ধিময় চিত্রনাট্যে উত্তীর্ণ করা, যার মধ্যে থাকবে ঐ ভাবনার ছন্দ, মেজাজ, পরিবেশ, ঘনীভূত আবেগ, দৃশ্য-পর্যায়, বর্ণের বৈচিত্র্য এবং শব্দ ও বাক্যের ঝঙ্কার।

এটা প্রায় একটা অসাধ্য কর্ম।

চিত্রনাট্যে একজন লোক সংলাপ লিখতে পারে। কিন্তু সেই সংলাপের দুটি লাইনের মাঝখানে যে ছন্দ ও গতি তা কেমন ভাবে উচ্চারিত হবে, খুব প্র্যাকটিক্যাল কারণেই তা চিত্রনাট্যে অনুক্ত থাকে। ঐ জাতীয় নির্দেশবহুল চিত্রনাট্য প্রায় অপাঠ্য।

আমার চিত্রনাট্যে আমি লোকেশন, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং পরিবেশ সম্বন্ধে সহজে বোধগম্য, এমন ইঙ্গিতই দিয়ে থাকি। কিন্তু তার সার্থকতা নির্ভর করে আমার রচনাশক্তি এবং পাঠকের রস-গ্রাহিতার উপর। এ সম্বন্ধে সব রকম ভবিষ্যৎবাণীই অচল।

এর পর আসে আসল বিষয়। অর্থাৎ আমি বলছি মন্‌তাজের কথা। একটা ছবির সঙ্গে আরেকটা ছবির ছন্দোবন্ধনের কথা। যে ত্রিমাত্রিক ছন্দ না থাকলে একটা ছবি হয়ে দাঁড়ায় কারখানায় তৈরী একটা মৃত বস্তু মাত্র। এখানে আগে থেকে কোন সুনির্দিষ্ট সংকেত আমি দিতে পারি না, পারি না ছবির গতি সম্বন্ধে কোন সুনিশ্চিত ধারণার যোগান দিতে। অথচ যা একান্ত ভাবে প্রয়োজন ছবির বিষয়বস্তুকে একটা ঐক্যসূত্রে বাঁধবার জন্যে।

একটা ছবি যে-যে কারণে নিশ্বাস-প্রশ্বাসে প্রাণময় ও জীবন্ত হয়ে

ওঠে, আগে থেকে তার পদ্ধতি নির্দেশ করা আমার পক্ষে একান্তভাবে অসম্ভব।

কখনো কখনো আমি একটা কথা ভেবেছি। এক জাতীয় নোটেশানের কথা। কাগজে লিখে রাখবো। যা আমাকে মনে করিয়ে দেবে আমার কল্পনার যাবতীয় মেঘ ও রৌদ্রের খেলা। যা সুরক্ষিত করে রাখবে ছবির ভিতরকার কাঠামো সম্বন্ধে আমার যাবতীয় ধারণা।

কারণ আমি যখন স্টুডিও-র কৃত্রিম এবং ভয়াবহ পরিবেশের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াই; তখন আমার হাত এবং মাথা ব্যস্ত হয়ে পড়ে নানারকম তুচ্ছ এবং বিরক্তিকর খুঁটিনাটি ব্যাপারে। ছবি করার সঙ্গে সেগুলোও যুক্ত। তখন প্রচণ্ড চেষ্টা করে আমাকে মনে আনতে হয়, এই দৃশ্যটাকে আমি সর্বপ্রথম কীভাবে ভেবেছিলাম, দেখেছিলাম। অথবা মনে করতে হয় চার সপ্তাহ আগের তোলা এক দৃশ্যের সঙ্গে আজকের এই দৃশ্যের যোগসূত্র ঠিক কোন্‌খানে এবং কতটুকু।

যদি নানান রকম সংকেতের সহায্যে আমি নিজের ভাবনাগুলোকে প্রকাশ করতে পারতাম, তাহলে এসব সমস্যাকে দূর করা যেত। আমি কাজ করতে পারতাম নিজের পূর্ণ প্রত্যয়ের ওপর ভর দিয়ে। ছবির সমগ্রতার সঙ্গে একটা ক্ষুদ্র দৃশ্যের যোগ যে-ছন্দে, যে-ছন্দের উপর ছবির আপন বেগে বয়ে চলা নির্ভর করছে, আমি ঠিক সেই ছন্দের উপরেই ছোঁয়াতাম আমার হাতের আঙুল।

এইসব কারণে ছবি তৈরির ক্ষেত্রে চিত্রনাট্য একটা অত্যন্ত অপরিণত, অক্ষম শিল্প-ভিত্তি।"

বার্গম্যানের আপন কথা এইখানেই শেষ নয়। এর পর চলচ্চিত্র এবং সাহিত্যের সম্পর্ক সম্বন্ধে তিনি উত্থাপন করেছেন তাঁর সন্দিগ্ধ প্রশ্ন বা সমস্যাগুলি। আমাদের উদ্ধৃতি এইখানেই শেষ। তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে আমরা এখানে এইটুকু সংবাদ সংগ্রহ করতে পারলাম যে একজন পরিণত প্রবীণ ও প্রজ্ঞাবান চলচ্চিত্রকারও তাঁর চিত্রগ্রহণের দিনগুলিতে কদাচ নিশ্চিত নন, এই মুহূর্তে কী ঘটবে।

কেবল তিনি জানেন তাঁর বক্তব্য কী। উদ্দেশ্য কী। তাঁর উপলব্ধি কোন্ বিশেষ আবেগকে প্রকাশের জন্যে আতুর ও উদ্বেল। অর্থাৎ তিনি জানেন তাঁকে কী ঘটাতে হবে।

বায়োগ্রাফ স্টুডিও ছেড়ে গ্রীফিথ যোগ দিয়েছেন মিউচুয়াল স্টুডিওতে। এখানে বছরখানেক ধরে যে-সব ছবির কাজে হাত লাগিয়েছেন, তাতে মন লাগে নি। মনের অভিনিবেশ অন্যত্র। টমাস ডিক্‌সনের 'দ্য ক্লানস্‌ম্যান' উপন্যাসটা যেন জবর দখল করে বসেছে তার সমগ্র সৃষ্টিশীলতার এলাকা। শয়নে-স্বপনে তারই চিত্ররূপ নিয়ে চিন্তা। এখুনি নামতে হবে ছবিটির কাজে। অথচ হাত শূন্য। একেবারে শূন্য নয়। যা আছে তাতে আরম্ভ হয়। সমাধা দুরুহ। কী ঘটবে জানি না। এবং এই না জেনেই তিনি ঝাঁপ দিলেন, নতুন ছবির কাজে, নিজের আলোড়িত ইচ্ছার প্রবল টানে। ছবি তৈরি করতে হলে পূর্বাহ্ণে একটা চিত্রনাট্য খাড়া করতে হয়। তাতে লেখা থাকে ছবিতে কী কী ঘটনা ঘটবে, কেমন ভাবে, এবং ঘটনাগুলিকে কী ভাবে ক্যামেরায় তোলা হবে, তারও সংকেত।

গ্রীফিথ চিত্রনাট্য বানালেন না। অথচ নেমে পডলেন ছবিতে। কারণ ছবিটা তাঁকে এখুনি করতে হবে। যে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় কাহিনীর বিন্যাস, তার যুদ্ধ-বিগ্রহ, তার সৈন্য-সামন্ত, তার প্রচণ্ড গতিময়তা এবং সংঘাতময় নাটকীয়তাকে চিত্রায়িত করার মত যান্ত্রিক কলাকৌশল বা যন্ত্রপাতি সেকালে দুর্লভ। তবুও গ্রীফিথ ঝাঁপ দিলেন ঐ কাহিনীর টানে। কী ঘটবে জানি না। যা ঘটে ঘটুক।

ছবি হল। নাম "দি বার্থ অব এ নেশন"। এবং সে-ছবি শুধু একটা-ছবিতেই শেষ হল না। সেই ছবি থেকেই বিশ্বে একটা স্বতন্ত্র, আকর্ষণীয় এবং সৃষ্টিধর্মী শিল্পরূপে চলচ্চিত্রের প্রথম স্মরণীয় প্রতিষ্ঠা।

এই যে এত বড একটা বৈপ্লবিক ঘটনা ঘটে গেল গ্রীফিথ কি তার সবটাই পূর্বাহ্ণে জানতেন? আর যদি না জানতেন তাহলে কী করেই বা পর্দায় প্রস্ফুটিত হল তাঁর মনের ইচ্ছাগুলো?

আমার মনে হয় শেষ পর্যন্ত কী ঘটবে তিনি তার সবটুকু নাও জানতে পারেন। কিন্তু যেটা তিনি সুগভীরভাবে জানতেন তা হল, কী ঘটাতে হবে। এই ক্ষেত্রে তাঁর উপলব্ধি এত উজ্জ্বল, তীব্র ও সুস্পষ্ট যে, চোখের কোণে স্বপ্নের মত একবার উঁকি দিয়েছে যে-দৃশ্য তাকে চিরস্থির রূপে চিত্রায়িত করতে কোনও বাধাই বাধা নয়। যা নেই, তার পরিপূরককে আবিষ্কার করে নেবার দুঃসাহসী উৎসাহও তখন

অফুরান। তাই তাঁর প্রয়োজন নেই ধরা-বাঁধা চিত্রনাট্যের হাত ধরে হাঁটা। হাতের নাগালে নাই বা রইলো চিত্রনাট্য। আদি-অন্ত গোটা ছবিটাই যে তাঁর মনের নাগালে।

কী ঘটবে জানি না, কিন্তু কী ঘটাতে হবে জানি, এই বোধের তাড়না থেকেই পৃথিবীর সৃষ্টিশীল পরিচালকেরা ক্রমাগত একটি বিশেষ শিল্পের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে ক্রমাগত এগিয়ে চলেছেন অন্তহীন মহিমার দিকে।

আবার গ্রীফিথের কথাতেই আসি।

চোখ রাঙিয়েছিল তাঁর পৃষ্ঠপোশকেরা। তাদের ওজন-কষা যুক্তি— 'দর্শক পয়সা দিয়ে আধখানা অভিনেতা দেখতে চায় না।' তবুও, পিছনের উদ্যত নিষেধ উপেক্ষা করে গ্রীফিথের ক্যামেরা ক্রমাগত এগিয়ে চলল অভিনেতার মুখের দিকে। দেখা যাক্, খোঁজা যাক, তল্লাসী চলুক আরো। কোনও কথা না বলেও কত বেশী কথা বলতে পারে মানুষ, পরীক্ষা হোক তার। দেখা যাক, মানুষের মুখের রেখার সামান্য স্পন্দনে, চোখের ভঙ্গীর সামান্যতম কম্পনে কতখানি উদ্ভাসিত হয় মানব-মনের গভীরতম, জটিলতম রহস্য।

নিশ্চয় একেবারে শুরুর দিনে এবং একেবারে সূচনার প্রথম মুহূর্তটিতে গ্রীফিথের কাছে 'ক্লোজ-আপ' ছিল নিছক একটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয়। কী ঘটবে তিনি জানতেন না। কিন্তু এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রথম মুহূর্তটির পিছনে ছিল দীর্ঘদিনের অস্থির অভিলাষ, নিয়মের বাইরে ছুটে গিয়ে নতুন কিছুকে অন্বেষণ করার, অবিষ্কার করার। কারণ, তিনি চেয়েছিলেন মঞ্চ-সুলভ নাটকীয়তার হাত থেকে চলচ্চিত্রের মুক্তি। চেয়েছিলেন, চলচ্চিত্র হোক সেই রকম এক সাবালক শিল্প যে কথা বলবে তার আপন ভাষায়, আপন ভঙ্গীতে।

অনেক পরের আর এক ইতিহাস। তুমুল বিক্রমে এগিয়ে চলেছে বিশ্বযুদ্ধ। ইতালির তখন মরণাপন্ন অবস্থা। জীবন-যাপন দুর্বহ। চলচ্চিত্র দিবাস্বপ্ন। ১৯৪৪ সালে মোট ষোলটা ছবি তৈরি হয়েছে ইতালিতে। এবং তার সবকটাই ফ্যাসিষ্ট অধিকৃত ভেনিসের স্কালেরা স্টুডিও থেকে। ফ্যাসিষ্ট বিরোধীরা তখন ফেরার। বনে জঙ্গলে লুকনো তাদের মাথা। শিল্পসৃষ্টির স্বপ্ন বা আকাঙ্খা পেটের মধ্যে।

১৯৪৪-এর শেষ দিকে। তখনো জার্মান সৈন্যেরা সদলবলে সরে যায় নি, অধিকৃত রোম ছেড়ে। সেই সময়, আত্মপ্রকাশের অস্থির গরজে, আত্মগোপনতার অপমানকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে রসোলিনি এগিয়ে এলেন ছবি করতে।

ছবি? কী দিয়ে ছবি বানাবেন? ফিল্ম কই? আসত জিনিসটাই তো দেশ থেকে গায়েব। তবুও রসোলিনি ছবি করবেন।

তারপর টাকা? সেখানেও তো শূন্য হাত চারদিকে। তবুও রসোলিনি ছবি করবেন।

আচ্ছা বেশ, কিন্তু ছবিটা তোলা হবে কোন স্টুডিওয়? স্টুডিও? স্টুডিও চাই না। ছবিটা তোলা হবে রাস্তায়-ঘাটে, শহরের সত্যিকারের বাড়ি-ঘরের ভিতরে, সত্যিকারের চরিত্রদের নিয়ে। ক্যামেরা কখনো লুকনো থাকবে গাড়ির ভিতরে, কখনো বাড়ির ছাদে। ছবিতে দু একজন থাকবেন যারা অভিনেতা। বাকী সবাই, একেবারে সাদা কথায়, সাধারণ মানুষ।

রসোলিনি ছবি করতে লাগলেন। আবর্জনার মত পড়ে থাকা কিছু বাতিল ফিল্ম নিয়ে শুরু হলো ছবি তোলা। ছবি তুলতে গিয়ে তীব্র ভাবে দেখা দিল অর্থের অভাব, যথেষ্ট সংখ্যক আলোর অভাব, কাঁচা ফিল্মের অভাব। যে-সব দৃশ্য তোলা হয় তাতে আলোর অভাবে দৃশ্যের নাটকীয় অবয়ব ফুটে উঠছে না। অর্থের অভাবে বেশ কয়েকবার ছবি তোলার কাজ বন্ধ হয়ে গেল। তবুও শেষ পর্যন্ত ছবিটা শেষ হল একদিন।

ছবির নাম "ওপেন সিটি"। ছবি বলতে ইতালীর মানুষ, পৃথিবীর মানুষ যা বোঝে, সে বিচারে ছবিটা কিছুই হয়নি, কিস্সু না। কোন দৃশ্য ভাল করে দেখা যায় না। যেটুকু দেখা যায় তার মধ্যে সাজানো গুছোনো পরিপাটির একান্তই অভাব। আসলে ছবিটার গড়নে কোনো নিয়ম-শৃঙ্খলার বালাই নেই।

তবুও একটা বিপ্লব ঘটে গেল। এর রাফ্‌নেস, এর ল্যাক অব ফিনিশ, অচিরাৎ রূপান্তরিত হলো ভার্চুতে। ছবিতে মূর্ত হয়ে উঠল একটা ট্রাজিক যুগের বাস্তব চেহারা। রসোলিনি বললেন—'দিস্ ইজ দ্য ওয়ে থিংস্ আর'।

এতগুলো "না"-এর পাঁচিল ডিঙিয়ে রসোলিনি যে শেষ পর্যন্ত উত্তরণের

আলোকজ্জ্বল প্রান্তে এসে পা ফেললেন তার মূলে কোন্‌টা আসল? আসল জিনিসটা চিত্রনাট্য নয়। ধার করে পাওয়া টাকা নয়। গাড়ীর আড়ালে লুকোনো ক্যামেরা নয়। বিনা আলোকে তোলা ধূসর দৃশ্যাবলী নয়।

আসল তাঁর হৃদয়ের বেদনা। তাঁর রক্তের ভিতরে সৃষ্টির কোলাহল অথবা কান্না। যে-যুগে তিনি তখন বাস করছিলেন, তার প্রাতিদিনের ধ্বংস, অগ্নিময় জ্বালা, এবং তার মৃত্যুহীন সাহসিকতাই রসোলিনিকে তিল তিল করে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল এক বেপোরোয়া আবেগে। তাঁর কাছে তখন সব চেয়ে শুদ্ধ, শুভ্র ও সুন্দরতম আকাঙ্ক্ষাটি ছিল একটা পরিচ্ছন্ন সুদৃশ্য সুখশ্রাব্য সুষমাময় চলচ্চিত্র নয়, ছিল নিজের কালের যন্ত্রণাবিদ্ধ মুহূর্তগুলোকে একটা চলচ্চিত্রের মাধ্যমে আর একবার সৃষ্টি করে নিজের কালের কাছে আয়নার মত তুলে ধরার সৎ ও বলিষ্ঠ বাসনা।

ঐ প্রবল-আকার বাসনাই তাঁর ছবির সর্বোত্তম ঐশ্বর্য ও গৌরব। এবং ঐ বাসনা-জাত আপাত-বিরস ছবিটি থেকেই বিশ্ব চলচ্চিত্রে 'নিও রিয়ালিজম' নামক যুগান্তরের সূচনা।

রসোলিনির উদ্যম এবং নিও-রিয়ালিজমের উৎপত্তি এই দুয়ের মাঝখানে আর এক প্রেরণাদায়ক প্রতিভা। তিনি জাভাতিনি। চলচ্চিত্রের কাহিনী এবং কাহিনী নির্মাণের স্টুডিও-ঘেঁষা নিয়ম-কানুনের কনভেনশনকে ভেঙে জাভাতিনি চেয়েছিলেন চলচ্চিত্রের গায়ে মাটির এবং ঘামের এবং পথের ধুলোর গন্ধ অর্থাৎ এক কথায় জীবনের ছোঁয়া লাগিয়ে দিতে। এই আকাঙ্খার আবেগে তাঁর আত্মাও ছিল নিয়ত কম্পমান।

রসোলিনির 'ওপেন সিটি'র চিত্রনাট্যকার তিনিই। আরো পরে, 'নিও রিয়ালিজম'কে চূড়ান্ত সার্থকতার স্তরে পৌঁছে দিতে, তিনি নেমে এসেছিলেন, প্রায় যেন মুক্তির অন্বেষণে ভ্রাম্যমাণ সন্ন্যাসীর মত, চিত্রনাট্যহীন, কোনরূপ পূর্ব-পরিকল্পনাহীন বিশ্ব-পরিক্রমায়।

১৯৫১-র এক অক্টোবরে ডে সিকা-কে লেখা তাঁর একটা চিঠির অংশ, যার ছত্রে ছত্রে জাভাতিনির তখনকার উদ্বেল আকাঙ্খার ডানার ঝাপটা—

প্রিয় ডে সিকা,

কয়েক মাস আগে তোমাকে জানিয়েছিলাম যে, আমার একটা ছবি

তৈরীর উদ্ভট পরিকল্পনা আছে। তোমাকে তা সবিস্তারে বলার সাহস হয়নি। বিষয়টি হল, এ ট্রিপ এরাউন্‌ড দ্য ওয়ারলড। হেসো না। মন দিয়ে শোন।—

তুমি জানো, একটা এরোপ্লেনে চড়ে গোটা পৃথিবী ঘুরতে মাত্র কয়েকটা দিন লাগে। আমরা কিন্তু ঘুরবো তিনমাস ধরে। পনেরোটা প্রধান প্রধান জায়গায় সেটা থামবে। তিনমাস পরে আমারা যখন ফিরবো তখন আমাদের হাতে থাকবে কয়েক হাজার ফুট ফিল্ম, এডিট করার জন্যে। এ-বিষয়ে তোমাকে আগে বিশদভাবে বলেছি। এবং এতদিনে তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো যে সব সময়েই আমার মাথায় ঘুরছে সেই পুরনো আইডিয়া-টা, রোম থেকে নেপল্‌স একটা চক্কর দিয়ে আসার। ······আমি অনুভব করছি, এই হচ্ছে সেই শুভ মুহূর্ত এই রকম ফিল্মের জন্যে। কোনও চিত্রনাট্য থাকবে না, তবু চিত্র তৈরী হবে। বাস্তব জগতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের বা সংযোগের মুহূর্তে আমাদের উন্মুক্ত ও সচেতন চোখ কানের সাহায্যে তখুনি-তখুনি আমরা গড়বো আমাদের ছবিকে। আমার মতে যথার্থ নিও-রিয়ালিজমের এই হচ্ছে নিয়তি।

মোদ্দা কথাটা হল, এই ঘটনা যেমন ভাবে ঘটছে, আমরা তাকে তেমন ভাবেই গ্রহণ করবো, যেখানে যতটুকু প্রয়োজন। কখনো এমন হতে পারে যে, কিছু দৃশ্য আমরা সাজিয়ে-গুছিয়ে আলাদা করে তুলতে পারি। কিন্তু সেটাও হবে আগের বাস্তবের সঙ্গে পারম্পর্য মিলিয়ে।—

আমাদের ছবি হবে এক নিবিড় সাক্ষাৎকার, পুরুষের সঙ্গে, নারীর সঙ্গে, শিশুর সঙ্গে, প্রাচীনের সঙ্গে। আমরা দেখাব, আমাদের ইতালিতে জীবনের ঐশ্বর্য কত বিপুল। আমরা দেখাব, মানুষের মধ্যে বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা কত মহান।······”

আজকের চলচ্চিত্রে জাভাত্তিনির স্বপ্ন বা নিও-রিয়ালিজমের স্থান কতটুকু জানি না। হয়তো ঐ ধারা মৃত। হতে পারে। কিন্তু এর মধ্যে এমন একটা সত্য রয়ে গেছে, যা মৃত্যুহীন বলে মনে হয়। তা হল, জীবনের সঙ্গে শিল্পের পার্বতী-পরমেশ্বর সম্পর্ককে মূর্তিমন্ত করার বাসনা। নিও-রিয়ালিজমের বাহাদুরি এইখানে নয় যে, তাতে চিত্রনাট্যের প্রয়োজন ছিল না। স্টুডিওর দরকার হয়নি। কৃত্রিম আলোকপাত,

মেকআপ, পেশাদার অভিনেতা এই সব জিনিস বরবাদ। নিও-রিয়ালিজমে মূল অন্বেষণ ছিল জীবন। যেমন নগ্ন, ভগ্ন, যেমন ঘর্মাক্ত, রক্তাক্ত, ভিজে, পোড়া, ঝলসানো, এবং যেমন রমণীয়, রূপময় ও প্রাণবন্ত—জীবনকে ঠিক তেমনি করে দেখা এবং পাওয়া।

জীবনের বহমান চলমান স্পন্দমান প্রবাহ অসম্ভব বড় বলেই, নিও-রিয়ালিজম ছুটে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিল চিত্রনাট্যের ছক-কাটা গণ্ডী পেরিয়ে।

কী ঘটবে জানি না। জীবনের মুখোমুখি হব। জীবনের সামনে ধরব শিল্পের ভিক্ষা পাত্র। সব সৃষ্টিশীল পরিচালকদের হৃদয়ের গভীর তলদেশের এইটেই জপ মন্ত্র।

বার্গম্যান অন বার্গম্যান নামের বইটিতে বার্গম্যানকে শেষ প্রশ্ন,

—আপনি আমাদের জানিয়েছেন যে পুরনো ছবির সঙ্গে আপনি শেষ করে নিয়েছেন আপনার বোঝাপড়া। আপনি অর্জন করে চলেছেন ফিল্ম সম্পর্কে ভিন্ন দৃষ্টি-ভঙ্গী, একটা নতুন ধরনের সংগঠন। এটা কি সত্যি? যদি তাই হয়, এটা কি ঘটেছে 'ফারো ডকুমেণ্ট' করার অভিজ্ঞতা থেকে?

বার্গম্যানের উত্তর,

—না। এটা ঘটেছে আমার জীবনধারার মৌলিক পরিবর্তন থেকে। কাজের সঙ্গে এই যে একটা উন্মত্ত সম্পর্ক, সব সময় কিছু না কিছু করে যেতেই হবে ব্যস্ততার সঙ্গে, উপায় থাক বা না থাক, এসব থেকে সরে এসেছি আমি। এখন শুধু সেইটুকুই করবো যা আমার পছন্দ, যা আমার অনুভূতিকে নাড়া দেয়। নাথিং মোর। আমার নাগ্রা আর এরিফ্লেকসটাকে ব্যবহার করা শিখতে যাওয়াটা হয়ে উঠবে বেশ উত্তেজনা-মুখর, যা আগে কখনো ব্যবহারের সুযোগ পাইনি। আমার ধারণা আমি ওদের নিয়ে কাজ চালিয়ে যেতে পারবো। এ থেকে কি জন্মাবে তা আমার ধারণায় নেই। দেখাই যাক্।

অর্থাৎ কী ঘটবে তা না জেনেই বার্গম্যান পা বাড়াতে চাইছেন সৃষ্টির ভিন্ন দিগন্তে।

আনন্দবাজার পত্রিকা
বার্ষিক সংখ্যা

চলচ্চিত্রের খোলা জানালা
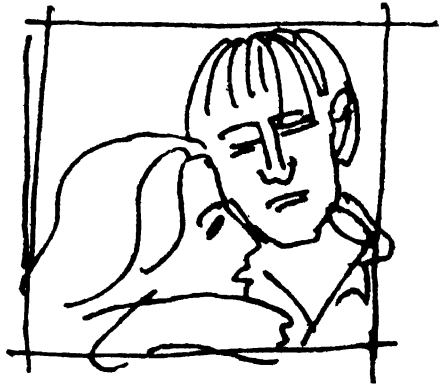
একালের নতুন চিত্র-পরিচালকদের অবস্থা অনেকটা ডাকঘরের অমলের মত। অমল একটা ছোট্ট ঘরের চৌহদ্দিতে বন্দী। কিন্তু তার সামনে খোলা রয়েছে একটা জানালা। সেই জানলার ধারটিতে এসে বসলে সে পৃথিবীকে কাছে পায়। পৃথিবীর যা কিছু তার চোখে পড়ে তাই হবার স্বপ্নে, তার ভিতরে ছুটে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষায়, প্রতি মুহূর্তে সে অধীর এবং স্পন্দিত।

একালের নতুন চিত্র-পরিচালকেরাও অর্থাৎ আমরা একটা সীমাবদ্ধ সম্ভাবনার ছোট্ট এলাকায় আবদ্ধ। কিন্তু চোখের সামনে একটা খোলা জানালা। পৃথিবীর নানান দেশের নানান ভঙ্গিমার চলচ্চিত্র দেখতে পাচ্ছি। বই এবং পত্র-পত্রিকার মারফৎ প্রতিদিন জানতে পারছি পৃথিবীর চলচ্চিত্রে এই মুহূর্তে কোথায় কী ঘটল, কে কী ভাবল, ভাঙল, গড়ল। চোখে দেখা ছবি এবং বইয়ে পড়া জ্ঞান, আমাদের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার ভিতরে প্রতিদিন যোগান দিয়ে চলেছে নতুনতর এক অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার সম্পদ। এবং এই সম্পদ এক-দিকে যত বেড়ে চলে চিন্তা ও চেতনায়, অন্যদিকে ততই বাড়তে থাকে চিত্র নির্মাণের তথাকথিত পদ্ধতির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘাত। নতুন অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির সম্পদকে

যত দ্রুত রূপায়িত বা প্রতিফলিত করতে উদ্যোগী হয়ে উঠি নিজেদের সৃষ্টিতে, তত দ্রুতই দূরে সরে আসতে থাকি বৃহত্তর দর্শকগোষ্ঠীর কাছ থেকে।

আবার উল্টো দিক থেকেও এই সমস্যার আরেক চেহারা। একজন তরুণ পরিচালক তাঁর যথার্থ বুদ্ধি ও বিবেক সহকারে জানেন যে একটি বিশেষ কাহিনী বা একটি বিশেষ দৃশ্যকে আধুনিক চলচ্চিত্রের ভাষায় কীভাবে তোলা উচিত। অথচ বৃহত্তর দর্শক, আর্থিক সাফল্য, প্রযোজকের অনীহা বা অনিচ্ছা, এমনি আরও বহু প্রতিকূলতার প্রভাবে তিনি বাধ্য হলেন সেই কাহিনী বা দৃশ্যটি গতানুগতিক ধারাতেই তুলতে। এর ফলে তিনি যে শুধু নিজের বিবেকের দংশনে ক্ষতবিক্ষত হবেন তাই নয়। বুদ্ধিজীবী মহল, সংবাদপত্রের সমালোচক এবং শিক্ষিত দর্শকবৃন্দের নিরুত্তাপ নীরবতা অথবা উগ্র নিন্দার দংশনে রক্তপাত ঘটবে তাঁর শিল্পীমানসের ভিতরে।

আজকের যে কোন সংবেদনশীল, সৃজনশীল, তরুণ চিত্র পরিচালকের জীবনে সবচেয়ে কঠিন সমস্যা ও করুণ ট্রাজেডি এইটিই। তাঁর একদিকে নিত্য-নতুন চলচ্চিত্র-ভাবনায় সমৃদ্ধ বেগবান বিশ্ব। আর বিপরীতদিকে সম্পূর্ণ বিপরীত পরিপার্শ্বিক। মাঝখানে তিনি। বিহ্বল, বিভ্রান্ত, বিপর্যস্ত।

ধরুণ, একজন তরুণ পরিচালক কিছুকালের মধ্যে মধ্যে নীচের এই মন্তব্য বা তথ্যগুলো পাঠ করেছেন।

১ ॥ কোনো এক সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারে হিচকক বলেছেন যে, "true cinematic art is in danger of being lost, that so many films are leaning too much on dialogue to carry the story."

২ ॥ "একথা আজ আর অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ধ্বনির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সিনেমার চিত্রভাষা সাধারণভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণরূপে আর তত অর্থপূর্ণ থাকতে পারল না। কেননা, ধ্বনি এবং শব্দ যেখানে থাকে সেখানে অর্থবোধের জন্য মানুষ শেষ পর্যন্ত শব্দেরই শরণ নেয়।··· একথার অর্থ অবশ্য এই নয় যে, সবাক চিত্রে বিশুদ্ধ চাক্ষুষ তাৎপর্যের মুহূর্ত কখনো থাকে না। কিন্তু তা যখনই থাকে তখনি সবাক চিত্র

নির্বাক চিত্রের পদ্ধতিতে ফিরে যায়। এবং প্রায়শ এই মুহূর্তগুলিই দর্শকের মনে দীর্ঘস্মরণীয় হয়ে থাকে।" —সত্যজিৎ রায়

৩॥ "আমার ছবি তাই। আমার মনে হয় এটা চলচ্চিত্রের একটা প্রয়োজনীয় এবং স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। পাতার পর পাতা সংলাপ লিখলেন তারপর শিল্প নির্দেশকের সঙ্গে আলোচনা করে এমন একটা ঘর বানালেন যে ঘরের মধ্য দিয়েই সব বলা যায়। তখন উপলব্ধি করবেন সংলাপের আর প্রয়োজন বা মূল্য নেই। সংলাপ ছাড়াই আপনি একই বক্তব্য আরো প্রত্যক্ষ, বোধগম্য ও সঠিকভাবে পেশ করতে পারেন।

আমার বর্তমান ছবি থেকে একটা দৃষ্টান্ত দিই। জুলিয়েত-এর বাড়ি ছেড়ে জর্জিও চলে যাচ্ছে। এই দৃশ্যের জন্য নির্ধারিত সংলাপ সত্যিই সুন্দর, সুলিখিত ও উপযুক্ত ছিল। কিন্তু আমি ঐ দৃশ্যটি এমনভাবে গ্রহণ করেছি যে চরিত্র দুজনের কাউকেই একটাও শব্দ উচ্চারণ করতে হয় নি। জর্জিও সুটকেস গোছাল, জুলিয়েত তাকে কিছু খেতে দিল, এবং তারপর তারা নিস্তব্ধতার মধ্যে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। শেষে জর্জিও বলল, 'Ciao' এবং ধূসর শূন্য ঘরে জুলিয়েতকে একা ফেলে রেখে চলে গেল।" —ফেলিনি

৪॥ "A blind man in a regular theatre and deaf mute in a movie theatre should still get the essentials from the performance." —রেনে ক্লেয়ার

একজন আগ্রহী ও চিন্তাশীল তরুণ পরিচালকের উপর এই সব গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো যে প্রভাব বিস্তার করবেই, তাতে সন্দেহ নেই। এবং এরপর অত্যন্ত সতর্কভাবে, আরও গভীর মনোযোগ সহকারে তিনি তাঁর চিত্রনাট্য রচনায় হাত দেবেন। এবং নিশ্চয়ই চেষ্টা করবেন সংলাপের আধিক্য বর্জন করতে। তিনি নিজের মনে মনে ছকে নেবেন দৃশ্যটা কীভাবে তুললে সংলাপ ব্যতিরেকেই তা হয়ে উঠবে সম্পূর্ণ অভিব্যক্তিময়।

কিন্তু তারপর? আমাদের দেশে হাতে-গোনা কয়েকজন প্রথিতযশা পরিচালককে বাদ দিলে বাকী সকলকেই চিত্রনাট্য পড়ে শোনাতে হয় প্রযোজককে। এবং যখন শোনানো হয়, তখন শুধু একা প্রযোজক থাকেন না। তিনি তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদের সঙ্গে রাখেন। এবং সাঙ্গপাঙ্গ

বাছাইয়েরও একটা ফরমূলা আছে। প্রযোজক ইচ্ছাকৃতভাবে এমন কিছু লোককে সেদিনের আসরে আহ্বান জানান, যাঁরা ছবি দেখায় অভ্যস্ত নন। অভ্যস্ত হলেও সাধারণত সস্তা চটুল হালকা ধরনের ছবিই, নিছক সময় কাটানোর তাগিদে, তাঁদের প্রিয়। চিত্র-নাট্যটি পড়া শেষ হলে প্রযোজক প্রথম ফিরে তাকাবেন তাঁর সেই চিত্রনাট্য-বিষয়ে অনভিজ্ঞ আনাড়ী বন্ধুদেরই দিকে। তাঁদের চোখে হাসি কিংবা বিমর্ষতাই তখন প্রযোজকের একমাত্র মানদণ্ড চিত্রনাট্য গ্রহণের অথবা বর্জনের। চিত্রনাট্যের অগ্নি-পরীক্ষার সেইটেই মূলমন্ত্র। এই রকম পরিবেশে, সংলাপের সাহায্য ছাড়া পৃথিবীর যে কোন দিকপাল পরিচালকের পক্ষেও ঘটনা বা দৃশ্যের অন্তর্নিহিত যাবতীয় আবেগ অপরের অনুভূতিতে সঞ্চারিত করে দেওয়া অসম্ভব।

তাহলে কি তিনি ফেলিনির পথ নেবেন? অর্থাৎ চিত্র-নাট্যে প্রচুর বা যথাযথ সংলাপ থাকবে। কিন্তু দৃশ্য গ্রহণের সময় বাতিল? তাহলে এবার চিত্রনাট্যের দ্বিতীয় পর্বে আসি। ছবিতে সবার আগে প্রযোজক। তিনি বার বার চিত্রনাট্যটি শুনবেন। সংশোধন করাবেন নিজের মনের মত করে। মনের মত হলে তবেই তিনি রাজী হবেন, ছবিতে মূলধন নিয়োগে। তারপর আসবে নায়ক-নায়িকা বা অভিনেতা-অভিনেত্রী নির্বাচনের পালা। এবার চিত্রনাট্যটি তাঁদের প্রত্যেককে শোনাতে হবে। তাঁরাও কিছু কিছু নির্দেশ দেবেন। এবং এসব ক্ষেত্রে নির্দেশ মানেই আরও সংলাপ। আরও ভালো, মুচমুচে, মিষ্টি, তির্যক, চোখা ও চতুর সংলাপ। এই জাতীয় সংলাপ অভিনেতা-অভিনেত্রীর মনে গাঁথা হয়ে থাকে। দৃশ্য গ্রহণের কালে যদি সেগুলিকে বাদ দেবার চেষ্টা করা হয়, তার একমাত্র করুণতম পরিণতি হয়ে দাঁড়াতে পারে পরিচালকেরই পরিচালনার দায়িত্ব থেকে বাদ পড়া।

আমার নিজের জীবনেরই একটা বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার কথা আমি আজও ভুলতে পারিনি। একদা, বেশ কয়েক বছর আগে, আমাদের দেশের সবচেয়ে প্রখ্যাত অভিনেতার সঙ্গে একটি চিত্রনাট্য শোনাবার অ্যাপয়েনমেন্ট ঘটে। কাহিনী রবীন্দ্রনাথের। অভিনেতাটি জীবনে প্রথম সে কাহিনীর নাম শুনলেন। চিত্রনাট্য পড়ার আগেই তিনি প্রশ্ন করলেন তাঁর চরিত্রটা কী? শোনার পর মন্তব্য করলেন,—ওঃ, এ তো প্যাসিভ

ক্যারেকটার। আমি কোন প্যাসিভ ক্যারেকটারে অভিনয় করলে দর্শক নেয় না। এর মূল অর্থ তিনি ছবিতে বেশী সংলাপ বলার সুযোগ পাচ্ছেন না। বলাবাহুল্য, সেদিন আর চিত্রনাট্য পাঠের প্রয়োজন ঘটে নি।

আমি এখানে ছবি করার মাত্র একটা সমস্যাই তুলে ধরলাম। এরকম আরও বহু প্র্যাকটিক্যাল সমস্যা আছে যা একজন তরুণ পরিচালককে নিয়তই বিপন্ন করে রাখে। ফলে তাঁর চিন্তা ও কাজের মধ্যে দেখা দেয় অনিচ্ছাকৃত স্ব-বিরোধিতা। তিনি যা ভাবেন তা করতে সাহস পান না। যা করতে সাহসী হয়ে ওঠেন, তার পিছনে সমর্থন বা সাহায্য জোটে না সহযোগীদের কাছ থেকে। এই দুয়ের সংঘাতে তাঁর নিজের চরিত্রটাই হয়ে দাঁড়ায় এক কিম্ভূতকিমাকার। তিনি যখন প্রাবন্ধিক কিংবা বক্তা তখন অত্যন্ত রাগী ও বিপ্লবী। এবং সেই তিনিই যখন প্রযোজকের অনুগ্রহপ্রার্থী তখন বিনয়ী ও আপসে উৎসাহী। আবার আপস করেও তিনি ভুলতে পারেন না, তাঁর নিজের ভিতরকার লুকনো আগুনকে। এবং খুব সঙ্গত কারণেই তাঁর মনে হয়, হয়তো এইটিই তাঁর শেষ ছবি। ফলে পৃথিবীর চলচ্চিত্রের কাছ থেকে পাওয়া নতুন অভিজ্ঞতা ও প্রকরণগুলিকে তিনি কাজে লাগাতে সচেষ্ট হন। এর ফল কখনো ভাল, কখনো মন্দ। আবার যিনি বিনা আপসে কোন জটিল মনস্তাত্ত্বিক কাহিনী নিয়ে ছবি করতে নেমেছেন, ছবির মাঝপথে এসে তাঁর হঠাৎ মনে পড়ে যায় সাধারণ দর্শকের মুখ এবং প্রেক্ষাগৃহের 'হাউস ফুল' বোর্ড। তিনি তাঁর সাহসী বা বৈপ্লবিক ছবিতে সহসা ভেজাল দিয়ে বসেন তরল রসের। যেন এক অলঙ্ঘ্য নিয়তির বশে অনিবার্যভাবে এই জাতীয় বিপরীতধর্মী ঘটনা আমাদের দেশে ঘটতে বাধ্য।

পৃথিবীর সব দেশেই আজ খুব তীব্ররূপে দেখা দিয়েছে একটা সমস্যা। সেটা চলচ্চিত্রের মুক্তি নিয়ে, তাকে কতখানি স্বাধীন করে তোলা যায় তার নিজস্ব স্বরূপে। এরই পাশাপাশি সমান তালে হেঁটে চলেছে কয়েকটি প্রশ্ন। কার জন্যে চলচ্চিত্র? চলচ্চিত্র যত উন্নত হবে নিজের স্বকীয় প্রকাশ-ভঙ্গিতে ততই সে মাইনরিটির আর্ট ফর্ম হয়ে যাবে কি? এই প্রসঙ্গে মনে পড়েছে পেনিলোপ হাউসটনের সেই নিষ্ঠুর মন্তব্য—"The cinema moves a few step closer to the minority arts." সেই সঙ্গে আরও কানে আসে, যেন হাউসটনকে

সমর্থন জানিয়েই ফরাসী নিউ ওয়েভের একদা কর্ণধার ত্রুফোর এক বিস্ময়কর উক্তি—"I honestly believe that pleasing people is important". ত্রুফো যদি এইটুকু বলেই থামতেন নিশ্চিন্ত হওয়া যেতো। কিন্তু পরক্ষণেই আবার যেখানে টেনে নিয়ে যান, সে তো সেই একই জটিল আবর্ত। "But I also believe that every film must contain some degree of 'planned violence' upon its audience. In good film people must be made to see something that they don't want to see."

আমাদের দেশে 'কাহিয়ে' দু সিনেমা' নেই। নেই 'ফিল্ম কালচার'। আমাদেব দেশে অজস্র তরুণ প্রাবন্ধিক অবশ্যই আছেন। কিন্তু তাঁদের তেমন কোন নিজস্ব বক্তব্য নেই, ম্যানিফেস্টো নেই। চিত্র নির্মাণের কাজে নিজেদের এগিয়ে আসার মত সাহস বা সদিচ্ছাও বিরল। কিন্তু কাহিয়ে বা ফিল্ম কালচারের তরুণ সমালোচকরা তা করেননি। ফরাসী নুভেল ভাগ ঐ সমালোচকদেরই সৃষ্টি। ফিল্ম কালচারের জোনাস মেকাস নিজে তো ছবি করেছেনই। তাঁর নেতৃত্বেই আজ একদল তরুণ পরিচালক গড়ে তুলেছেন 'নিউ সিনেমা' আন্দোলন। হলিউড পর্যন্ত যার দাপটে কম্পমান। তাঁদের কাছে ভাল ছবি বা খারাপ ছবি এই নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই। প্রশ্ন যা তা হোল কোনও একটি ছবি জীবনের প্রতি কোনো নতুন অ্যাটিটিউড, মানুষকে আবিষ্কারের কোনো নতুন আণ্ডার স্ট্যাণ্ডিং প্রকাশ করতে পারল কিনা। তাঁরা তাঁদের ছবিতে, FILM POETRY-তে, ইচ্ছাকৃতভাবে এমন এক বিমূর্ত আবহ রচনা করতে চান যা আদিতম সংগীত এবং আদিম চিত্রকলার কাছাকাছি।

আধুনিক মানসিকতা, আধুনিক জীবনের খণ্ড, ছিন্ন, আদর্শহীন বিকৃত, বিপর্যস্ত চেহারাকে চলচ্চিত্রে যথার্থরূপে চিনিয়ে দেবার জন্যে তাঁরা তাঁদের ছবিতে আউট-অফ-ফোকাস শটস্, কেঁপে যাওয়া শটস্, ওভার এবং আণ্ডার এক্সপোসজড শটস্ সব কিছুকেই ঠাঁই দিতে রাজি। প্রয়োজনে লেন্সে থুতু ছিটোতেও। এমনকি এমন লেন্স বা বিনা-লেন্স নিয়ে কাজ করতেও, যার ফলে দৃশ্যটিকে পরিস্ফুটন করার আগে কখনই জানা যাবে না কি তোলা হল।

এটা ভাল কী মন্দ, এগুলো কতখানি স্থায়ী বা অস্থায়ী, সে প্রশ্ন তুলছি না। এই সব উদাহরণের প্রস্তাবনা শুধু একটি কারণেই। পৃথিবী জুড়ে সব দেশের সব পরিচালকই আধুনিক জীবনকে, নিজের সমকালকে প্রকাশ করার প্রয়োজনে নিজেদের চলচ্চিত্রে নিত্য নতুন প্রকাশভঙ্গি বা কলা-কৌশলের অন্বেষণে আন্তরিকভাবে উন্মুখ। গদারের ছবি যে আজ পৃথিবীর যাবতীয় প্রচলিত নিয়ম-শৃঙ্খলাকে ভেঙে তছনছ করছে, সেও একটা নিয়ম-শৃঙ্খলা হারানো যুগকেই প্রতিফলিত করার তাগিদেই।

গত এক বছরের মধ্যে অনেকগুলো নতুন শব্দ বা সংজ্ঞা বিদেশের বা বিশ্বের চলচ্চিত্র আন্দোলন থেকে ছিটকে এসেছে আমাদের দেশেও। যেমন 'ওপেন-এণ্ডেড'। যেমন 'ন্যারেটিভ স্টাইল ভাঙা'। সত্যজিৎবাবু বলেছেন তাঁর মহানগর 'ওপেন-এণ্ডেড'। 'প্রতিদ্বন্দ্বী' ছবিতে ন্যারেটিভ স্টাইলকে যে তিনি অনেকখানি দুমড়ে মুচড়ে দিয়েছেন, তাতে সন্দেহ নেই। মৃণালবাবু তো এই ব্যাপারে আরো অ্যাগ্রেসিভ।

মজার ব্যাপারটা এইখানেই। মরা মরা করতে করতে যেমন রামে পৌঁছনো, তেমনি না, না, করতে-করতে বাংলার চলচ্চিত্রে আমাদের পূর্ব-সূরীরা গ্রহণ করছেন সবই। নিউ ওয়েভ বারণ। অথচ ফ্রিজ এল। জাম্প কাট এল। ইণ্টারমিডিয়েট শট বাতিল হল। রোদে পোড়া ফটোগ্রাফীকে সাদরে বরণ করা হল। হ্যাণ্ড হেল্ড অপারেশনকে বারণ করা হল না। 'সিনেমা ভেরিতে'রও উঁকি ঝুঁকি। নিউ ওয়েভের বহু জিনিসই আমরা দিন-দুবেলা দেখতে পাচ্ছি আমাদের পূর্ব-সূরীদের ছবিতে অথচ গুরুজনদের নিষেধ কানে আসে, নিউ ওয়েভ এদেশের মাটিতে অসম্ভব।

তাই বিশ্বাস করে আসছিলাম। হঠাৎ সেই সহজ বিশ্বাসটুকু গুলিয়ে গেল। সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে সত্যজিৎবাবুকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, প্রাক্-পথের পাঁচালী বাংলা সিনেমাতে পথের পাঁচালীর কোন শিকড় আদৌ আছে কি? তিনি উত্তরে বলেছেন, 'না, নেই। আমি খুব জোর দিয়েই বলছি নেই।'

আমরা এককালের তরুণ পরিচালকেরা, সীমাবদ্ধ সুযোগের গণ্ডিকাটা ঘরের ভিতরে বন্দী। কিন্তু চোখের সামনেই একটা খোলা জানালা। জানালার বাইরেই পৃথিবী। পৃথিবী জুড়ে সৃষ্টির প্রবল স্পন্দন।

বিনোদন সংখ্যা দেশ ॥
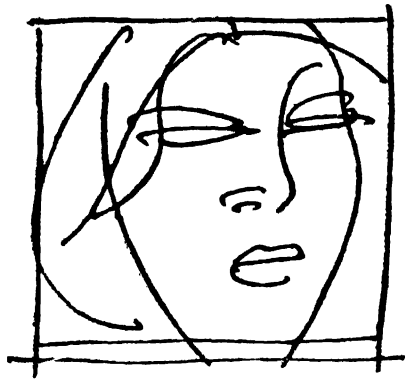
ক্লোজ-আপ

বঙ্কিমচন্দ্র পাঠকের সঙ্গে পরিচয় করাতে চান তিলোত্তমার। অতঃপর তিলোত্তমার প্রতি অঙ্গের প্রতি তাঁর অন্তরঙ্গ দৃষ্টিপাত।

"সুগঠিত সুগোল ললাট, অপ্রশস্ত নহে, অথচ অতি প্রশস্তও নহে, নিশীথ-কৌমুদীদীপ্ত নদীর ন্যায় প্রশান্ত-ভাব প্রকাশক, তৎপার্শ্বে অতি নিবিড়-বর্ণ কুঞ্চিতালক সকল ভ্রূযুগে, কপোলে, গণ্ডে অঙ্গে উরসে আসিয়া পড়িয়াছে, মস্তকের পশ্চাদভাগে অন্ধকারময় কেশরাশি সুবিন্যস্ত মুক্তাহারে গ্রথিত রহিয়াছে ; ললাটতলে ভ্রূযুগ সুবঙ্কিম, নিবিড়বর্ণ, চিত্রকর-লিখিতবৎ হইয়াও কিঞ্চিৎ অধিক সূক্ষ্মাকার ; আর এক সুতা স্থূল হইলে নির্দোষ হইত।"

উদ্ধৃত অংশের মধ্যে তিলোত্তমা নেই। আছে তিলোত্তমার শরীরেরই অঙ্গীভূত কিছু অংশের স্বতন্ত্র ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণনা। একটি সম্পূর্ণ দেহের তুলনায় একটি মুখ অনেক ছোট। একটি মুখের তুলনায় ভ্রূযুগ অনেক সামান্য। অথচ এখানে লেখক সেই সামান্যকেই আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন অতিকায়রূপে. যাতে তিলোত্তমার সমগ্র শরীরের পরিপ্রেক্ষিতে একটি ভ্রূযুগ কতখানি মানানসই, অথবা সামান্য ভ্রূযুগের সুবঙ্কিম টানের মধ্যেও তিলত্তমার অসামান্য রূপের কতখানি ধরা পড়ে সেটাই বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য। এই হল সাহিত্যের ক্লোজ-আপ।

ক্লোজ-আপ আছে শিল্পকলাতেও, ছবিতে এবং ভাস্কর্যে। ভাস্কর্যে

যখন মূর্তিকে পাই আবক্ষ, তখনই তো সেটা ক্লোজ-আপ।

রদাঁর তৈরী হাত বা মুখের গড়নগুলোয় আমরা আপাদমস্তক ব্যক্তিকে পাই না, পাই ব্যক্তিত্বের সারাৎসার। সেটাই ক্লোজ-আপ। মাতিস পিকাসোর ছবিতে নারীর মুখাবয়বগুলোও নিঃসন্দেহে তাই। পিকাসো এগিয়ে গেছেন আরও এক ধাপ। চলচ্চিত্রের ক্লোজ-আপে আমরা একটি নারীর মুখকে যেভাবে নানা দৃষ্টিকোন থেকে দেখাতে পারি, পিকাসো তাঁর স্থির ছবিতেই আনতে চেয়েছেন সেই অস্থির এবং নানামুখী আন্দোলন।

ক্লোজ-আপ আছে কবিতাতেও।

"হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি।"

জীবনানন্দের 'বনলতা সেন' কবিতার এই প্রথম স্তবকটি যেন এক এক্‌সট্রিম লং শট। মহাকাশ থেকে তোলা এক ভুবন-জোড়া দৃশ্যের মতো।

পরবর্তী স্তবকে ক্ষণিকের জন্যে কবি তার সৃষ্টির জগতকে টেনে নিয়ে আসেন আমাদের দৃষ্টির ও ইন্দ্রিয়ানুভূতির সীমার দিকে।

"চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য।"

এই পংক্তি দুটি পাঠের সময়েও কিন্তু আমাদের দৃষ্টি কোথাও স্থির নয়। এক গুচ্ছ চুল বা একটা মুখের নিকটবর্তী হতে গিয়েও সেই চুল বা মুখের সুস্থির বা স্থায়ী রূপকে নিরীক্ষণের বদলে আমাদের দৃষ্টি যেন বিদিশা নগরীর ব্যাপ্ত অন্ধকার নিশা এবং শ্রাবস্তীর পথে পথে ছড়িয়ে পড়ে নিবিড়তর কিছুর অন্বেষণে। কবি আমাদের দৃষ্টির চঞ্চলতার সুযোগ নিয়ে হঠাৎ চলে যান অতিদূর সমুদ্রের পর। তারপর আবার ফিরে আসেন ঘরের সীমানায়, ঘনীভূত অন্ধকারে। আমরা যেন ফিরে আসি একটা মিড শটে।

অনুভব করি, লেখক ও বনলতা সেন এখন পাশাপাশি। কিন্তু নিবিড় অন্ধকারে কাউকে সুস্পষ্টরূপে চিনবার উপায় নেই। শুধু এক অন্তরঙ্গ প্রশ্ন যখন সেই অন্ধকার ভেদ করে আমাদের কানে বেজে ওঠে—

'এতদিন কোথায় ছিলেন?'

পাঠক বা দর্শক হিসেবে আমাদের আবেগ তখন পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে

একটি চরম প্রত্যাশার বিন্দুতে। আমরা তখন ধৈর্যহীন। আমরা তখন সুস্পষ্টরূপে দেখে বা চিনে নিতে উৎসুক সেই নারীকে।

কবিও এতক্ষণে বুঝতে পেরেছেন আমাদের দারুন উদ্বেগ। আর সেই মুহূর্তেই আমাদের চোখের সামনে আলোকিত হয়ে ওঠে এক রহস্যময় ক্লোজ-আপ।

'পাখির নীড়ের মত চোখ তুলে তাকালেন নাটোরের বনলতা সেন।'

ক্লোজ-আপ সমগ্র থেকে বিচ্ছিন্ন একটি ক্ষুদ্র অংশ অথবা ক্ষুদ্র বস্তুর পরিবর্ধিত বৃহৎ আকৃতি। পৃথিবীর সাহিত্যে-শিল্পে সুপ্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে ক্লোজ-আপ-এর ব্যবহার। যখন যেখানে যেটিকে বড় করে, তাৎপর্যপূর্ণ করে, আরও ব্যঞ্জনাময় করে দেখানোর প্রয়োজন, তখন কবির কলম এবং শিল্পীর তুলি সেটিকে অন্য সব কিছুর থেকে স্বতন্ত্র ও স্বপ্রতিষ্ঠরূপে গড়েছেন।

অতি সুপ্রাচীনকাল থেকেই মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যেও রয়েছে এমনি এক চেতনা। যখন যে বস্তুর চাহিদা আমাদের চেতনার পক্ষে সবচেয়ে অত্যাবশ্যক, তখন সেই বস্তুকে তার সমগ্র পারিপার্শ্বিক থেকে উপড়ে চোখের সামনে মেলে ধরি আমরা। আবেগের সেই ঘনীভূত মুহূর্তে জগৎ সংসার লুপ্ত। আমরা যে বস্তুটিকে চেয়েছি, খুঁজেছি বা পেয়েছি তখন শুধু সেইটিই এক বৃহৎ জগৎ। হয়তো বা কখনো কখনো স্থান কালেরও ঊর্দ্ধে।

নাটকের দৃশ্য চিরকালই অভিনীত হয়েছে একটা নির্দিষ্ট পরিধির মধ্যে। একজন দর্শক একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে বসে আগাগোড়া সেই নাটকটি দেখতে বাধ্য। কোনও সময়েই কোন অভিনেতা বা অভিনেত্রী তাদের কোন বিশেষ মুহূর্তের আনন্দ অথবা বেদনাময় মুখাবয়বের সূক্ষ্মতম কারুকার্য উন্মোচিত করবে না দর্শকের চোখের সামনে এগিয়ে এসে। তবুও দর্শক প্রায় কোন সময়েই একটা সমগ্র দৃশ্যকে দেখে না। যে মুহূর্তে যে-চরিত্র বা যে-অভিনেতার নির্বাক অভিব্যক্তি বা সবাক সংলাপ সমগ্র নাটকটিকে কোন গভীরতর তাৎপর্যের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, দর্শকের আসন যত দূরেই হোক, তাঁর দৃষ্টি তখন মঞ্চের অন্যান্য চরিত্রদের সীমারেখা পার হয়ে সেই বিশেষ-চরিত্রটির বা অভিনেতাটির দিকেই আবদ্ধ। এইখানেই শেষ নয়। সেই মুহূর্তেও যে দর্শক ঐ অভিনেতাটিকে

আপাদমস্তক অবলোকন করছেন, এমন নাও হতে পারে। কখনো তিনি কেবলমাত্র অবলোকন করছেন তার চোখের ঝলসানো বিদ্যুৎ কিংবা মুখের রেখার বিস্ফারিত কুঞ্চন, কিংবা তার হাতের আঙুলের মুচড়ে মুচড়ে ওঠা অস্থির অলোড়ন।

এইভাবে দেখেও মানুষের আশা মেটেনি। তাই রঙ্গালয়ে নাট্যরসিকদের হাতে দেখা গেছে বায়নাকুলার। নাটক দেখতে এসে তাঁরা অণু অণু করে অনুভব করতে চেয়েছেন নাটকের বিশেষ মুহূর্ত আর বিশেষ অভিব্যক্তিগুলি।

সমগ্রকে আরো গভীর করে জানার জন্যেই সমগ্রের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশকে জানবার আগ্রহ মানুষের চিরন্তন। এইখানেই ক্লোজ-আপ-এর উৎস।

চলচ্চিত্র তার জন্মলাভের একেবারে আদিতেই এই ক্লোজ-আপকে পায়নি। পেয়েছে অনেক অনুসন্ধানের শেষে। কিন্তু যখন পেল, তখন চলচ্চিত্র এই বিশেষ মাধ্যমটিকে একেবারে পরমাত্মীয়ের মত জড়িয়ে ধরলো বুকে। অনেকের ধারনা ক্লোজ-আপ-এর আবিষ্কারক গ্রিফীথ। সেটা ভুল। চলচ্চিত্র প্রায় তার জন্মমুহূর্তেই হাতের নাগালে পেয়ে গিয়েছিল ক্লোজ-আপ-কে, কিন্তু হাতের মুঠোয় এসেছিল একটু পরে। ক্লোজ-আপ ছিল পোর্টার-এর 'দি গ্রেট ট্রেন রবারি'-তে, ছবির একেবারে শেষে। একটা পিস্তল দর্শক অথবা ক্যামেরার দিকে সোজাসুজি তাক্ করা। সে ক্লোজ-আপ কিন্তু কাহিনীর কোনো অন্তর্গত সত্যকে প্রকাশ করার তাগিদে নয়। ছবিটাকে নাটকীয় ভঙ্গীতে শেষ করার কৌশল হিসেবেই।

"It's done just for effect and it's a good shock scene ···it was just a nice little device to close the film."

গ্রিফীথ-যুগের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে এভারসন এইখানেই থামেন না। ক্লোজ-আপ-এর মতো অন্যান্য কলা-কৌশলও কেমন ভাবে আবিষ্কৃত হয়েও অব্যবহৃত থেকে যায় তাদের অন্তর্নিহিত-শক্তির সম্বন্ধে অনবহিতির ফলে, এই প্রসঙ্গে জানিয়ে দেন সেটাও।

"So all these little devices existed. Dissolve or trik effects or close-ups and use of the moving camera. They existed, but they existed because they were devised at

the time as the easiest way out, the director or the cameraman did not realize they could be utilized in other context."

গ্রিফীথের বিরাটত্ব এইখানে যে, তিনি এগুলোকে নিজের নিয়ন্ত্রনে এনে এদের অন্তর্নিহিত অসামান্য শক্তিকে যথাযথ উপলব্ধি করে, এদের রূপান্তরিত এবং উন্নত করে দিতে পেরেছিলেন চলচ্চিত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভাষায়। আর এইভাবে বিশ্ব-চলচ্চিত্রের প্রথম ব্যাকরণ, 'a basic grammar', তৈরী হয়ে গেল তাঁর হাতে। আর ক্লোজ-আপ, তাঁরই কল্পনা-প্রতিভার স্পর্শে, হয়ে উঠল চলচ্চিত্রের সবচেয়ে শক্তিমান উপকরণ।

'ইনটলারেন্স'-এর সেই দুই ক্লোজ-আপ, ক্লোজ-আপ সম্পর্কিত যে-কোনো আলোচনাতেই যার অবশ্যম্ভাবী উল্লেখ আমাদের চোখে পড়বেই, যার প্রথমটিতে একজন মহিলা শুনছে নিজের নিরপরাধী স্বামীর মৃতদণ্ডের আদেশ, আর দ্বিতীয়টিতে সেই মহিলারই মুষ্টিবদ্ধ দুটি হাত, আঙুলগুলো যেন উন্মত্ত আবেগে গেঁথে যেতে চাইছে চামড়ার ভিতরে, বিশ্ব-চলচ্চিত্রে ক্লোজ-আপ-এর সার্থকতম দৃষ্টান্ত। এই প্রসঙ্গে অভিভূত এবং আলোড়িত পুডভকিন-এর ব্যাখ্যা আমাদের সামনে তুলে ধরে ক্লোজ-আপ প্রয়োগের এবং তার তাৎপর্যের একাধিক স্তর অথবা মাত্রা।

"This is one of the most powerful moments of the film. Not for a minute did we see the whole figure, but only the face, and the hands. And it is perhaps by virtue of this fact that the director understood how to choose and to show, from the mass of real material available, only these two characteristic details, that he attained the wonderful power of impression notable in this scene."

এরই একটু পরে, প্রসঙ্গ সূত্রেই, 'Possibility of the elimination of those insignificances' আর 'retaintion only of cinematic and dramatic points'-এর ধারণাটাও গেঁথে দেন আমাদের ভাবনায়। এর ফলে আগের থেকে আরও বিস্তৃত হয়ে ওঠে আমাদের ক্লোজ-

আপ সম্পর্কিত ধারনা। আগে জানা ছিল—

১। ক্লোজ-আপ ক্ষুদ্র বস্তুকে বৃহৎ করে দেখায়।

২। ক্লোজ-আপ অদেখা অথবা দেখা-অসম্ভব বস্তুকে নিয়ে আসে একেবারে চোখের সামনে।

৩। বৃহতের স্পন্দন শোনায় বৃহতেরই ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের মাধ্যমে।

এখন আরও জানা হল—

৪। প্রয়োজনে সে, কোনো গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে, বস্তুর ভিতর থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে পারে বিশেষ রূপে নির্বাচিত বস্তুকে।

৫। বিশেষ-প্রয়োজনে নির্বাচিত বস্তুর ক্লোজ-আপের মাধ্যমে পরিচালক দর্শককে বাধ্য করাতে পারেন নিজের আকাঙ্ক্ষিত আবেগের কাছে আত্ম-সমর্পনে।

৬। সংলাপের সাহায্যে প্রকাশ করা সম্ভব নয়, চরিত্রের অর্থাৎ অভিনেতা-অভিনেত্রীর এমন সব অশ্রুত-অব্যক্ত অন্তর্বচনও আমাদের কাছে বাঙ্ময় করে তুলতে পারে সে।

৭। অভিনেতা-অভিনেত্রীর সাহায্য ছাড়াও, ঘটনাস্থলের বাস্তব পরিমণ্ডল থেকে ক্লোজ-আপ বেছে নিতে পারে এমন সব বস্তুকে, যার মাধ্যমে ঘটনার অথবা চরিত্রের অনেক গোপন-গহন তথ্যও জানা হয়ে যাবে আমাদের।

৮। ক্লোজ-আপের গতিবিধি এক অলৌকিক উভচরের মতো। যে-স্বাচ্ছন্দে সে চলাফেরা করে সারফেস রিয়্যালিটি অর্থাৎ বাস্তবের বহিরঙ্গে, ঠিক ততখানিই তার স্বাধীনতা যখন সে ঢুকে পড়তে চায় আভ্যন্তরীন বাস্তবে, অর্থাৎ ইনার রিয়্যালিটিতে।

চলচ্চিত্রের আদিযুগের অন্যতম প্রধান তাত্ত্বিক বেলা বালাজ ক্লোজ-আপের এই যাদুকরী প্রতিভা সম্বন্ধে তাই এতখানি মুখরিত।

"নির্বাক যুগের চলচ্চিত্রের ক্যামেরা সেইদিনই আবিষ্কার করল এক নতুন পৃথিবী, যেদিন সে ক্ষুদ্রাকায় জিনিসের জগতকে প্রত্যক্ষ করাতে পারল খুব স্বল্প দূরত্ব থেকে। সেদিন সে প্রকাশ করতে সক্ষম হোল ক্ষুদ্র বস্তুর ভিতরকার প্রাণের স্পন্দন।…ক্লোজ আপ দিয়ে নির্বাক যুগের ক্যামেরা জীবনের এমন সব গোপন অজানা সম্পদকে উদ্ধার করেছে, যা আমরা ভেবেছিলাম বুঝি বা সে সব আমাদের জানা হয়ে গেছে।… ক্যামেরা জীবনের তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়ের অনু-পরমানুর মত খণ্ডাংশ-গুলিকে

এনেছে উদ্ধার করে, যে অনু-পরমাণুতে সম্পূর্ণতা পায় কোনো বৃহৎ ঘটনা। প্রচণ্ডতম ধ্বস যখন নামে, তখন সেটি কিন্তু আসলে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের আলোড়ন বা গতির যোগফল।…ক্লোজ-আপ শুধু আমাদের জীবনকে দেখার পরিধিই বাড়িয়ে দেয়নি, দিয়েছে জীবনকে দেখার গভীরতার বোধও।"

কোনো কোনো সমালোচক, ক্লোজ-আপের এই প্রচণ্ড পারদর্শীতাকে মনে রেখেই, সম্বোধন করেছেন 'Visible hieroglyphs'.

"the visible hieroglyphs of the unseen dynamics of human relations."

কোনো কোনো সমালোচক, ক্লোজ-আপের অবিস্মরনীয় ব্যবহারের দক্ষতাকে মনে রেখেই, গ্রিফিথের গলাতেই পরিয়ে দিতে চেয়েছেন সম্মানের মালা, ক্লোজ আপের যথার্থ আবিস্কারক হিসেবে। আর্থার নাইটের উক্তিতে মিলবে তার প্রমাণ।

"Griffith discovered that one basic function of the close-up was to emphasize the inanimate, to make things a dynamic part of the world through which the actors move."

ক্লোজ-আপ, গ্রিফিথের আমলেও পাকাপাকি ভাবে নামটা পায়নি। তখন বলা হয়েছে, ক্লোজ-আপের বদলে, নিয়ার (near)। অবশ্য এরই সঙ্গে জুড়ে থকেতো ক্লোজ-আপও কখনো কখনো। অন্যান্য দেশে, যেমন রাশিয়ায়, ক্লোজ-আপের ব্যাপারটা বোঝানো হতো লার্জ বা লার্জ-স্কেল বলে। আইজেনস্টাইন থেকে জানতে পারি 'ক্লোজ-আপ' কথাটা বিশ্ব চলচ্চিত্রে আমেরিকানদেরই দান।

গ্রিফীথে 'ক্লোজ-আপ' ছিল ভাব প্রকাশের হাতিয়ার। আইজেনস্টাইন তাকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন কাহিনী অথবা ঘটনা অথবা চরিত্রের অন্তর্গত দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের উন্মোচনে সবচেয়ে সাহায্যকারী উপায়-উপকরনরূপে। গ্রিফীথের ক্লোজ-আপ প্রাপ্তবয়স্ক হল আইজেনস্টাইনে।

॥ ২ ॥

আমরা জানি ক্লোজ-আপ অভিনেতা-অভিনেত্রী মুখাপেক্ষী নয়

শুধু। এক টুকরো কাগজ, প্রদীপের এতটুকু শিখা, তাক্-করা পিস্তল, একটা ভাঙা চশমা, রক্ত-গড়ানো একটা ক্ষত, বেজে-যাওয়া টেলিফোন, গাছের পাতায় কীট, কাঠের মূর্তিতে ঘুন, টেবিল ঘড়ির টিক টিক হৃৎস্পন্দন, দেয়ালের ঝুলন্ত ছবি, গোপন চিঠির অক্ষর বা ভাস্কর্যের আশ্চর্য ভঙ্গীমা, এই সব আপাতঃ তুচ্ছ দৈনন্দিন জীবনের সামগ্রীর সঙ্গেও তার আন্তরিক সম্পর্ক।

চলচ্চিত্রের কাহিনী বুনুনীকে আরও কৌতূহলী এবং রহস্যময়, হয়তো বা আরো উদ্দীপক, করে তোলার তাগিদেই ক্লোজ-আপ এদের কাছে ছুটে আসে সাহায্য নিতে, সহযোগিতা পেতে। ক্লোজ-আপ যে জড বস্তুকেও প্রাণময়, বক্তব্যময় করে তুলতে পারে বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে, তাও অজানা নয় আমাদের। তা সত্ত্বেও, ক্লোজ-আপ বললেই আমাদের ভাবনায়, চোখে, মনের অবচেতনে সবার আগেই ভেসে ওঠে মানুষের মুখ। মনে হয়, যেন ক্লোজ-আপের চরম সার্থকতা, পূর্ণতা বুঝি তখনই মানুষের মুখের একেবারে কাছাকাছি এসে তাদের মনের অনুচ্চারিত স্বগতোক্তিকে উন্মোচিত অথবা প্রকাশিত করে দিতে পারে যখন। আমাদের মনে হতে পারে যে নির্বাক যুগেই এই-জাতীয় ক্লোজ-আপের প্রয়োজনটা ছিল অনেক বেশী গভীরতর এবং জরুরীও। কারণ চরিত্রকে তখন সংলাপ ব্যতিরেকেই প্রকাশ করতে হতো মনের সংলাপ, মুখের অভি-ব্যক্তিতে শুধু। হয়তো নির্বাক চলচ্চিত্রের সৌন্দর্যময়তার উৎসও ছিল ঐখানে। বেলা বালাজ ব্যবহার করেছিলেন অন্য বিশেষণ, 'বৈচিত্রময়'।

"চলচ্চিত্রই সর্বপ্রথম সম্ভবপর করে তুলেছিল মানুষের মুখাবয়বের বৈচিত্রময় ভাবরাজির প্রকাশ। এখানে "বৈচিত্রময়' শব্দটির সাহায্যে মানুষের একই মুখাবয়বে অজস্র বিরোধী অভিব্যক্তির প্রকাশের কথাই বলতে চাইছি আমি। চলচ্চিত্র যেন এখানে একটিই আকরে অসংখ্য অনুভূতি ও চিন্তার ঝংকার জাগিয়ে রূপায়িত করতে চাইছে মানবাত্মার বিচিত্রতা।...

নির্বাক চলচ্চিত্রে মানুষের মুখাবয়ব যখন তার পারিপার্শিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো, তখন মানুষের মনলোক বিশ্লেষণের এক নতুন জগতে হাজির হতাম যেন আমরা। এই নতুন জগতে যা উপস্থাপিত বা বিশ্লেষিত হতো, তা প্রাত্যহিক জীবনের খোলা চোখে কখনই প্রত্যক্ষ

করা সম্ভব ছিল না। আমাদের সবাক ছবিতে নির্বাক যুগের এই মূল অভিনয়ের নিগূঢ় সম্ভাবনার অনেক খানিই হ্রাস পেয়েছে এই কারণে যে, এখন উচ্চারিত সংলাপের সাহায্যেই সেই সব উপলব্ধিকে পৌছে দেওয়া হচ্ছে দর্শকের কাছে। কিন্তু সংলাপ কোনোদিনই অভিব্যক্তির জায়গা দখল করতে পারবে না। কেননা এমন বহু গভীর অভিব্যক্তি আছে যা কোনোদিনই উচ্চারিত ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।···বলা যেতে পারে সবাক ছবির মতো নির্বাক যুগের চলচ্চিত্রেও কথা বলতো অভিনেতারা। তফাতটা এইখানে, নির্বাক যুগে আমরা দেখতাম যে অভিনেতা কথা বলছে, আর সে-কথা তার মুখাবয়বের অর্থপূর্ণ অভিব্যক্তির মাধ্যমে বুঝে নিচ্ছি আমরা। কথোপকথনে রত একটা মুখের চেহারার সঙ্গে নির্বাক ছবিতে ভাবপ্রকাশে রত মুখের যে তফাত আছে সেটা অনস্বীকার্য।

নির্বাক ছবিতে কোনো অভিনেতা সংলাপ উচ্চারণ করতে গিয়ে মুখে যে ধরণের ভঙ্গী আনতো তাতেই প্রকাশ পেয়ে যেতো একটা ভাবের। আর সেই কারণেই আমরা সহজেই বুঝে যেতাম যে-কোন ভাষাভাষি অভিনেতারই অভিনেয় বিষয়টা।······ক্লোজ-আপ-এর বেলায় এটা সত্যিই এক আশ্চর্য ব্যাপার। যখন কথা বলা শোনা যেতনা, তখনও ক্যামেরায় ধরা পড়েছিল অন্তর্গত ভাবের প্রকাশে অভিনেতার মুখের পরিবর্তনগুলো।

নির্বাক যুগে অভিনেতার সংলাপ দর্শকের উপলব্ধিতে পৌছতো দর্শণের মাধ্যমে, শ্রবণের মাধ্যমে নয়। মুখাবয়বকে অর্থময় করে তোলার প্রয়োজনটাও সেই কারণে, যেহেতু শব্দ তখনও চলচ্চিত্রে প্রবেশ করেনি। তখন অভিনেতার সংলাপ উচ্চারণ করতো শুধু মুখাবয়বে মনোভাবটাকে ফুটিয়ে তোলার জন্যেই, এমনকি সে-সংলাপ নির্ভুল উচ্চারণেরও প্রয়োজন দেখা দেয়নি। চলচ্চিত্রে শব্দের অবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে মুখাবয়বে মনোভাব প্রকাশের গুরুত্ব লুপ্ত হতে বসল প্রায়, কারণ শ্রবণের মাধ্যমেই যখন দর্শকের কানে সেটা পৌছে যাচ্ছে, তখন দর্শণের উপযোগীতা কিছুটা গৌণ তো হবেই। অন্তত মুখাবয়বের অন্য অংশের তুলনায় ওষ্ঠদ্বয়ের গুরুত্ব খানিকটা কমে যেতে বাধ্য, কারণ তখন সেটা হয়ে দাঁড়িয়েছে শব্দ তৈরীর একটা যন্ত্রের মতো।

সবাক ছবিতে সেই কারণে কথোপকথন রত চরিত্রের প্রতিচ্ছবি অনেক সময়েই এড়িয়ে যাওয়া যায়। কেননা মুখের ঐ বিশেষ অংশটি

তখন ভাবলেশহীন একটা বীভৎস যন্ত্রের মতো দেখতে লাগে বলে। এই অসুবিধার জন্যেই সবাক চিত্রের ক্লোজ-আপে পরিহার করতো এমন জিনিষ, নির্বাক চলচ্চিত্রে মানুষের হৃদয়ের গূঢ়তম অনুভূতিকে যা প্রকাশ করতে পারতো দর্শকদের সামনে।"

অবশ্য বেলা বালাজ যতখানি আশা করেছিলেন, সবাক চলচ্চিত্রে ক্লোজ-আপের গুরুত্ব কমেনি ততখানি। বরং ইতিমধ্যে ঘটে গেছে একটা মৌলিক পরিবর্তন। নির্বাক ছবিতে অভিনেতাদের মুখভঙ্গিকে হতে হতো সবাক। অর্থাৎ কথা বলার মাধ্যমেই তাঁদের মুখাবয়বে ফুটিয়ে তুলতে হতো বিশেষ বিশেষ মনোভাব। সবাক ছবিতে ক্লোজ-আপ হয়ে গেল নির্বাক। বিনা ওষ্ঠ সঞ্চালনে এবং বিনা সংলাপেই সেখানে প্রকাশিত হল মনের অন্তর্গত সংলাপ-মুখর অভিব্যক্তি।

সবাক চলচ্চিত্রেও তাই মুখাবয়বের ক্লোজ-আপ মর্যাদাহীন হল না এতটুকুও। মুখাবয়বের বাইরেও ক্লোজ-আপ রয়ে গেল তার সম্মানের চির-আসনেই। নির্বাক যুগের একাধিক ছবি এখনও আমাদের কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে ক্লোজ-আপের মাধ্যমেই। আর সমগ্র ছবির বক্তব্যের পক্ষে এমন প্রতীকের মর্যাদা পেয়ে গেছে তারা যে, চলচ্চিত্র-সংক্রান্ত যে-কোনো বইয়েই তাদের উল্লেখ অথবা উপস্থিতি যেন অভ্রান্ত এবং অনিবার্য। যে-কোন বইয়ে আইজেনষ্টাইনের 'ব্যাটেলশিপ পোটেমকিন', কার্ল ড্রেয়ারের 'দি প্যাসন অব জোয়ান অব আর্ক', গ্রিফীথের 'ইনটলারেন্স', দভচেঙ্কোর 'আর্থ' জাতীয় ছবির কোনো একটি ক্লোজ-আপের দিকে যখনই চোখ পড়ে আমাদের, নিমেষেই যেন সমগ্র ছবিটির নির্যাস ভেসে ওঠে মনের পর্দায়।

॥ ৩ ॥

নিবার্ক যুগের পর চলচ্চিত্রের গতি এবং প্রগতি দুটোই গেছে বেড়ে। আগের চেয়ে অনেক স্বাধীন এবং সাবালক হয়ে উঠেছে সে। তার শব্দে এবং বর্ণে এসেছে অনেক যান্ত্রিক সাফল্য। অনেক উন্নত হয়েছে তার কলাকৌশল অথবা আঙ্গিক। তার ক্ষমতার পরিধিও এখন বহুদূর পর্যন্ত ব্যাপ্ত।

কিন্তু এখনো সে পারেনি ক্লোজ-আপকে দূরে সরিয়ে দিতে। বরং আরো নিবিড়তররূপে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে সে।

গদার, যিনি বিশ্ব চলচ্চিত্রের এক বিস্ময়, যিনি এক হাতে ভেঙে অন্য হাতে গড়ে দিয়েছেন চলচ্চিত্রের নতুন ব্যাকরণ, আইকনোক্লাস্ট-এর প্রতীক বলা যায় যাঁকে, সেই গদারের ছবিতেই ক্লোজ-আপের ব্যবহার এখনো কত জরুরী এবং অপরিহার্য। তাকানো যাক তাঁর 'এ ম্যারেড উওম্যান'-এর দিকে।

ছবির শুরুতে বেশ কিছুক্ষণ নায়ক-নায়িকার নগ্ন শরীরের অংশ বিশেষ। কখনো হাত, কখনো পা, পাছা, উরু, পিঠ, ঘাড়, নাভিদেশ ইত্যাদি। তারা কথা বলে। আমরা সে কথা শুনি অফ সাউণ্ডে, চরিত্রদের মুখে বা ঠোঁটে নয়। তারা যে নগ্ন, তারা যে একজন অপরের প্রণয়ে আসক্ত, মহিলাটি যে বিবাহিত এসব আমাদের জানা হতে থাকে ধীরে ধীরে। ক্লোজ আপের আশ্চর্য বিন্যাসের মাঝখান দিয়ে। আর গদার এই ক্লোজ-আপের মধ্যে ভরে দেন দু-ধরনের তাৎপর্য। কখনো কখনো সেগুলো হয়ে ওঠে আধুনিক ভাস্কর্যের মতোই। যেন মানুষের জীবনে প্রেমের স্থায়িত্ব অথবা চিরন্তনতার দিকেই তাঁর ইঙ্গিত। আবার কখনো তা হয়ে দাঁড়ায় বিজ্ঞাপনের ছবির মতো। তখন যেন প্রেমের ক্ষণ-উদ্দীপনার দিকেই তাঁর কটাক্ষ।

সমালোচক 'ফিলিপ ফ্রেঞ্চ' এই প্রসঙ্গে ব্যবহার করেছেন দুটি ভিন্ন শব্দ, দুটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসঙ্গে, 'art and permanence' আর 'commerce and expendabity'. 'এ ম্যারেড উওমান' চিত্রনাট্যের Alister Whyte লিখিত ভুমিকায় আমরা পড়ি—

"In A married Woman Codard shows that man is a prisoner of the consumar society……It is a collage of disparate elements ; it is a frank but abstract sex film ; it is a sociological essay……"

একই সঙ্গে মুখরতা এবং নিরাসক্তি, একই সঙ্গে বন্ধন এবং মুক্তি দুটোই যেহেতু গদারের কাম্য, তাই ছবির আরম্ভের যৌন-মিলনের দৃশ্যটিকে অজস্র ক্লোজ আপে ভেঙে ছড়িয়ে দেন ইতস্তত ভঙ্গীতে, যাতে ইন্দ্রিয় দিয়ে উপভোগের কাছাকাছি পৌঁছেও শেষ পর্যন্ত বুদ্ধি দিয়েই তৃপ্ত করে নিতে হয় আমাদের অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধিকে। 'true sociologist' অথবা 'a student of society, not merely

someone with an advanced degree in sociology', গদারকে এভাবেও যদি না দেখতে চাই, তবুও তাঁর ছবিতে আবৃত হয়ে থাকে যে দ্বান্দ্বিকতা, তার সাহায্যেই বুঝে যাই যে গদার একই সঙ্গে এই চলমান সময়ের অভিভূত দর্শক এবং আক্রমণকারী সমালোচক। 'এ ম্যারেড উওম্যান'-এর প্রারম্ভিক যৌন-দৃশ্যেই তিনি একবার পাশাপাশি এনে দেন নায়ক-নায়িকার দুটি হাতের ক্লোজ-আপ। নায়িকার হাতে তার ওয়েডিং রিং। নায়কের হাতে তার রিস্টওয়াচ। কিছু যেন মন্তব্য করতে চান তিনি। হয়তো হতে পারে এরকম—

১। ভালোবাসার নৈতিক এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার পাশেই আধুনিক সময়ের সেই ভাঙন যা ভালোবাসাবাসির গা থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে সুস্থির ও সমুজ্জল সম্পর্কবোধ।

২। ভালোবাসার আকৃতি এখন আর কোনো সোনার আংটিতে সোনার চেয়ে দামী নীলকান্ত মনির মতো সুনির্দিষ্ট নয়, সে এখন রিস্টওয়াচের মিনিট এবং ঘণ্টার মতো প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তনশীল।

৩। ভালোবাসার সেইটুকুই সত্য, যতটুকু সময় ঘড়ির টিকটিকের মত স্পন্দ্যমান।

এই জাতীয় ধারনা তৈরী হওয়ার কিছু উপকরণ যেন ছড়ানো থাকে আশেপাশে। রবার্ট প্রশ্ন করে শার্লোতকে—

—তোমার স্বামী কি অনেকদিন বিবাহিত? না এটাই প্রথম?

শার্লোতের উত্তর

—না। তার স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে গেছে বিয়ের দু'মাস পরেই।......

উত্তর শেষ করেই শার্লোত যখন গান ধরে

Where have all flowers gone ?

Long time passing.

Where have all the flower gone ?

Long, Long ago.

তখন ফ্লাওয়ারের বদলে 'লাভ' ভেবে নিলেই যেন পরিচালকের আসল ভাবনাটাকে ছুঁতে পারি আমরা। বুঝতে পারি বেশ কিছুক্ষণের জন্যে নায়ক নায়িকার মুখে 'আই লাভ ইউ', 'ইয়েস', 'ড্যু য়্যু লাভ মী', 'ইয়েস' ইত্যাদি শোনানোর পরেই পর্দায় নিয়ে আসেন এলসা ত্রিয়োলের

লেখা 'The Nylon age—The soul' এর প্রচ্ছদের ক্লোজ-আপ।

গদারের ছবিতে ক্লোজ-আপের মূল্যবান ভূমিকা পালনের জন্যে শুধু যে চরিত্রদেরই ডাক পড়ে তা নয়। নাগরিক জীবনের নানাবিধ বস্তু, যা কিছুকে নিয়ে, জড়িয়ে, মিলেমিশে একটা সময়ের মূর্তি মূর্ত, তার সবকিছুকেই তিনি সাগ্রহে ডেকে আনেন তাঁর ক্লোজ-আপের সীমানায়। সেটা হতে পারে রেকর্ড জ্যাকেট, হতে পারে রাস্তার নিয়ন, পোষ্টার, রঙীন ছবিওয়ালা পোষ্টকার্ড, ম্যাগাজিনের বিজ্ঞাপন, দেওয়ালে টাঙানো ছবি, কমিক্‌সে, খবরের কাগজের হেডলাইন ইত্যাদি ইত্যাদি।

আর মুখাবয়বের ক্লোজ আপ সম্পর্কে গদারের উক্তি

"the face is not only part of the body, it is the prolongation of the idea which one must capture and reveal. A beautiful face, as La Bruyere wrote, is the most beautifull of sights. There is a famous legend which has it that Griffith, moved by the beauty of his leading lady, invented the clouse-up in order to capture it in great detail. Paradoxically, therefor, the simplest close-up is also the most moving. Here our art reveals its transcendence most strongly, mrking the beauty of the object signified brust forth for sign……"

॥ ৪ ॥

বার্গম্যান যতই এগিয়ে চলেছেন জীবনের অভ্যন্তর-রহস্যের উন্মোচনে ততই তাঁর ছবিতে ব্যাপক এবং বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে ক্লোজ-আপের ব্যবহার। 'পার্সোনা'-য় তিনি ব্যবহার করেছিলেন লংশট আর ক্লোজ-আপ। মিড শট পুরোপুরি অনুপস্থিত। এটা কি 'ইনটিমেসি' এবং 'ডিটাচমেণ্ট' কে তীব্রতর করার জন্যে সুপরিকল্পিত? প্রশ্ন করা হয়েছিল বার্গম্যানকে। তাঁর উত্তর—

"হ্যাঁ, স্বয়ং পরিচালকের দো-টানা মানসিকতা থেকেই গড়ে উঠেছে এটা। তুমি নিজে একজন পরিচালক। নিশ্চয় তোমারও অভিজ্ঞতা হয়েছে এ-রকম। কোনো একদিন সকালে মনে হল তোমার মধ্যে

জীবনশক্তি ফেটে পড়তে চাইছে যেন। শয়তানগুলোকে হাতের মুঠোয় পাবার জন্যে তোমার মধ্যে একটা বিরাট ছটফটানি, তাদের চ্যালেঞ্জ করার জন্যে, তাদের দেয়ালে গেঁথে ফেলার জন্যে। কাজের আনন্দেই তুমি চাইবে তাদের জ্বালাতে-পোড়াতে যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা তাদের অভিব্যক্তির সম্ভাব্য শেষ বিন্দুটুকুও তোমাকে জোগাতে পারছে। তাদের উপর জুলুম চালানো তাদের ক্ষমতার চৌহদ্দীকে ছাড়িয়ে দিতে। কখনো কখনো ক্লোজ-আপ এসে যায় পরিস্থিতির প্রয়োজনেই। কখনো কখনো তুমিই চাও তোমার সীমাকে ভেঙে ফেলতে, তোমার এবং তোমার অভিনেতৃদের। তাই যদি হয়, তাহলে বুঝতেই পারছো কী ভয়ংকর কঠিন আর কী প্রচণ্ড উদ্‌ঘটনাময় এই ক্লোজ-আপ, এর সঙ্গে যুক্ত সংলাপের কথা না হয় বাদই রাখলাম।"

'পার্সোনা'-র অনেক পরে 'সীন্‌স ফ্রম এ ম্যারেজ।' তৈরী করেছিলেন সুইডিস টি. ভি. র জন্যে, ছ পর্বে ভাগ করে। যেহেতু টি. ভি. র জন্যে ছবি, তাই সমস্ত ছবিটাই ক্লোজ-আপে। লংশট, মিডশট, পুরোপুরি পরিত্যক্ত। কেননা দর্শকের কাছে চরিত্রদের অন্তর্সংকটের বিস্ফোরণ-টাকেই ফুটিয়ে তুলতে হবে তাঁকে। পরিবেশের চেয়ে মুখের অভিব্যক্তির ভিতর দিয়ে হৃদয়ের অগ্ন্যুৎপাতটাই এখানে গুরুত্বময়।

অবশ্য এমন ভাবলে ভুল হবে যে অপরিমেয় এবং বিস্ময়কর ক্ষমতার অধিকারী এই ক্লোজ-আপ নামের সোনার কাঠিটি সম্বন্ধে তিনি বুঝি সচেতন ছিলেন না আগে। দু-দশক আগেই আমরা শুনেছি সেই স্বগত-ভাষণ, যেখানে মানুষের মুখের অনির্বচনীয়তার সম্পর্কে উৎসারিত তাঁর মুগ্ধবোধ। আর সেটাই প্রমাণ করে ক্লোজ-আপ বিষয়ে তাঁর সচেতনতা।

"এমন অনেক পরিচালক আছেন যাঁরা ভুলে যান যে আমাদের এই ফিল্ম-তৈরীর কাজটা গড়ে ওঠে মানুষের মুখাবয়ব থেকেই। অবশ্যই আমরা গভীর ভাবে মগ্ন হয়ে যেতে পারি মন্তাজের সৌন্দর্যে, আমরা যুগপৎ বস্তু এবং স্টিল-লাইফের ভিতরে জাগিয়ে দিতে পারি দারুণ ছন্দ, আমার প্রকৃতিকে আঁকতে পারি অবর্ণনীয় মাধুরীতে, কিন্তু মানুষের মুখাবয়বের কাছে এসে দাঁড়ানোই যে চলচ্চিত্র নির্মাণের সবচেয়ে বৈশিষ্ট-পূর্ণ ধর্ম, তা সন্দেহাতীত রূপে সত্য। এর থেকে আমরা সিদ্ধান্তে

আসতে পারি যে, চলচ্চিত্রে অভিনেতারাই সবচেয়ে ব্যায়বহুল যন্ত্র, ক্যামেরা শুধু সেই যন্ত্রের প্রতিক্রিয়াকে ধরে রাখার চেষ্টা করে।……

আমাদের বোঝা উচিত যে একজন অভিনেতার দখলে অভিব্যক্তি প্রকাশের সবচেয়ে বড় উপকরণটা হল তার চোখ। ক্লোজ-আপ, উদ্দেশ্যপূর্ণ, সুপরিচালিত ও সুঅভিনীত হয় যদি, পরিচালকের আয়ত্বাধীন শক্তির সবচেয়ে বড় অংশ সেটাই। আবার সেটাই তার দক্ষতা অথবা অক্ষমতারও সবচেয়ে বড় নিদর্শন।"

ফেলিনির মুখেও আমরা শুনতে পাবো প্রায় একই অভিজ্ঞতার প্রতিধ্বনি।

"নৈপুণ্য বা পেশাগত ক্ষমতার জন্যেই কেবল অভিনেতাকে আমি ব্যবহার করিনা। অভিনয়ে অনভিজ্ঞ হলেও কাউকে নিয়ে কাজ করতে পারি। ছবির জন্য অভিব্যক্তি-পূর্ণ মুখচ্ছবির সন্ধান করি যাতে প্রথম অভিনয়ে তারা নিজেরাই সমস্ত কিছু প্রকাশ করতে পারে।……

কোন অভিনেতা কোন চরিত্রে অভিনয় করবে তা নির্ভর করে আমার সম্মুখস্থিত মুখটির উপর, আমার সমস্ত অনুভব তখন তাকে ঘিরে, সে মুখ হয়তো এমন একজনের যাকে আমি ভালো করে চিনি না, যার সঙ্গে হয়তো সবেমাত্র আমার আলাপ হয়েছে। যদি আমার প্রথমে ভুল হয়, অর্থাৎ একটি মুখে যদি এমন কোন তাৎপর্য আরোপ করি যা তার প্রাপ্য নয়, তবে প্রথম শুটিংয়েই সচেতন হয়ে যাই এবং চরিত্রটি পরিবর্তন করি।…

প্রত্যেক মুখেরই নিজস্ব প্রকাশযোগ্য অভিব্যক্তি আছে, একজন অন্যের মুখ ধার করতে পারে না। এবং প্রকৃতির নির্ভুল সৃষ্টিতে প্রত্যেকটি মুখই একক।"

কাল ড্রেয়ারও এই একই কথা বলেন কিন্তু আরো আবেগময়তায়।

'অভিনেতাদের সম্পর্কে একটা কথা। যে-কেউ আমার ফিল্ম দেখেছেন, ভালো ফিল্মই, নিশ্চয়ই বুঝে গেছেন আমি কতখানি গুরুত্ব দিয়ে থাকি অভিব্যক্তির উপর। মানুষের মুখের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে এমন কিছুই নেই পৃথিবীতে। এটা একটা ভুবন, যেখানে অবিষ্কারের শেষ নেই। স্টুডিও-য় কাজ করার সময়, প্রেরণার রহস্যময় শক্তির চাপে একটি সংবেদনশীল মুখে যে অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে, তাকে প্রত্যক্ষ করার

অভিজ্ঞতার চেয়ে বড় আনন্দ নেই আর। "To see it animated from inside and turning into poetry."

কক্‌তো ফিল্মকে বলেছিলেন—ইমেজ-মেকিং মেশিন। কক্‌তো-র অনুকরনে এখন বলতে পারি, ক্লোজ-আপ হল ইমেজের জগতে—

পোইট্রি-মেকিং-মেশিন।
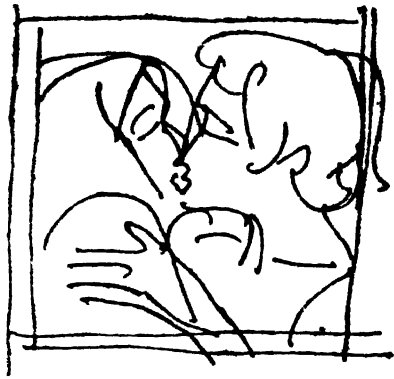
অশ্লীলতা এখন
চুম্বন এখন নগ্নতার পক্ষে

সম্প্রতি খোসলা কমিটি ভারতীয় চলচ্চিত্রে চুম্বন ও নগ্নতার প্রবেশপথের সদর দরজা থেকে 'ট্রেসপাসার উইল বি প্রসিকিউটেড' লিখিত ফলকটি সরিয়ে নিতে সম্মত হয়েছেন। অবশ্যই ভিতর মহলে 'কমিট নো নুইসেন্স' সাবধান বাণী অনুচ্চারিত থাকেনি।

এতেই থরহরি কম্পমান। ভারতবর্ষ চিন্তা-ভারাক্রান্ত। বঙ্গদেশ বিচলিত। যাঁরা সরল সুনীতি সুধার রসগ্রাহী, তাঁরা দেশের অত্যাসন্ন নৈতিক অধঃপতনের আশঙ্কায় বীরবাহুর পতনে মন্দোদরী তুল্য শোকে মুহ্যমান। এমন কি যে সব প্রযোজক-পরিচালক এতকাল চলচ্চিত্রের গায়ে 'আমোদ বিতরণের শিল্প' লেবেল এঁটে বেলেল্লাপনার 'মোচ্ছোব' চালিয়ে এসেছেন তাঁরাও চুম্বনের নামে চমকিত, নগ্নতার নামে নতমস্তক। অতি-সম্প্রতি বাংলাদেশেও 'বাংলা ছবিতে চুম্বন এসে গেল' শিরোনামায় একটি স্কুপ অথবা চোরা সংবাদ বেরোবার পর সংবাদটির প্রতিবাদে প্রযোজক পক্ষ যে সিংহ-বিক্রম দেখিয়েছেন, বাংলা-চলচ্চিত্র নির্মাতাদের নৈতিক রক্ষণশীলতার সেটি একটি অকাট্য দৃষ্টান্ত।

এই জাতীয় প্রতিবাদের পিছনের নিরুচ্চারিত স্বগতোক্তি যেন এই : এখনো গান, গাঁজা এবং শরৎ-চাটুজ্যে-চটকানো চোখের জলের কাহিনীকে

আধুনিক কোট প্যান্ট ও টপলেস পরিয়ে কিছু ক্রাইম কিছু কমেডীর তেল ঝাল মশলা মাখিয়ে পরিবেশন করলে দর্শকরা যখন দশ হাতে গিলছে, তখন এখুনি চুম্বন ও নগ্নতা নিয়ে মাথা ঘামানো কেন মশাই ?

সাদা কথা। তত্ত্বের ঘোর প্যাঁচ নেই। অন্যদিকে চাতুরীর চূড়ান্ত করেছেন জনা দুই খ্যাতনামা বোম্বাই চিত্রাভিনেত্রী। তাঁরা সম্ভবত আযৌবন ভারতীয় ঐতিহ্যের বোরখার মধ্যে লালিতা। তাঁদের একজন সাফ্ জানিয়ে দিয়েছেন, 'চুম্বন ও নগ্নতা ভারতীয় ঐতিহ্যের পরিপন্থী'। আরেকজন প্রশ্ন করেছেন ব্যাকুল কণ্ঠে, 'আমাদের সভ্যতা কি আবার ফিরে যাবে বর্বর যুগে ?' চলচ্চিত্র জগতের আরও অনেক হোমরা-চোমরা মহাপুরুষদের কণ্ঠে আরও যে সব মহাবাক্য উচ্চারিত, তা শুনে একটি মহা-জিজ্ঞাসা মনের মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে: প্রযোজক-ডিরেক্টরাই ছদ্মবেশী 'পিউরিটান' নয় তো ?

খোসলা কমিটির প্রস্তাব এখনো বোধ হয় সরকারীভাবে শিরোধার্য হয়নি। হলে যে তুলকালাম ঘটবে, সন্দেহ নেই। কারণ অশ্লীলতা প্রচারে এতকাল ছিল সাহিত্যেরই একাধিপত্য। অশ্লীলতার মারাত্মক ধ্বংসবীজ ছিল অক্ষরের জড় জগতে সীমাবদ্ধ। এবার রূপালী পর্দায় তার বিস্তার ঘটবে রক্তমাংসের স্বর্ণাক্ষরে। সাহিত্য ও চলচ্চিত্র দুয়ে মিলে গড়বে অশ্লীলতার যুক্ত ফ্রন্ট।

এহেন সংকটে নীতিবানের পাড়ায় সদ্য-বিধবার অনুকরণে 'ওগো সংস্কৃতি গো, তুমি অভাগা রুচিবানদের ফেলে কোন্ যমালয়ে গেলে গো' জাতীয় আর্তনাদ অস্বাভাবিক নয়। প্রতিবেশী হিসেবে শোকাতুরের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন একটি সামাজিক কর্তব্য। অতএব নিবেদন—

এত শোকাশ্রু অকারণ। আশঙ্কা অলীক। চুম্বন ও নগ্নতা অর্জুনের গাণ্ডীব। কর্ণের কবচ কুণ্ডল। আছে কিন্তু কাজে লাগবে না।

প্রথমেই ধরা যাক বোম্বাই ছবির কথা। চুম্বন ও নগ্নতা নিয়ে বোম্বাই নতুন কি বানাবে ? ইতিমধ্যে সেখানকার ছবিতে নগ্নতার যে নির্লজ্জ তাণ্ডব ঘটে গেছে আসল নগ্নতা তার চেয়ে অনেক বেশী শুভ্র, সুন্দর ও শিল্পময়। অনেক কম কামোদ্রেক-কারী। সুতরাং যারা বক্স অফিসের গর্ত ভরায়, সত্যিকারের নগ্নতার বিদ্যুৎ-ছটা তাদের চোখ ধাঁধালেও বুক-জোড়া বিকৃত নেশার গর্ত ভরাবে না। ফলে বোম্বাই ছবি

পুনরায় ফিরে আসবে ঘোমটার ভিতরকার খ্যামটা নাচে। এহ বাহ্য। আরও একটি মূল প্রশ্ন তুলেছেন জনৈক বোম্বাই চিত্রাভিনেতা। তেমন শিল্পী ভারতবর্ষে কে আছে যাঁর নগ্ন দেহপটের অমৃত পানে দর্শকের চক্ষু মাতাল হবে? অতএব শান্তি শান্তি, শান্তি।

আর বাংলা?

বাংলা দেশে তো এখনো প্রেম নিয়েই ছবি হয়নি। পূর্বরাগ পর্বের পরেই বিয়ে। প্রখ্যাত পরিচালকদের একটা মোটা অংশ এখনো নাবালক দাম্পত্য-প্রণয়ের মিষ্টি মধুর কাহিনীতেই মশগুল। সুতরাং সেক্স দূর অস্ত। তার আগে আমাদের অনেককেই হতে হবে চিন্তা ভাবনায় আরও দুঃসাহসী সাবালক। তা না হলে আধুনিক কালের ছন্নছাড়া জীবনকে নিয়ে যেমন আধুনিক কালের ক্যারিকেচার, সেক্স-এর শ্রাদ্ধও সেই পথে গড়াবে।

তা ছাড়া আমাদের দেশের যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচালক তিনি একাধিকবার ঘোষণা করেছেন যে শয়নঘরে ঢোকা তার পক্ষে অসম্ভব অসম্ভব। বুদ্ধিমান পাঠক অবশ্যই বুঝে নিয়েছেন যে শয়নঘর এখানে গূঢ়ার্থে অশ্লীলতারই অন্য নাম। রাখে কৃষ্ণ মারে কে? সুতরাং মাভৈঃ মাভৈঃ।

॥ দুই ॥

অতঃপর এইখানেই ইতি হওয়া উচিত ছিল এ-নিবন্ধের। তবু যে হচ্ছে না তার কারণ আরও কিছু ইতিহাস বাকী। মহাভারতে শান্তি-পর্বের পরেই মুষলপর্ব। রামায়ণে সীতা উদ্ধারের পরই সীতার অগ্নি-পরীক্ষা। এ নিবন্ধের সমবেদনা জ্ঞাপনের পরই আসল সমস্যার সূচনা।

অশ্লীলতা অথবা চুম্বন অথবা নগ্নতার প্রসঙ্গে দেশ জুড়ে কোলাহল। কিন্তু তার সবটাই 'শৃগালী ঐকতান' নয়। এমন কিছু কণ্ঠস্বর আছে যা স্বতন্ত্র, সুস্পষ্ট ও সতেজ। এমন কেউ আছেন যাঁদের বিশ্বাস ঐ বিষয়গুলি শিল্পীর আত্মপ্রকাশের, অস্তিত্বের ও আত্মজিজ্ঞাসার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। অশ্লীলতা তাঁদের কাছে দেহের বস্ত্র হরণ নয়। আত্মার উন্মোচন। অশ্লীলতা অন্ধকারে প্রস্থান নয়। আলোর খোঁজে অন্ধকারের প্রবেশ। কিংবা লরেন্স প্রসংগে সুধীন্দ্রনাথের উক্তি অনুযায়ী আপাত-খ্যাতির পথ ছেড়ে সত্যের অপ্রিয় অন্বেষণ।

এবার ঐ ভিন্ন কণ্ঠস্বরগুলির দিকে কান ফেরানো যাক্।

শিল্পী এম এফ হুসেন। অধিক পরিচয় নিষ্প্রয়োজন।

"নায়ক-নায়িকার চুম্বনের বদলে পাখীর ঠোঁট-ঠোকরানোর প্রতীক আমার মতে 'ইনটেলেকচুয়াল ডিজঅনেস্টি'। আর ন্যূড? ন্যূড আর নেকেডনেসের মধ্যে আশমান-জমিন ফারাক। ক্যানভাসে অথবা পর্দায় ন্যূড আঁকার সময় শিল্পীর প্রধান অন্বেষণ হল দেহাতীত 'ইটারন্যাল বিউটি'। অবশ্য চলচ্চিত্র-ম্যাগনেটদের হাতে নগ্নতা ও চুম্বনের 'ডি-কণ্ট্রোলড্' কি চেহারা নেবে, সেটা দুশ্চিন্তার বিষয়।...

"সম্প্রতি নেপালে গিয়ে একটা ছবির (অফ গডেস অ্যাণ্ড মেন) শুটিং করেছি। ছবির বিষয় মানুষ ও মানুষের সৃষ্ট ঈশ্বরের মধ্যেকার সম্বন্ধ। লোকচিত্র, ভাস্কর্য, মন্দির এবং ক্রিয়েটিভ সিম্বল অব লিঙ্গম এই সব উপাদান দিয়ে ছবিটি তৈরী। ছবিতে 'ন্যূড' রয়েছে। শুধু ভাস্কর্যের বা চিত্রকলার নয়। বাস্তবেরও। মানুষের দেহ মিথ্যে, যদি না তাতে ভাস্বর হয়ে ওঠে মানুষেরই অন্তর্নিহিত আশা আকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন আবেগের জয়-পরাজয়।

"কোন কোন সময় প্রতীক নিশ্চয়ই প্রয়োজনীয়। একজন শিল্পী হিসেবে আমিও দরকারী মুহূর্তে প্রতীককে কাজে লাগাই। কিন্তু যেখানে স্পন্দিত জীবনের আবেগকে ফোটাতে হবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে, সেখানেও মূর্ত বস্তুর পরিবর্তে মূক প্রতীক? দ্যাট উড মীন প্লেইন হিপোক্রাসী।"

পাঞ্জাবের প্রসিদ্ধ মহিলা কবি অমৃত প্রিতম।

"আমরা দিনে দিনে হিপোক্র্যাট হয়ে যাচ্ছি। মেরুদণ্ড ভাঙা মধ্যবিত্ত শ্রেণী ক্রমগত সেই সব জিনিসকে আঘাত করতে চায় যা ফ্রেস অ্যাণ্ড ভাইটাল, পাওয়ারফুল অ্যাণ্ড ডিসটারবিং। ইট বিকেমস প্যানিকি উইথ এনিথিং নিউ টু ইটস্ হাফ-বেকড নলেজ।

"আমি বিশ্বাস করি বাস্তব-বোধের ক্রমান্বয় এক্সপ্যানশনে। একটা সজীব সজ্ঞান মানুষ ক্রমাগত জীবনকে চায় বুঝতে। ক্রমাগত সে গ্রহণ করতে থাকে সবকিছু এমন কি সেই সবও এই মুহূর্তে যা ভয়াবহ। শিল্পের কাজ ক্রমাগত আমাদের জাগিয়ে যাওয়া। আমাদের দেশের চলচ্চিত্র আজ প্রাণহীন ও অর্থহীন। অন্য সব শিল্পের মত চলচ্চিত্রেরও উচিত সামাজিক বিধি-নিষেধের বেড়া ডিঙিয়ে আমাদের নতুন পথ দেখানো।

"আমাদের দেশের চলচ্চিত্রের থীম ঘুরছে কেবল সোশ্যাল ভ্যালু অ্যাণ্ড রিফর্মের আবর্তে। এই থীম যতক্ষণ না মুখ ঘোরাচ্ছে ব্যক্তির অথবা শিল্পীর নিজস্ব চেতনার দিকে, যা ডিপলি পার্সোনাল অ্যাণ্ড ইমোশনালি চার্জড, ততক্ষণ চুম্বন ও নগ্নতার গ্রহণ বর্জনের প্রশ্ন অবান্তর। একমাত্র নতুন থীমই হল এই ব্যাপারে হ্যাঁ অথবা না বলার অধিকারী।

"শিল্প কি? এন এণ্ডলেস প্রসেস অব বিকামিং।...যদিও জানি একদল অর্থগৃধ্নু ও অসৎ প্রয়োজকের হাতে চুম্বন নগ্নতা হয়ে উঠবে কেবল স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার, তবুও এই হল শিকল ভাঙার এবং নতুন বাতাসে ঘ্রাণ নেবার উপযুক্ত সময়।"

বি ডি গর্গ। ভারতীয় চলচ্চিত্রের খ্যাতনামা গবেষক।

"একটা বই নিষিদ্ধ। একটা ছবি বাতিল। একটা গান শ্বাসরুদ্ধ। একটা ছায়াছবির অঙ্গচ্ছেদ। একটা চিন্তার গুপ্ত-হত্যা। একটা মতামতের মুখ বন্ধ!

"যুগ যুগ ধরে একদল ডেসপট্স, ডিকটেটার্স ও ডেমোক্র্যাটস্-এর মারফৎ প্রশ্রয় পেয়েছে এই পারভার্স পাসটাইম। কেবল যুগভেদে মাত্রা-ভেদ। এই খেলা চলেছে আমাদের যুগেও। নিত্য-জিজ্ঞাসু মন, অনুসন্ধিৎসু হৃদয় এবং সৃজনশীল শিল্পীর কখনো মৃদু কখনো তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ যদিও চিরদিন এই বিকৃত বিলাসের পশ্চাদগামী।...

'সেন্সর বোর্ড খুব বিশ্বস্তভাবে নন-কনফরমিস্ট শিল্পীদের তৈরী ভয়াবহ ইমমরাল আইডিয়ার ছোঁয়াচে ব্যাধির হাত থেকে দেশের সর্বস্তরের মানুষকে রক্ষা করতে বিশ্বাসী। যদিও বার্নার্ড শ বলেছিলেন—

'It is immorality not morality that needs protection; it is morality not immorality that needs restraint; for morality with all the dead weight of human inertia and superstition to have on the back of pioneer, and all the malice of vulgarity and prejudice to threaten him is responsible for many prosecutions and many martyrdoms'. শ তাই কুখ্যাত। তাই মহামান্য লর্ড চেম্বারলেনের ভাষায় তিনি—

'an unscrupulous and blackguardly author'

"নেগেটিভ্-প্রহিবিটারী অ্যাটিটিউড একদিকে যেমন উৎসাহ যুগিয়ে চলেছে দেশের একশ্রেণীর প্রেসার গ্রুপকে, অন্য-দিকে তেমনিই বেড়ে চলেছে 'নিষিদ্ধ ফল' ভক্ষণের দুরন্ত তৃষ্ণা। পরিসংখ্যানে প্রকাশ ভারতবর্ষে মদ্যপায়ীর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। শাইনী শিলিং সকারস-এর চাহিদা আকাশ ছোঁয়া। ক্রাইম অ্যাণ্ড ভায়োলেন্সে ভরপুর ছবির বক্স অফিসও ষোলআনা ভরপুর। তাইতো এই ছড়া

The film is under official ban.

Because the hero utters 'damn'.

Well we will go to see another,

And watch a gangster shooot his mother.

"সত্যিই হিপোক্রাসী একটা চূড়ান্ত জায়গায় পৌঁচেছে আমাদের দেশে, যেখানে দেশের অর্ধেক মানুষ উলঙ্গপ্রায়, যেখানে এরটিক ভাস্কর্য ও সাহিত্যের প্রাচুর্য, যেখানে অধিকাংশ ধর্মাশ্রয়ী মানুষ এখনো অন্ধভাবে অলৌকিক প্রিমিটিভ রাইট্স-এ বিশ্বাসী, সেখানে ছবির পর্দায় ঝুঁকে পড়া ঘাড়ের দৃশ্যে অথবা নাটকে সেক্স নিয়ে সামান্য সংলাপে সেন্সরের মুখ রাঙা হয়ে ওঠে ভীষণ লজ্জায়। খাজুরাহোর দেয়ালে যৌনক্রীড়ারত 'মিথুন' দম্পতীর চিত্র পবিত্র। কিন্তু ক্যানভাসে তার ছায়া অশুদ্ধ।

"চেস্টারটনের একটা কথা মনে পড়ছে। অভিযোগ, একটা বালক নাকি কোনও একটি ছায়াছবির আকর্ষণে হত্যা করেছিল তার পিতাকে। চেস্টরটনের বক্তব্য, 'এটা যদি সত্যি ঘটে থাকে, তাহলে এক্ষেত্রে যে কোন সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরই উচিত ঐ বিশেষ ফিল্মটির নয়, ঐ বিশেষ বালকটির সম্বন্ধেই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ সংগ্রহ করা।' অবশ্য এরপর সেন্সের বোর্ড যদি মানুষের কমন সেন্স সম্বন্ধেই সন্দেহ প্রকাশ করে, আশ্চর্য হবার নেই।"

অবশেষে স্বয়ং খোসলা সাহেব।

"মোট কথা, অশ্লীলতার বিরুদ্ধে আইনের৷ প্রয়োগ ভগ, অ্যামবিগুয়াস, আন-সার্টেন, ইনকনসিস্টেণ্ট অ্যাণ্ড ইনএফেক্টিভ। সংক্ষেপে আইন হিসেবেই ওটা অযোগ্য। কোনটা অশ্লীল, কোনটা অশ্লীল নয় তার শেষ বিচারের ভার যদিও কোর্ট এবং সুপ্রীম কোর্টের হাতে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার যে সব অফিসিয়ালসদের ওপর,

শিল্প বা সৌন্দর্য-তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁরা নিতান্তই কাণ্ডজ্ঞানহীন। তার ফলে বিচারের ফলাফল হয় সংগতিহীন ও ভুমুখো। অশ্লীলতা সমাজকে জাহান্নমের পথে নিয়ে যাচ্ছে এটা মেপে দেখার কোন মাপকাঠি নেই, হতেও পারে না। সমস্ত ব্যাপারটাই রুচির প্রশ্ন। এবং জনসাধারণের উপরেই তার গ্রহণ-বর্জনের ভার থাকা উচিত।"

এখানে গিলিয়ান ফ্রিম্যান তাঁর 'আণ্ডারগ্রোথ অব লিটারেচার' নামের বইয়ে এরটিক ও পর্নোগ্রাফিক লিটারেচার বিষয়ে যা বলেছেন, তার, প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

"জনসাধারণ পর্নোগ্রাফিকের প্রভাবে নষ্ট ভ্রষ্ট হয় আমি আদৌ মানি না। তারা উত্তেজিত হতে পারে, আমোদ পেতে পারে, যৌন বাসনায় আপ্লুত হতে পারে। তাতে হয়েছেটা কি?

This results in no more than the excitement of an appetite, the selection of a stimulant as natural and as personal as the choiee of food. One man's meat is another man's pornography'."

এই হল কয়েকটি ভিন্ন চিন্তার, ভিন্ন কণ্ঠস্বরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এবার আসল প্রশ্নে আসা যাক।

॥ তিন ॥

অশ্লীলতা কি?

সুপ্রাচীন আলঙ্কারিক মতে অশ্লীলতা হোল—

'ব্রীড়াজুগুপ্‌সামঙ্গলাতঙ্কদায়ী'

যে কথা শুনে মনে লজ্জা ঘৃণা অথবা অমঙ্গলের আশংকা ঘটে, তাই-ই অশ্লীল। এখানে শোনা অর্থে পড়াও। এমন কি, দেখাও।

প্রশ্ন হল এই লজ্জা ঘৃণা ও অমঙ্গল আশংকার যোগানদার কি শুধু সাহিত্য? অথবা শিল্প?

উপরের অনুশাসন অনুযায়ী পথের মোড়ে মোড়ে জমে থাকা স্তূপাকার পূতি গন্ধময় জঞ্জালও তো অশ্লীল। কারণ তা দেখে আমাদের নাগরিক জীবনে সৌন্দর্য বোধের প্রত্যাশা হয় লজ্জিত।

ঘৃণা জাগে কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের অক্ষমতার প্রতি। রোগ বীজাণুর জন্মদাতা হিসেবে অবশ্যই অমঙ্গল আশংকার কারণ। এবং এই হিসেবে কোন না কোন কারণে—

যে কোন রাজনৈতিক কলহ অশ্লীল।

রাজনৈতিক ইস্তেহার অশ্লীল।

পথে ঘাটে গুণ্ডাদের উপদ্রব অশ্লীল।

ট্রাম লাইনের গর্ত অশ্লীল।

ছাত্রদের মিছিলে হাঁটা পরীক্ষা বর্জন চেয়ার ভাঙা অশ্লীল।

অধ্যাপক ও শিক্ষকদের নোট বই লেখা অশ্লীল।

প্রতি মুহূর্তে শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত লোকের যে কোন বাজে কথার প্রতিবাদ না করাও অশ্লীল।

ডাক্তারী বই অশ্লীল।

আদালতের কেস হিস্ট্রি অশ্লীল।

খবরের কাগজ অশ্লীল।

দিল্লী থেকে প্রচারিত বাংলা সংবাদ অশ্লীল।

রাত্রির অন্ধকার অশ্লীল।

ঘুমের স্বপ্ন অশ্লীল।

মানুষের পক্ষে ঝড়-ঝঞ্ঝা, ভূমিকম্প, বন্যা মহামারী যুদ্ধ-দাঙ্গা, খুন-খারাপী ভরা এই পৃথিবী অশ্লীল।

যে অশ্লীলতার তালিকা পেশ করা হল, এর ভুক্তভোগী কিছুসংখ্যক সাহিত্য পাঠক নয়। গোটা সমাজ। সমাজের গোটা অংশের তুলনায় সাহিত্য-পাঠকে সংখ্যা নগণ্য। বিশেষ করে আধুনিক সাহিত্যের। যাঁরা সাহিত্য পাঠ করেন, করে ভাবেন তাঁরা নিঃসন্দেহে শিক্ষিত। নিজস্ব বিচারবুদ্ধির, চিন্তাভাবনার নিয়ন্ত্রণে অবশ্যই সক্ষম। অপরের চিন্তার আকস্মিক বলাৎকার তাঁদের নিজস্ব সুরক্ষিত চিন্তা, প্রত্যয় ও বিশ্বাসকে তখুনি গর্ভবতী করে তুলতে অপারগ। সুতরাং সাহিত্যের অশ্লীলতা তাঁদের পক্ষে জরুরী সমস্যা নয়। তার চেয়ে অনেক জরুরী সমগ্র সমাজের জন্যে সমগ্র সামাজিক অশ্লীলতার বিরুদ্ধাচরণ।

অথচ চাকা ঘুরছে উল্টো দিকে।

সমাজ দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে বিষ যে রক্ত-পুঁজ, যে পতন-পচন,

যে অশ্লীল উৎপাত তার প্রতি শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী মহলে বিক্ষোভের বজ্রধ্বনি নেই। দেশ জুড়ে শহরে গ্রামে, আজ যে রক্তমাখা হত্যার তাণ্ডব বয়ে চলেছে, তার প্রতিবাদে ক'জন চেতনা-সম্পন্ন মানুষের বুকের বেদনা, মুখের বচন ঝলসে উঠল বিদ্যুৎ-রোষে ?

মাত্র কয়েক মাস আগের কাহিনী।

'লাইটহাউসে' দেখানো হচ্ছিল ফরাসী ছবি 'মুসেত'। সামনের সারিতে সাগ্রহী দর্শকদের টগবগে ভীড়টা ছিল ফরাসী চলচ্চিত্রের আধুনিকতার আস্বাদন নয়, অশ্লীলতার উপভোগ। কিন্তু চরম মুহূর্তেও বহু আকাঙ্ক্ষিত অশ্লীলতার আবির্ভাব না ঘটায় ধৈর্যহীন হয়ে তারা উলঙ্গ উল্লাসে চিত্রগৃহের মধ্যে তৎক্ষণাৎ যে দৃশ্যের অবতারণা করলেন, সেটা নাকি, প্রত্যক্ষদর্শীর মতে, বর্বর যুগের শিকার উৎসবেরই রকমফের।

প্রতিবাদ ওঠেনি। অশ্লীলতা-বিরোধী এক শ্রেণীর দর্শক, আর এক শ্রেণীর দর্শকের অশ্লীল আচরণকে গলাধঃকরণ করলেন শিবের গরল অথবা সক্রেটিসের বিষপানের মত অনায়াস নীরবতায়।

এই নীরবতার কারণ কি ? কারণ সম্ভবত যে, অশ্লীল আচরণ অশ্লীল সাহিত্যের মত সুশীল বালকটি নয়। সাহিত্যের অশ্লীলতা নির্জীব অক্ষরের মূকাভিনয়। মাস্তানী-অশ্লীলতা নিরক্ষরই নয় শুধু, বীর্যবান এবং বাচালও। সেখানে গুরুগিরি ফলাতে গেলে চণ্ডালের মার। মায় লাস শুয়ে পড়ারও সম্ভাবনা। তাই মৌনই বিধেয়।

যত সরব সোচ্চার আস্ফালন কেবল সাহিত্যের বেলা। ছত্রে ছত্রে ছিদ্রান্বেষণ। পরিচ্ছেদে পরিচ্ছেদে ছদ্মবেশীর গোপন তদন্ত।

তার কারণ কি ? সাহিত্যের স্বাস্থ্য-রক্ষা ?

"সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা বাক্যটি সম্পূর্ণ নিরর্থক। সাহিত্যের স্বাস্থ্য জিনিসটা কি এবং কোন বস্তুর সদ্ভাবের উপর তা নির্ভর করে, তার নির্ভুল হিসাব আজ পর্যন্ত কেউ দিতে পেরেছেন বলে আমি জানিনে। আর যদি ধরে নেওয়া যায়, সাহিত্যেরও স্বাস্থ্য বলে একটা গুণ আছে তাহলে সে স্বাস্থ্যরক্ষা করবেন কে এবং কি উপায়ে ? পুলিস ও সমালোচক সাহিত্যের উপর করা শাসনের বলে ? বলা বাহুল্য, যাঁরা এরূপ শাসনের পক্ষপাতী তাঁরা স্বাস্থ্যের বিষয় সব জানতে পারেন কিন্তু সাহিত্যের বিষয় কিছুই জানেন না।

"আমার মনে হয়, যাঁরা মুখে বলেন সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা, তাঁরা আসলে চান সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষা। আর তাঁদের কাছে সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষার অর্থ সমাজ রক্ষা। সমাজ সুস্থই হোক আর অসুস্থই হোক, তা যেমন আছে সেটা সেইভাবেই টিঁকে থাক, এই হচ্ছে তাঁদের আন্তরিক কামনা। এবং এই জাতীয় লোক কথাকে অত্যন্ত ডরান। কারণ তাঁদের ধারণা, সামাজিক মনের উপর কথার প্রভাব মারাত্মক, বিশেষত সে কথা যদি উজ্জ্বল ও মনোহারী হয়। পলিটি-শিয়ানরা যখন সমাজের উপরে খড়াহস্ত হন, তখন এই বিশেষ সম্প্রদায় বিচলিত হন না; কারণ তাঁরা জানেন, ও হচ্ছে কাজের কথা। কবির উক্তিই তাদের কাছে অসহ্য। কেননা, এ হচ্ছে ভাবের কথা। আর ভাবের স্পর্শেই মানুষের মনোভাব বদলে দিতে পারে, তেল-নুন-লকড়ির কথাতে পারে না; কারণ সে কথা মানুষের অন্তরাত্মাকে স্পর্শ করে না।"

কথাগুলি প্রমথ চৌধুরীর।

এত কথার মধ্যে আসল কথাটি এই, কবির উক্তিই অসহ্য। অসহ্য কারণ তাঁরাই অশ্লীলতার প্রকাশক। নগ্নতার পৃষ্ঠ-পোষক। কবি এখানে ব্যাপক অর্থে স্রজক। তিনি লেখকও হতে পারেন, চিত্রকরও। যুগ যুগ ধরে তাঁরাই স্বেচ্ছায় ঘাড় পেতে নিয়েছেন একটা গুরুভার দায়িত্ব। তা হোল, মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় করিয়ে দেওয়া। তাঁদের দৃষ্টিতে আত্মা আবরণহীন। তাঁরা জানেন, আত্মার ক্ষুধা কি কি? তাঁরা জানেন পুরুষ ও প্রকৃতি, সুন্দর ও অসুন্দর, ত্যাগ ও ভোগ, এক ও বহু, আবৃত ও নগ্ন অর্থাৎ সকল বিপরীতই আত্মার অহরহ সহচর।

সাহিত্য বা চিত্রকলা তখনই অশ্লীল, কেবলমাত্র তখনই অসহ্য যখন সে অশ্লীলতার ভান করে শুধু। নগ্নতাকে আবৃত করতে চায়। ইংরেজীতে 'ন্যুড' ও 'নেকেড' একই আকাশের দুই দিগন্ত নয়। নেকেডে-র গায়ে বসনের টানাটানি। 'ন্যুড' বসনহীন ললিত ভঙ্গী। এক কথায় 'ন্যুড' হল BODY RE-FORMED. কেনেথ ক্লার্কের ভাষায়—

'It is an art form invented by the Greeks in the 5th century B. C. just as opera is an art form invented

in 17th century Italy···it has the merit of emphasising that the nude is not the subject of art, but a form of art.'

বলেন্দ্রনাথের একটি তুমনামূলক আলোচনার অংশবিশেষও উপরের ইংরেজী উদ্ধৃতির পরিপূরক।

"প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে নব্যরুচির বিরুদ্ধ ভাষায় এসব অনেক কথা স্পষ্ট করিয়াই উল্লেখ আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ঋগ্বেদের পুরুরবা ও উর্বশীর উপাখ্যানের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঋগ্বেদের এই নগ্ন বর্ণনায় অশ্লীলতা, রুচি-অরুচি, শরীর-মন, এ সমস্ত অতি সূক্ষ্ম ভেদাভেদ লুপ্ত হইয়া গিয়া হৃদয়ের সহজ স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসে এমন একটি দীপ্তি প্রকাশিত হইয়াছে, যাহাতে সমস্ত পাপ, সমস্ত অবিশুদ্ধি নিমেষে ভস্মীভূত হইয়া যায়।

"জয়দেবে এই সহজ স্বাভাবিকতাটুকু নাই। সম্ভোগ বর্ণনা তাঁহার হৃদয় হইতে সহজ আবেগভরে বাধা বিঘ্ন ঠেলিয়া ফেলিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে নাই, বিলাস উদ্রেক মানসে ইঙ্গিতে ইশারায় নানা ছলে তিনি সমস্ত বর্ণনার মধ্যে অনেকখানি গরল সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন। এই নাগরিকতা, এই ঠারই সর্বাপেক্ষা জঘন্য।

"নইলে মানুষের শরীরও হেয় নহে। উলঙ্গতাও অপবিত্র নহে। উলঙ্গ যোগীকে দেখিয়া কেহ ত সঙ্কোচ অনুভব করে না। বরঞ্চ সেই নগ্ন দেহই পূণ্য দর্শন বলিয়া গণ্য হয়। উলঙ্গ শিশু কাহারও চক্ষে অপবিত্র নহে। এবং বন্য মানবের উলঙ্গতাও অশোভন বলিয়া গণ্য হয় না। কারণ আর কিছুই নহে, ইহার মধ্যে ঠার নাই, ইঙ্গিত ইশারা নাই, নাগরিকতা নাই।

"গ্রীসীয় নগ্ন প্রস্তরমূর্তি দেখিয়া কেহ ত অশ্লীল বলে না। প্রকৃতির অন্তর হইতে সেই নগ্ন গঠন যেন স্বভাবতই অভিব্যক্ত হইয়াছে। তাহার *আবরণ নিষ্প্রয়োজন। আবরণের কথা সেখানে মনেই আসে না।*"

অশ্লীলতার ইংগিতই অশ্লীল। অশ্লীলতার লুকোচুরিহীন পূর্ণ প্রকাশ পবিত্র, শুদ্ধ, মহিমাময়।

এই বক্তব্যের আরো জোরালো সমর্থনে আমি এমন একজনকে হাজির করতে চাইছি যাঁকে অনায়াসে বলতে পারি বিংশ শতাব্দীর প্রথম

প্রচণ্ড অশ্লীল লেখক। তাঁকে কেন্দ্র করেই এই শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে অশ্লীলতা-বিরোধী আন্দোলনের প্রথম শুভ উদ্বোধন। তবে তখনকার প্রচণ্ড অগ্নিশর্মা সমালোচকেরও সাহিত্যের সুবিচার প্রত্যাশায় আদালতের হাঁটুতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়াটাকে অশ্লীল মনে করার মত রুচিবোধের অভাব ছিল না। তাই উক্ত অশ্লীল লেখককে নিয়ে তাঁর সমালোচকবৃন্দ খেউড়ের আসর বসিয়েছেন কিন্তু আসামীকে আদালতে সোপর্দ করতে এগোননি এক পা। অরসিককে রস নিবেদনের শাস্ত্রবর্ণিত নিষেধে তাঁরা ছিলেন নিষ্ঠাবান।

মূলে ফিরি। যে প্রচণ্ড অশ্লীল লেখকের কথা বলছি, একবার তিনি একটি অশ্লীল উপন্যাসের সমালোচনা লিখেছিলেন পত্রাকারে। প্রিয় বন্ধু প্রিয়নাথ সেনের উদ্দেশে—

"নগেন্দ্র গুপ্তের তমস্বিনী পড়ে দেখলুম। ঠিক হয়নি। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, বাঙ্গলা উপন্যাসে তিনি উন্মুক্ত Realism-এর অবতারণা করতে চাচ্ছেন। তাতে আমি আপত্তি করিনে। কিন্তু সেটা পারা চাই। যেমন নাচতে বসে ঘোমটা সাজে না, তেমনি এ রকম বিষয় লিখতে বসে কিছু হাতে রাখা চলে না। সম্পূর্ণ নির্ভীক নগ্নতা ভাল, কিন্তু স্বল্প আবরণ রাখতে গেলে আব্রু নষ্ট হয়। এই বইয়ে তাই হয়েছে। গ্রন্থকার সাহসপূর্বক সব কথা পরিষ্কারভাবে শেষ পর্যন্ত বলতে পারেন নি, সেই জন্য তার self-conscious ভাব প্রকাশিত হয়ে রচনাটিকে লজ্জিত করে তুলেছে। নগেন্দ্রবাবু তার ঘটনা-বিন্যাসের স্বাভাবিক পরিণামের পূর্বেই হঠাৎ থেমে যাওয়াতে বোঝা যাচ্ছে, নিঃসঙ্কোচ নিরাবরণ তাঁর লেখনীর পক্ষে সহজ নয়। ওটা তিনি জবরদস্তি করে করেছেন। ফর ইনস্টান্স, সেই বিধবা মেয়েটির সঙ্গে একজন ছোকরার ঘনিষ্ঠতার কথা উত্থাপন করলেন, তবে তার অন্ত্যেষ্টি-সৎকার না করে ছাড়লেন কেন? ও রকম স্থলে যা হতে পারে সেটাকে সরলভাবে তার সম্পূর্ণ বীভৎস মূর্তিতে পরিস্ফুট করলেন না কেন? এসব জিনিস তিনি ছুঁতে ঘৃণা করেন অথচ নাড়তে প্রবৃত্ত হয়েছেন, সেই জন্যে সব কথা ভাল করে প্রকাশ করতেও পারেন নি, ভাল করে গোপন করতেও পারেন নি।"

পত্রলেখকের নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ইনি নগ্নতা অথবা অশ্লীলতা ভাল করে গোপন করতে পারতেন।

প্রমাণ 'চতুরঙ্গ'। অথবা অশ্লীলতা অথবা নগ্নতাকে ভাল করে প্রকাশ করতেও পারতেন। প্রমাণ চিত্রাবলী। একদা অসংখ্য অশ্লীল গানের বন্যার তোড়ে ইনি বাংলাদেশকে জাহান্নামের পথে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে মেতেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সেনাপতিত্বে একদল রক্ষণশীল মহাপ্রাণ সেদিন এগিয়ে না এলে অশ্লীলতার মহাপ্রলয়ের তলদেশে বাংলাদেশের মহাপ্রয়াণ হয়ে উঠেছিল অনিবার্য।

অথচ ইতিহাসের কি নির্মম পরিহাস। আজ রবীন্দ্রনাথ আর পঠিত হয় না। কেবল গীত হয়। তিনি কেবল বেঁচে আছেন তাঁর গানে। এবং কামগন্ধ নাহি তায়।

॥ চার ॥

এসব পুরোনো কাসুন্দি।

অশ্লীলতাকে নিয়ে আজকের নতুন কালে দেখা দিয়েছে নতুন ধাঁচের অভিযোগ। দামিনী সম্বন্ধে শচীনের অভিযোগ ছিল—"স্পষ্টই দেখা যাইতেছে মেয়েরা প্রকৃতির চর। প্রকৃতির হুকুম তামিল করিবার জন্যই নানা সাজে সাজিয়া তারা মনকে ভোলাইতে চেষ্টা করিতেছে।

নতুন কালের অভিযোগ যেন এরই প্যারোডি।

"অশ্ললিতা প্রতিক্রিয়াশীলতার চর। প্রতিক্রিয়াশীলদের হুকুম তামিল করিবার জন্যই নানা সাজে সাজিয়া গণচেতনা সম্পন্ন বিপ্লবী মনকে ভোলাইতে চেষ্টা করিতেছে।"

অশ্লীলতা অথবা অশ্ললীতা-গন্ধী সাহিত্য বিপ্লবের অথবা বিপ্লব-গন্ধী চেতনার পরিপন্থী কিনা, গভীর বিতর্কের বিষয়। তবে এই মুহূর্তে একজন বাঙালী লেখকের কথা মনে পড়ছে, যিনি যৌনবোধকে জীবনের অথবা চেতনার অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে জেনে এবং মেনেও বিপ্লবী। এই লেখকের নাম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা উপন্যাসে তার রচিত 'চতুষ্কোণ' প্রথম মহামূল্যবান অশ্লীল রচনা। সেখানে কাহিনীর নায়ক আপাত-অশ্লীলতার অন্ধকার বেয়ে যেখানে পৌঁছতে চেয়েছে, তা নরকের গহ্বর নয়, নির্বাণের দিগন্ত। তার অন্বেষণ যৌনতা নয়, দৈহিক যৌন-অভিজ্ঞতা নয়, জীবনের সঙ্গে যৌনতার যোগে অথবা বিয়োগে জীবনের রূপান্তরকে সঠিক করে জানা।

কমিউনিস্ট অথবা বিপ্লবী হবার পরেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা থেকে অশ্লীলতার উপাদানও উধাও হয়ে যায় নি। তিনি এমন চরিত্রও রচনা করেছেন, যে মেয়েমানুষের দিকে তাকালেই তাকে দেখতে পায় সম্পূর্ণ উলঙ্গরূপে। অথচ তাঁর সমগ্র রচনা থেকে উৎসারিত হয় যে বোধ, তা আমাদের টেনে নিয়ে যায় না পূতিগন্ধময় অশ্লীলতার ভাগাড়ে। তিনি কেবল আমাদের শোনান কিছু কিছু মানুষের, কিছু কিছু চরিত্রের অচরিতার্থ অস্তিত্বের ভিতরকার রক্তমাংসের ক্ষুধিত রোদন।

এই রোদন, এক একটি খণ্ড খণ্ড মানুষের এই নিঃসঙ্গ পঙ্কিল হাহাকারকে একই সঙ্গে সমাজের বৃহৎ পটভূমিকায় সমগ্র সামাজিক কাঠামোর ভগ্নদশার, ভগ্ন স্বাস্থ্যের প্রতিরূপ এবং তার প্রতিবাদ হিসাবে গ্রহণ করতে অসুবিধে কোথায়? মার্কস ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন না। 'ধর্ম জনগণের আফিং'—এ তাঁরই কথা। কিন্তু তিনিও স্বীকার করেছেন নিকৃষ্ট সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মপ্রেরণা সমাজ ব্যবস্থার দুর্গতিরই প্রতিরূপ এবং প্রতিবাদও বটে।

কোনারক অথবা খাজুরাহোর 'এরটিক' ভাস্কর্য নিয়েও একদিকে অশ্লীলতার অভিযোগ অপর দিকে কেন অশ্লীল তার বিশ্লেষণ বহুকাল ধরে চলে আসছে। কোনারক খাজুরাহোর যুগে তন্ত্রসাধনার প্রভাব ছিল সমাজের গভীরে। তখন 'ভোগ'ই গৃহীত হয়েছিল ত্যাগের মার্গ রূপে। দুটি নর-নরীর দৈহিক মিলন, সঙ্গম, শৃংগার ছিল পরম প্রকৃতির সঙ্গে পরম পুরুষের যোগ। এই যোগেই অনন্তকে, ঈশ্বরকে জানা অথবা উপলব্ধি করা, এবং সেই সঙ্গে পার্থিব জীবনকে অতিক্রম করে যাওয়া।

এই প্রসঙ্গে 'কালী মূর্তির কথাও ওঠে। সন্দেহ নেই কালীর আকৃতিতে অশ্লীলতা প্রকট। সন্দেহ নেই এই কালীই আবার বাংলা দেশে শক্তি সাধনার দেবী হিসেবে সম্মানিত। বহু বিপ্লবের প্রেরণা-দায়ী। তবু প্রশ্ন দেবী গড়তে গিয়ে এমন বীভৎস অশ্লীল করে কেন গড়া হল কালীকে?

নিবেদিতা-র ব্যাখ্যা এই প্রসঙ্গে অপরূপ।

"তিনি যে ভয়াল ভয়ংকরী প্রথমেই চোখে পড়ে। তিনি উলঙ্গিনী। স্বামী বক্ষে নৃত্য-পরা। কণ্ঠে নৃমুণ্ডমালা। সদ্য নিহতের তপ্ত রক্তপানে

ব্যাদিত রসনা।……তিনি স্বয়ং ত্রাস। এই কি তরুণী হিন্দুনারীর ছবি। হিন্দু নারীর স্বামী ভিন্ন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। তিনি এতই মাধুর্যময়ী, লজ্জাশীলা, সংকুচিতা, সর্বদা সর্বাঙ্গে আবৃতা নম্র কোমল প্রেমময়ী মাতা। কালী এই হিন্দু নারীর বিপরীত প্রতিচ্ছবি।……কালী মায়া মিথ্যা। কালী তারই প্রতীক। কালীকে যদি আদর্শ হিন্দু নারী করে চিত্রিত করা হতো, তাহলে তিনি সত্য হয়ে উঠতেন। তাঁর অবাস্তবতা দৃশ্যমান করবার জন্য— তাঁকে আদর্শ না-নারী রূপে চিত্রিত করা হয়েছে। ……তাই কালীকে ভেদ করে দৃষ্টি প্রেরণ করতে হবে। তাঁকে অতিক্রম করে যেতে হবে।"

এই বৈপরীত্য, সংঘষ, এই দ্বন্দ্ববাদই সব সৃষ্টির সব সাধনার মূল কথা।

বিপ্লবী মায়াভস্কি ব্যক্তিগত প্রেমের প্রচণ্ড ব্যর্থতার অসহ্য সংকট মুহূর্তে বারংবার হৃদয়ের ক্ষত জুড়োতে নিজেকে মানুষের ভীড়ে লুকোতে চেয়েও পারেন নি। তাই সেই ভয়াবহ স্বগতোক্তি—

"I jump, I jump

But I can't jump out of my existence"

নিজের অস্তিত্বের, চেতনার, ক্ষমতার গণ্ডীকে ক্রমাগত অতিক্রম করার দুরন্ত প্রয়াস এবং অতিক্রম করতে না পারার সচেতন ব্যর্থতাবোধই শিল্পীমাত্রকে উন্নীত করে মহত্বের সিংহাসনে।

টলস্টয় ঋষি। তাঁর অন্বেষণ ছিল ঈশ্বর। তাঁর লক্ষ্য ছিল শান্তি। কিন্তু লেখার সময় নিজের অগোচরে, নিজের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বকে অস্বীকার করতে না পেরে বারবার ফিরে এসেছেন সামাজিক জীবনের অশান্ত ঘূর্ণিঝড়ে। বার বার ফিরে এসেছেন শয়নঘরে। তাঁর সমস্ত বৃহৎ সৃষ্টির মূল কেন্দ্রে রয়েছে দাম্পত্য-জীবনের নিদারুণ ব্যর্থতা, জীবন ও যৌন-তাড়নার সংঘাত। একদিন গর্কীকে বলেছিলেন—

A man goes through earthquake, epidemis, the horrous of disease, and all sorts of spiritual torments, but the most agonizing tragedy he ever knows always has been and always will be the tragedy of the bedroom."

টলস্টয় বৈপরীত্যের সম্রাট। তিনি যখন অহিংসা ও শান্তির বাণী প্রচার করছেন, ব্যক্তিগতভাবে তখন তিনি সাঁতার কাটছেন সুখ-সম্ভোগের অশ্লীল স্রোতে। তাঁর মতবাদের প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে সমাজের সর্বস্তরে। যুবক সম্প্রদায় হয়ে উঠেছে যুদ্ধ বিরোধী। সৈনিকের খাতায় নাম লেখাতে অনিচ্ছুক। অন্যদিকে তখন সংবাদপত্রে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্রের স্ক্যাণ্ডাল। একাধিক ধিকৃত চিঠির রচয়িতা তাঁরই স্ত্রী, যিনি প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পৌঁছেও আপন গর্ভে টলস্টয়ের ঔরসজাত সন্তান ধারণে বাধ্য। টলস্টয়ের যৌন-বাসনার ও লাম্পট্যের স্বেচ্ছাচারী ইতিহাস বিশ্ববিদিত।

অথচ সাহিত্যে তিনি চাইতেন শ্লীলতার প্রকাশ। গর্কীর একটি রচনা থেকে নীচের দৃষ্টান্ত।

"মস্কোয়, সুখারেভ টাওয়ারের কাছে আমি একবার একটা নষ্ট নারীকে দেখেছিলাম, মদ খেয়ে নোংরা নর্দমার মধ্যে পড়ে থাকতে। দুর্গন্ধময় পাঁকের মধ্যে গা ডুবিয়ে শুয়ে সে কাতরাচ্ছিল, হাত পা ছুঁড়ছিল, কিন্তু উঠতে পারছিল না।"

বলতে বলতে তিনি কেঁপে উঠলেন। বন্ধ করলেন চোখ। মাথা নেড়ে কি যেন ভাবলেন। তারপর আবার বলতে লাগলেন খুব মৃদু স্বরে—

"একটা মাতাল মেয়ের চেয়ে কুৎসিত কদর্য আর কিছু হয় না। আমি একবার ভেবেছিলাম মেয়েটাকে তুলবো। তুলিনি শেষ পর্যন্ত। কারণ তুমি যদি একবার ওকে ছোঁও, এক মাস ধরে ধুলেও তোমার হাত থেকে নোংরা দাগ উঠবে না। ইস, জঘন্য! খানিকটা দূরে একটা পাথরের উপরে বসেছিল একটা ছোট ছেলে। ধূসর চোখ। মাথায় সোনালী চুলের ঢেউ। তার চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে গাল বেয়ে। মাঝে মাঝে সে ফুঁপিয়ে উঠেছে। আর বলছে—মা, মা-আ-আ, ওঠো। মাতাল মেয়েটা বারবার চেষ্টা করছে ওঠার জন্যে। মাথা তুলছে। আবার লুটিয়ে পড়ছে পাঁকে।"

তিনি চুপ করে গেলেন। নিজের চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপর কানে কানে চুপি চুপি বলার মত করে বলতে লাগলেন আবার—

"জঘন্য, জঘন্য। তুমি কি এরকম মাতাল মেয়ে অনেক দেখেছ নাকি? তা বলে ওদের নিয়ে লিখো না। কখনোই লিখো না।"

—"কেন, লিখবো না কেন?"

আমার চোখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে তিনি আমারই কথার পুনরুক্তি করলেন—

—"কেন, লিখবোনা কেন?"

তারপর তিনি ধীরে ধীরে চিন্তামগ্ন স্বরে বলতে লাগলেন—

"কেন, আমি জানি না, তবে আমার, আমার নিজস্ব চিন্তায় পাশবিক বা জান্তব বিষয় নিয়ে লেখা লজ্জাকর। কিন্তু সত্যিই তো, লিখবো না কেন? একজন লেখক সব কিছু নিয়েই লিখবে।"

তাঁর চোখের কানায় কানায় ভরে উঠেছে অশ্রুবিন্দু। তিনি চোখ মুছে আবার হাসবার চেষ্টা করলেন। গালের ভাঁজ পড়া চামড়া বেয়ে দু-একটি অশ্রুর ফোঁটা গড়িয়ে পড়ল। তিনি রুমাল তুলে নিলেন হাতে।

"আমি কাঁদছি। আমি একটা বুড়ো মানুষ। আমার বুকের ভেতরটা সত্যিই কেঁপে ওঠে, যখনই কোন বিকৃতির কথা ভাবি।"

আমার দিকে তাকালেন ঘুরে।

"তুমিও বাঁচবে, তোমার সুদীর্ঘ জীবন কাটবে পৃথিবীতে। কিন্তু পৃথিবীতে সব কিছুই রয়ে যাবে তেমনিই, আজ যেমন আছে। এবং আজ আমি যেমন কাঁদছি তোমাকে এর চেয়ে অনেক বেশীই কাঁদতে হবে। কিন্তু…কিন্তু সত্যিই সব কিছু নিয়েই লেখা উচিত। সব কিছু নিয়েই। নইলে পাথরের উপর বসে ছিল যে ছোট্ট সোনালী চুলের ছেলেটা সে আহত হবে। সে তোমার কাছে এসে তুলে ধরবে তার নালিশ। বলবে—এ সত্য নয়। বলবে—তুমি যা লিখছো তা আংশিক সত্য। not the whole truth."

গর্কী একদা টলস্টয়ের নিবিড় সান্নিধ্যে দিন কাটিয়েছেন। নানা দিক থেকে তাঁকে দেখছেন উল্টে-পাল্টে। তাই তাঁর কলমে ব্যক্ত হতে লজ্জা পায়নি এই কথাগুলি—

'Lev Tolstoi was a great man, and the fact that nothing human was alien to him by no means darkens

his bright image. Nor does this bring him down to our own level. It would be psychologically perfectly natural for great artists to be greater in their sins than the common ruck of sinners."

প্রচণ্ড পাপী টলস্টয়ের দিকে তাকিয়ে নাস্তিক গর্কীর মন্তব্য—

"This man is like God."

সাহিত্যের অথবা চলচ্চিত্রের অশ্লীলতাকে তবু বিচার-বিশ্লেষণ করে প্রগতি অথবা প্রতিক্রিয়ার স্বর্গ অথবা নরকে পাঠানো যায়। কিন্তু চিত্রকলার বেলায় সেটা কি ভাবে সম্ভব? পিকাসোর কথাই ধরা যাক, তিনি সারা জীবনে কম করে কয়েক শ' ন্যুড এঁকেছেন। ওঁদের ওটা আঁকতেই হয়। আবার সেই পিকাসোই এঁকেছেন শান্তির পায়রা। এঁকেছেন গের্নিকার ছবি। ফ্যাসিস্ট স্পেনের বর্বর স্বৈরচারী শাসনের বিরুদ্ধে তাঁর তুলি জ্বলে উঠেছে বজ্রানলে। পিকাসো এবং মাতিস জাতীয় শিল্পীদের এই যে লক্ষ লক্ষ নগ্ন চিত্র পৃথিবীর বুকে জমা হয়ে আছে, এগুলি কি সমাজের অথবা দেশের অথবা পৃথিবীর পক্ষে ক্যানসার বীজাণুর মত ভয়াবহ? কেন নয়? অথচ উল্টোদিকে এসব থাকা সত্ত্বেও পৃথিবীতে এমন কি ফ্রান্সেও বিপ্লব ঘটে কি করে?

॥ পাঁচ ॥

অশ্লীলতাকে আমি ভয় পাই না। ভাবিও না। যেহেতু কেউ অশ্লীলতায় আকৃষ্ট হতে চাইলে তাকে রোধ করার ক্ষমতা আমাদের নেই। আমাদের রক্তে অথবা কব্জিতে এমন কালাপাহাড়ী দুঃসাহস ও দুর্বার শক্তি নেই যে ভারতবর্ষ থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করবো তাকে। সেটা করতে গেলে আমাদের বেদ বেদান্ত উপনিষদ রামায়ণ মহাভারত এই প্রসিদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলি পোড়াতে হয়। খাজুরাহো কোনারকের মূর্তিময় ভাস্কর্যরাশিকে শাবল গাঁইতি ও হাতুড়ি পিটিয়ে ভাঙতে হয়। কালিদাস, জয়দেব, ভারতচন্দ্রকে তুলে দিতে হয় কর্পোরেশনের জঞ্জাল ফেলা গাড়িতে। কৌটাল্যের অর্থশাস্ত্র বাৎসায়নের কামসূত্র ইত্যাদিকে উপরে কাঁটা নীচে কাঁটা দিয়ে পুঁতে ফেলতে হয় সতেরো হাত গর্তে। দেশ থেকে বন্ধ করতে হয় সমস্ত রকম পুজো-আচ্চা। কারণ তার

মন্ত্রের মধ্যে রয়েছে অশ্লীলতা। পূজানুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে এই যে ঘটস্থাপনা, অষ্টদল পদ্ম, এই যে ঘটের গায়ে সিঁদুর-পুত্তলিকা, সর্বতোভদ্র-মণ্ডলের জ্যামিতিক ছক এই সবের মূলেও রয়েছে নারী জননেন্দ্রিয়, এবং মানবীয় প্রজনন পদ্ধতির পূর্ণাঙ্গ নকল। সরকারী ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর প্রতীক হিসেবে আমরা রোজ যে লাল ত্রিভুজটি দেখি, সেটিও ঐখান থেকে আহৃত বা গৃহীত। তন্ত্রের ত্রিভুজ। নারী-জননাঙ্গের বিমূর্ত প্রতীক। এবং সর্বশেষে প্রত্যেক মানুষের বুক থেকেই কেটে নিতে হয় তার হৃদয়ের আধখানা, যেহেতু অন্যান্য যাবতীয় মহৎ অনুভূতির মত, যৌনানুভূতির প্রথম স্পন্দনের ঐটিই গর্ভাগার।

না, এটাই শেষ কর্তব্য নয়। এর চেয়েও সুকঠিন কিছু আছে। তা হচ্ছে পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ। আজ যদি ভারতবর্ষের সমস্ত সাহিত্যিক জীবনের বিপুল গভীর রহস্য থেকে মুখ ঘুরিয়ে শুধু মাত্র তাইচুং ধানের চাষাবাদ বিষয়ে রচনায় ধ্যানস্থ হন, তবুও ভারতবর্ষকে অশ্লীলতামুক্ত করা যাবে না। সাগর পারের গল্প উপন্যাস কবিতা চলচ্চিত্র ঐ বস্তুকে এদেশের আকাশ, বাতাসে, নিশ্বাসে ব্যাপ্ত করে রাখবে। কারণ আজ আমরা একই সঙ্গে একটা গোটা পৃথিবীর বাসিন্দা। হো চি মিন কিংবা মাও সে তুং-কে আমরা চোখে দেখিনি। তাঁদের সম্পর্কে শুনি কিংবা পড়ি কেবল। কিন্তু আমাদের দেশে বহু যুবকের রক্তে তাঁদের আদর্শ, তাঁদের জীবন্ত উপস্থিতিরই সমতুল্য। তাই দেয়ালে দেয়ালে পড়ি 'চীনের চেয়ারম্যান, আমাদের চেয়ারম্যান'।

একজন সচেতন মানুষ যদি তেমনি করে বলে পৃথিবীর যাবতীয় পাপ, অশ্লীলতা, যৌনতাও আমাদের, সে কি মিথ্যাচারী!

তা ছাড়া শিল্পী হিসেবে আমি ভয়ানক আশাবাদী। প্রতিদিন এত দারিদ্র, শোষণ, শাসন, আর্তনাদ, কান্না, হত্যা, রক্তপাত, অশ্লীল দারিদ্র, উৎকট বড়মানুষী, অসম বণ্টন ও সামাজিক অসাম্যের প্রত্যক্ষদর্শী হয়েও পৃথিবীর সব মানুষ যেমন এর বিরুদ্ধে এখনো এবং এখুনি বিপ্লবী অথবা বিদ্রোহী হয়ে ওঠেনি, ঠিক তেমনি ভাবেই বিশ্বাস রাখা যায় যে মাত্র খানকতক উপন্যাস কি চলচ্চিত্রের অশ্লীলতা পৃথিবীর অথবা ভারতবর্ষের অথবা বাংলাদেশের সব মানুষকে নরকে টেনে নিয়ে যেতে এখনো এবং এখুনি একেবারেই অক্ষম।

॥ ছয় ॥

Nothing human alien to me এইটি ছিল মার্কসের সবচেয়ে প্রিয় কথা। এই কথাটি প্রত্যেক শিল্পী-সাহিত্যিকের প্রথম উচ্চারণ এবং শেষ উক্তি হতে অপরাধ কোথায় ?

দেশ। বিনোদন সংখ্যা

বাংলা চলচ্চিত্রের বার্ধক্য ও তারুণ্য

মহাভারতে, কুরুক্ষেত্রের অত বড যুদ্ধে, পঞ্চপাণ্ডবের কেউই নিহত হননি। পাণ্ডববংশের পক্ষ থেকে নিধন ঘটেছিল শুধুমাত্র তরুণ-প্রাণ অভিমন্যুর, সপ্তরথী পরিবৃত হয়ে।

আমাদের এই বিশ শতকের গোড়ায় যুগপৎ স্বদেশী এবং সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের যুগেও, কোনো তেজস্বী নেতা, কোনো অগ্নিবর্ষী বাগ্মী, কোনো দুর্ধর্ষ নায়ককে আমরা রণক্ষেত্রে আত্মদান করতে দেখিনি। দেখেছি কয়েকটি তরুণ যুবাকে। তাদের কারো নাম ক্ষুদিরাম। কারো বা বিনয় বাদল দিনেশ। কারো হাতে বন্দুক। কারো হাতে বিষের শিশি। কারো গলায় ফাঁসির দড়ি।

রাজনীতির ক্ষেত্রে তারুণ্যের এই মৃত্যুহীন প্রাণদানের মহত্ত্বকে অক্ষয় করে রাখার তাগিদে একদা রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন একটি কবিতা।

'আমি যে দেখছি তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে
কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে।'

আমার আলোচ্য বিষয়, জানি, রাজনীতি নয়, চলচ্চিত্র। আরো বিশদ করে বলতে গেলে, বাংলা চলচ্চিত্রের বর্তমান চেহারা এবং চলচ্চিত্র নির্মাণে তরুণ চিত্র পরিচালকদের সমস্যা। সংক্ষেপে, বাংলা চলচ্চিত্রের বার্ধক্য ও তারুণ্য।

বিষয় চলচ্চিত্র অথবা রাজনীতি, শিল্পসৃষ্টি অথবা স্বাধীনতা সংগ্রাম,

যাই-ই হোক, তারুণ্যের পক্ষে যে কটি বিষয়কে এড়িয়ে চলা একান্তভাবেই অসম্ভব, তাই-ই সম্ভবত উৎকীর্ণ হয়ে আছে উদ্ধৃত কবিতার দুটি পংক্তিতে। যথা—

১।—উন্মাদ হওয়া

২।—যন্ত্রণাবোধ

৩।—নিষ্ফল হতে পারি জেনেও নিজের সৎ এবং সুদৃঢ় সিদ্ধান্তের পাথরে মাথা কোটা।

আমাদের চলচ্চিত্র জগতের দিকে তাকালেই চোখে পড়বে, চারিদিকে ছড়ানো তারুণ্যের বিপজ্জনক মৃত্যুদৃশ্য।

যা গতানুগতিক, যা চর্বিত-চর্বণ, যা বহু ব্যবহারে জীর্ণ, বহু দর্শনে বিরক্তিকর, যা কিছু অগভীর, অশালীন, অপদার্থ, তারই গলায় জনতার জয়মাল্য, দর্শকের তুমুল জয়ধ্বনি, অর্থবানের আগ্রহী পৃষ্ঠপোষকতা। মৃত্যুশয্যায় কিংবা মৃতপ্রায় কেবল তারুণ্য। যেহেতু অস্তিত্বের গভীরে সেই-ই সবচেয়ে জ্যান্ত-জীয়ন্ত। যেহেতু আকাঙ্ক্ষার গভীরে সে সত্য এবং শিল্পের প্রতি একনিষ্ঠ। আধুনিক চলচ্চিত্র নির্মাণে তরুণ পরিচালকদের সমস্যা আজ খুবই প্রকট। পৃথিবীর সব দেশেই তরুণ পরিচালকদের পক্ষে চলচ্চিত্র নির্মাণের সুযোগ-সুবিধের পরিমাণ সীমিত। অথচ অন্য দিকে তরুণ পরিচালকদের ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, কল্পনাশক্তি, নতুন নতুন সৃষ্টির উদ্যমের পরিমাণ অসীম। তার ফলেই সংঘাত। আর সেই সংঘাতের পরিণামেই তরুণ পরিচালকেরা একদিকে বিদ্রোহী চলচ্চিত্রের এসট্যাবলিশমেণ্টের বিরুদ্ধে, অন্যদিকে বিদ্রোহী চলচ্চিত্রের যাবতীয় এসট্যাবলিশড্ নিয়মাবলীর বিরুদ্ধে।

চলচ্চিত্রে এই বিদ্রোহের ফরাসী নাম নিউ ওয়েভ। আমেরিকান নাম আণ্ডারগ্রাউণ্ড অথবা প্যারালাল সিনেমা। ব্রিটিশ নাম ফ্রি সিনেমা। ভারতবর্ষের মাটিতেও এই জাতীয় নিয়ম-না-মানা সিনেমার পদধ্বনি আজ আর অস্ফুট নয়। কেউ কেউ ইতিমধ্যে এই নতুন-জাগা আন্দোলনকে প্যারালাল সিনেমা নামে সম্বোধন করতেও শুরু করে দিয়েছেন।

এই সব আন্দোলনকে যে-নামেই ডাকা হোক, তাতে সমস্যার কোনো সমাধান হয় না। নতুন জাতের চলচ্চিত্র শুধু নতুন দৃষ্টিভঙ্গী

বা শিক্ষাবোধ নিয়ে আসে না, আসে নতুন সমস্যা নিয়েও।

যে কোনো সিনেমাই প্রাথমিক স্তরে অর্থের মুখাপেক্ষী। এক্ষেত্রে একজন কমার্শিয়াল চিত্রপরিচালকের সঙ্গে তরুণ চিত্রপরিচালকের কোনো প্রভেদ নেই। মূলধন দুজনেরই প্রয়োজন। তফাৎ শুধু এইখানে, কমার্শিয়াল চিত্রপরিচালকের কাছে প্রযোজকরাই এগিয়ে আসেন মূলধন নিয়ে। তরুণ পরিচালককে ক্ষ্যাপার মতো খুঁজে বেড়াতে হয় পরশমণি। এমন কি মূলধন পেলেও তরুণ পরিচালকের সমস্যা মেটে না। তখন রয়ে যায় আরেক সমস্যা। সেটা হল মূল ইচ্ছানুযায়ী ছবি করার সমস্যা। অনেক ক্ষেত্রে এই মূল ইচ্ছা অর্থাৎ ছবিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার বাসনা বা উদ্যমই হয়ে দাঁড়ায় মূলধন সংগ্রহের পক্ষে সবচেয়ে বড় অন্তরায়। কারণ চলচ্চিত্রে অর্থের জোগান দেওয়া যাঁদের পেশা, চলচ্চিত্রে শুধু শিল্পের রূপলাবণ্য বা ছলাকলায় মন মজানো তাঁদের নেশা নয়।

সম্প্রতি এই প্রাথমিক সমস্যার কিঞ্চিৎ নিরসন ঘটিয়েছেন এফ এফ সি। এফ এফ সি-র দাক্ষিণ্যে ভারতবর্ষের বেশ কিছু তরুণ পরিচালক তাঁদের নিজস্ব চিন্তাভাবনা, নিজস্ব ধ্যান-ধারণা, নিজস্ব প্রয়োগ-পদ্ধতিকে, কোনো রকম কম্প্রোমাইজ না করেই, রূপ দিতে পেরেছেন নিজের চলচ্চিত্রে। আবার এফ এফ সি-র সাহায্য-সহযোগিতার আনুকূল্যে বঞ্চিত হয়েও কিছু তরুণ পরিচালককে আমরা এগিয়ে আসতে দেখেছি, যাঁরা চলতি হাওয়ার পন্থী নন, অর্থাৎ চর্বিত-চর্বণে আস্থাহীন।

নতুন গোত্রের এই সব ছবির সামগ্রিক সার্থকতাকে চুলচেরা বিচার করার আগে একটা কথা মেনে না নিয়ে উপায় নেই যে, প্রচলিত চলচ্চিত্রের চেয়ে এগুলো স্বাদে আলাদা, ভঙ্গীতে ভিন্ন, বক্তব্যে সাহসী, প্রয়োগনৈপুণ্যে উজ্জ্বল।

কিন্তু শুধুমাত্র নির্মাণ হওয়াই চলচ্চিত্রের শেষ কথা বা উদ্দেশ্য নয়। নির্মাণ হওয়ার পরেও আরো দুটি সমস্যার কালো ডানা ঘিরে থাকে তাকে। তার প্রথমটি হল, রিলিজ হওয়া। অথাৎ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ। নতুন গোত্রের ছবির পক্ষে এ-এক নিদারুণ সমস্যা। কারণ এই জাতীয় ছবির ক্ষেত্রে পরিবেশক বা প্রদর্শক-গোষ্ঠীর অনীহা বা অনাসক্তি উচ্চতায় প্রায় পর্বতপ্রমাণ। এবং এক্ষেত্রে এফ এফ সি-র

আনুকূল্যে তৈরী এবং ব্যক্তিগত উদ্যমে তৈরী, দু ধরনের ছবিরই নিয়তি এক। কারণ এফ এফ সি শুধুমাত্র প্রযোজনার ক্ষেত্রেই সহযোগী। পরিবেশনায় উদ্যোগী নয়। ইচ্ছা বা সংকল্প অবশ্যই আছে। কিন্তু সে সাধু সংকল্প এখনো কেবল প্রস্তাব ও পরিকল্পনার বাক্যজালে বন্দী।

মুক্তিলাভের পরই যে কোনো চলচ্চিত্রকে মুখোমুখি হতে হয় সবচেয়ে প্রবলতম সমস্যার। সে সমস্যার নাম কম্যুনিকেশন। দর্শকের সঙ্গে বোঝাপড়া বা সম্বন্ধ স্থাপনের সমস্যা। কিন্তু নতুন গোত্রের ছবির বেলায় প্রায়শই দেখা যায়, পরিচালকের ভাষা দর্শক পড়তে বা বুঝতে পারছেন না। কিংবা যেটুকু পারছেন, তাতে মন ভরছে না। কিংবা মন ভরাচ্ছে এমন এক শ্রেণীর দর্শকদের, শুধুমাত্র যাদের শুভেচ্ছা বা শুভদৃষ্টি কোনো একটা অসম্ভব লো-বাজেট চলচ্চিত্রকেও অনিবার্য লোকসানের হাত থেকে উদ্ধার করতে অপারগ।

অতঃপর ?

অতঃপর তরুণ পরিচালকেরা কি করবেন? সৃষ্টির প্রারম্ভেই কি ঘোষণা করবেন, হে বন্ধু বিদায়? না কি আত্মসমর্পণ করবেন স্বর্ণপ্রসবা গতানুগতিকতার শ্রীচরণে?

এই প্রশ্নের উত্তর যাই হোক সেটাকে আপাতত দূরে সরিয়ে রেখে, এর উল্টো পিঠটাকে সামনে তুলে ধরা যাক। সংকল্প, অথবা উদ্দেশ্য অথবা আদর্শের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম এমন নির্মম, ভয়াবহ, বিপদসংকুল এবং বিঘ্নময় জেনেও তরুণ পরিচালকেরা কেন প্যারালাল সিনেমা কিংবা নিয়ম-না-মানা চলচ্চিত্রের প্রতি আগ্রহে এত অধীর, উৎসাহে এমন উদ্বেল? এই প্রশ্নটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচারের জন্যেই এই আলোচনা। কিন্তু আলোচনার অন্দরমহলে পা বাড়ানোর আগে প্রধান ফটকের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে অন্য একটা প্রশ্নের মীমাংসা করে নেওয়া দরকার।

তরুণ পরিচালক কে, বা কারা? যিনি শুধুই বয়সে তরুণ? আকৃতিতে নবীন যুবা? দেখতে শুনতে তরুণের মতো? তরুণ পরিচালক কি বয়সে তরুণ হতে বাধ্য? বয়স্ক পরিচালকের কি তরুণ হতে বাধা? ছেচল্লিশ বছর বয়সে প্রাজ্ঞ সমালোচক লিণ্ডসে অ্যাণ্ডারসন যখন রাগী যুবকের মতো কলম ছেড়ে হাতে তুলে নেন ক্যামেরা, তিনি তখন

তরুণ না প্রৌঢ় ? কিংবা ফরাসী কক্‌তো যখন কবিতার সুর-রিয়ালিজমকে চলচ্চিত্রেও প্রাণবন্ত করে তোলার প্রাণপণ উৎসাহে মেতে ওঠেন, তখন তাঁর চেতনার রঙ যাই হোক, চুলের রঙ ছিল সাদা। তিনি তখন তরুণ না বৃদ্ধ ?

সৃষ্টির ক্ষেত্রে আমাদের অন্বেষণ বয়সের তরুণতা নয়, চেতনার তারুণ্য। যে তারুণ্য গড়তে গিয়ে ভাঙে। ভাঙতে ভাঙতে গড়ে। যে তারুণ্যের মুখে হঠাৎ কোনও একদিন ঝলসে উঠতে পারে সন্দীপের কণ্ঠস্বর— 'আমি যা চাই, তা আমি খুবই চাই। তা আমি দুহাতে করে চটকাব, দুই পায়ে করে দলব, সমস্ত গায়ে তা মাখব, সমস্ত পেট ভরে তা খাব।'

যে তারুণ্য বিশ্বাস করে পরিবর্তনে।

"I believe that any change in a creative profession is eventually beneficial, because changing means growing and living. Even a change for the worse gives the critical mind food for thought and might cause further changes for the better." —Otto Preminger.

যে তারুণ্য নতুন কালকে নতুন ভাষায় রূপ দিতে উৎসাহী।

"If we study the modern film poetry, we find that even the mistakes, the out-of-focus shots, the shaky shots, the unsure steps, the hesitant movements, the over-exposed, the under-exposed bits, have become part of the new cinema vocabulary, being part of the psychological and visual reality of modern man."

—Jones Makas.

আসল কথা, তারুণ্য চিরকালই নবীনতা ও নতুনের পক্ষে। সব সময়েই তার প্রবণতা এক পা এগিয়ে থাকার দিকে। যা ঘটে গেছে, দেখা গেছে, শোনা গেছে, তাকে অতিক্রম করে যাওটাই তার স্বভাবের ধর্ম। যা আজো অনাবিষ্কৃত, অনাস্বাদিত, তাকে খুঁজে বের করে আনার দিকেই তার অধীর টান। এই হিসেবে বিচার করলে, আমাদের দেশের সব তরুণ বয়সী পরিচালকই তরুণ পরিচালক নয়। গরিষ্ঠ অংশই স্বভাবে

সনাতন। প্রবণতায় প্রাচীন। তাঁরা স্ব-পরিচালিত নন। চলেন অন্যের নির্দেশে। একজন তরুণ কবি অথবা তরুণ চিত্রকর বললে সহজে আমরা যা বুঝি, একজন তরুণ পরিচালক বললে আজ আমরা তা বুঝি না।

একজন তরুণ কবি আজ যখন কবিতা লিখতে শুরু করেন, তিনি কখনোই আরাম্ভ করেন না ভারতচন্দ্র কিংবা গোবিন্দ দাস কিংবা রঙ্গলাল বা হেমচন্দ্র বা ঈশ্বর গুপ্ত থেকে। এমন কি নিজেকে শিক্ষিত করার প্রয়োজনে তিনি হয়তো প্রচুর পরিমাণে পাঠ করেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু সৃষ্টির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথও তাঁর পরিপূর্ণ প্রেরণা নয়। তিনি শুরু করেন সেই বিন্দু থেকে, যেখানে ছেদ টেনেছে তাঁর অগ্রবর্তীরা। পূর্বগামীদের কাছ থেকে পাঠ নিয়ে, পূর্বগামীদের উত্তরাধিকারকে সম্যক অনুশীলন ও অনুভব করেই, তাঁরা অতিক্রম করে যেতে চান অতীতকে। যে-দিকে অথবা যে-গভীরে না-বাওয়া রয়ে গেছে অগ্রজদের নৌকো, সেই অনাবিষ্কৃতের দিকেই তাঁদের অভিযান।

তাঁরা হয়তো ছন্দ শেখার জন্যে সত্যেন দত্তের চর্চা করেন। কিন্তু নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার দুরূহ গরজে তাঁদের শেষ পর্যন্ত গড়ে নিতে হয় নিজস্ব ছন্দের বৃত্ত। একজন তরুণ চিত্রকরও তাই করেন। তিনি অগ্রজদের অনুশীলন করেন নিশ্চয়ই। কিন্তু গড়ার বেলায় গড়তে চান এমন জিনিস যা হবে আগের কালের অনুকরণ নয়। নিজের কালের নতুন ছাঁদের সৃষ্টি। কবিতা বা চিত্রশিল্পের বেলায় এক ঝাঁক তরুণ এই অহংকার, এই স্পর্ধা এবং এই স্পৃহা নিয়ে এগিয়ে আসেন বলেই সাহিত্যে বা শিল্পে এক-একটা যুগ এমন করে এগোয় এবং বৈশিষ্ট্যময় হয়ে ওঠে। আমরা অনায়াসে অনুভব করতে পারি তিরিশের দশকের কবির সঙ্গে ষাটের দশকের কবির তফাৎ। বিশ্লেষণ করতে পারি ছবির ক্ষেত্রে ক্যালকাটা গ্রুপের সঙ্গে আজকের তরুণদের পার্থক্য।

কিন্তু চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে তা ঘটে না। ঘটে না, তার কারণ কবিতা বা চিত্রকলার জগতে পুরুত-পাণ্ডার উপদ্রব নেই। কিন্তু চলচ্চিত্রে আছে। যখন কোনো তরুণ কবি কবিতা লেখেন বা শিল্পী ছবি আঁকেন, তখন পুরুত-পাণ্ডারা তাঁদের পিছনে এসে কানে কানে অবিরাম পরামর্শ দেন না, ওহে অমন করে না লিখে এমন করে লেখো। অথবা ঐ ধাঁচের

ছবি না এঁকে এই ধাঁচের আঁকো। এতে তোমার বিক্রি বাড়বে বেশী। খাতির এবং খ্যাতির পরিধিও হবে বিস্তৃত। উথলে উঠবে জনসমাদরের জোয়ার।

কিন্তু চলচ্চিত্রের বেলায় এরকম পুরুত-পাণ্ডার সংখ্যা অগণন এবং সর্বত্র। আকাশে বাতাসে তাঁরা সর্বত্রই ঐ একই উপদেশ দিয়ে চলেছেন, চলচ্চিত্র যদি করতে চাও, অমুক ধরনের করো। লোকে দেখবে। টাকা হবে। আবার ছবি করবে। আবার লোকে দেখবে। আবার টাকা হবে। সুতরাং লোকে কি চায় সেটা আগে বুঝে নাও। কতটা দুধে কতটা জল। কতটা গব্যে কতটা বনস্পতি। কতটা সিমেণ্টে কতটা বালি। কতটা শিল্পকলায় কতখানি ছলচাতুরী। জান তো চলচ্চিত্র শুধু আর্ট নয়, ইণ্ডাস্ট্রি।

তরুণ পরিচালকদের মধ্যে যাঁরা মেরুদণ্ডহীন, উদ্দেশ্যহীন, অহংকারহীন, আত্মবিশ্বাসহীন এবং সর্বোপরি শিল্পচেতনাহীন তাঁরা সহজেই দ্রবীভূত এবং বশীভূত হয়ে যান ঐ ঘুমপাড়ানো মন্ত্রে। তারপর ঘুম ভাঙলে সাঁতার কাটা শুরু হয়ে যায় গড্ডলিকাপ্রবাহে। কোনো না কোনো প্রতিভাবানের প্রাণপাত উদ্যমে বাংলা চলচ্চিত্র উজান ঠেলে যতটুকুও বা এগিয়ে ছিল, আবার শুরু হয়ে যায় কাদাজলের ভাঁটায় পিছিয়ে পড়া। অবশ্য এই জাতীয় তরুণ পরিচালকদেরও সমস্যা আছে। তবে তার প্রকৃতি ভিন্ন রকম। প্রযোজক, যিনি তাঁদের টাকার জোগান দেবেন, তাঁর বড় ইচ্ছা তাঁর প্রিয় এবং পছন্দসই কয়েকটি মহিলাকে ছবিতে নামাতেই হবে। তখন এই জাতীয় তরুণ পরিচালকদের সমস্যা, চিত্রনাট্যে কয়েকটি নতুন নারী চরিত্র ঢোকানো। প্রযোজক বড়ই সঙ্গীতপ্রিয়। তাঁর প্রবল বাসনা, নির্মীয়মাণ ছবিতে গানের সংখ্যা হবে দশটি। পরিচালকের সমস্যা কীভাবে নতুন গানগুলির জন্যে নতুন সিচুয়েশন সৃষ্টি করা যায়।

প্রযোজক খুবই সাহিত্যরসিক। তিনি নিজেই নির্বাচিত করেছেন জনৈক প্রখ্যাত সাহিত্যিকের একটি কাহিনী। কিন্তু কাহিনীটি বিয়োগান্ত। প্রযোজক একেবারেই বিয়োগান্ত কাহিনীর গুণগ্রাহী নন। আগে ছিলেন। যখন পর পর অনেকগুলি বিয়োগান্ত কাহিনী সুপার হিট অথবা হিট করেছিল। এখন তিনি বিয়োগান্তের বিরুদ্ধে। অতএব

পরিচালকের সমস্যা কাহিনীর শেষাংশকে নতুন ছাঁচে ঢালাই করা। চিত্রনাট্যে যিনি ইতিপূর্বেই মৃত তাকে চুলে চিরুনি, গায়ে জামা কাপড়, পায়ে জুতো এবং মুখে সংলাপ জুগিয়ে পুনরায় জাগিয়ে তুলতে হবে তাঁকে। প্রযোজক শুধু জাতে নন, স্বভাবে-চরিত্রে খাঁটি বাঙালী। তাই বাঙালী জীবনের পারিবারিক কাহিনীই তাঁর সবচেয়ে প্রিয়। কিন্তু যেহেতু দর্শকরা বড় খারাপ, বড় অশিক্ষিত, এবং বাংলা ছবির একেবারেই সমঝদার নয়, তাই তিনি চান হিন্দী ছবির যৎসামান্য কিছু তাঁর ঐ শান্ত স্নিগ্ধ বাঙালী জীবনের ঘরোয়া কাহিনীতে ঢুকিয়ে দেওয়া হোক। যৎসামান্য মানে কোথাও না কোথাও খানিকটা মারামারি। কোথাও না কোথাও খানিকটা ক্যাবারে নাচ। আর বেডরুম সিকোয়েন্সটাকে যদি……। পরিচালকের সমস্যা, তাঁকে তথাস্তু বলতে হবে।

একজন প্রযোজক কিংবা চলচ্চিত্রের পুরুত-পাণ্ডারা যখন ক্রমাগত এই জাতীয় ঘটনা ঘটিয়ে চলেন, কোন খেদ নেই। খেদ এবং ক্ষোভ আগুনের রঙ হয়ে ওঠে তখন, যখন একজন তরুণ পরিচালক এগুলি মেনে নেন মাথা পেতে। প্রযোজক করেন, তাঁর স্বার্থ আছে। তিনি টাকা চান। যেহেতু এটা তাঁর ব্যবসা। এবং চলচ্চিত্র শুধু শিল্প নয়, ইণ্ডাস্ট্রি। কিন্তু একজন তরুণ পরিচালক কেন করেন? এবং উত্তর নিশ্চয়ই এই—

১। টাকা অর্থাৎ তাঁর প্রাপ্য দক্ষিণামূল্যের জন্যে।

২। খ্যাতির লোভে। ছবি চললে খ্যাতি বাড়বে। আরো ছবি পাবেন। দক্ষিণাও বাড়বে।

৩। সামাজিক সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভের আকাঙ্ক্ষায়।

৪। আর্থিক সাফল্যে ধন্য অসংখ্য চলচ্চিত্রের জন্মদাতা হিসেবে ইতিহাসে স্মরণীয় হওয়ার বাসনায়।

না। এই চতুর্থ বাসনাটি তাঁর কোনদিনই পূর্ণ হবেনা। পূর্ণ হতে দেবে না কে? দেবে না তাঁর পৃষ্ঠপোষক, তাঁর গুণগ্রাহী, তাঁর ভক্ত, অনুরক্ত ঐ সব প্রযোজক, পরিবেশক এবং পুরুত-পাণ্ডারাই।

কেন?

কেন জানি না। অন্তত আমাদের দেশে যে এমনটি হয়ে আসছে এবং হতে থাকবে তা জানি।

প্রমাণ ?

প্রমাণ চান। তাহলে একটা সভা ডাকুন। সেই সভায় যে কোনো একজন প্রযোজক, পরিবেশক অথবা প্রদর্শককে বক্তৃতা করতে বলুন। প্রমাণ পেয়ে যাবেন একেবারে হাতে-নাতে।

তাঁরা কি বলবেন ?

তাঁরা বলবেন, বাংলা চলচ্চিত্র সমগ্র ভারতবর্ষের গৌরব। শুধু ভারতবর্ষের নয়, সারা বিশ্বেও আজ তার সম্মানের আসন। এবং এই সম্মান আমাদের এনে দিয়েছেন মাত্র কয়েকজন গুণী পরিচালক। যথা সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন, তপন সিংহ।

এরই নাম ইণ্ডাস্ট্রির পরিহাস।

সত্যজিৎ রায় ঠিক আছে। ওতো বলতেই হবে। তাঁর পাশে ঋত্বিক ঘটক কেন? মাত্র দুটির বেশী তো তাঁর কোনো ছবি চলে নি। আবার মৃণাল সেন? যাঁর সাম্প্রতিক রাজনৈতিক মতামত এবং অতিরিক্ত টেকনিক-প্রিয়তা অধিকাংশেরই এত উষ্মার কারণ? একেই বলে আশ্চর্য! যাঁরা সকল সময়ে কমার্শিয়াল ছবির পিছনে, গতানুগতিক চলচ্চিত্রই যাঁদের ধ্যান-জ্ঞান, জনতার মনোরঞ্জনই একমাত্র তপস্যা, যে কোনো বিভিন্ন স্বাদের ছবিই যাঁদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের লক্ষ্য, যাঁরা স্বপ্নেও কোনদিন ঋত্বিক ঘটক বা মৃণাল সেনকে দিয়ে ছবি করাবেন না, তাঁরাই বক্তৃতায় কিংবা প্রবন্ধে এঁদের কৃতিত্ব ঘোষণায় সরব, কেবল এঁদেরই প্রতিভায় মুগ্ধ, সৌভাগ্যে ধন্য।

অথচ যাঁরা কমার্শিয়াল ছবি তৈরী না করলে ইণ্ডাস্ট্রি বাঁচত না, যাঁরা প্রাণপাত করেন প্রযোজকের টাকাকে চতুর্গুণ করে ফিরিয়ে দিতে, যাঁদের নিয়ে প্রযোজক মহলে টানাটানি, যাঁদের ছবি অশ্বমেধের ঘোড়ার মতো সুদূর মফস্বলের দিগ্বিদিক পর্যন্ত জয় করে বেড়ায় হাউসফুলের জয়ধ্বজা উড়িয়ে, যাঁদের ছবি দেখতে দেখতে দর্শক ফেটে পড়ে কর্কশ উল্লাস ও কদর্য কলরবের অভিনন্দন জ্ঞাপনে, তারা চিরকালই বক্তৃতায় প্রবন্ধে, শ্রদ্ধা ও সম্মানের ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রীয় প্রতিযোগিতায়, সমালোচকদের বাৎসরিক সালতামামিতে রয়ে যান উপেক্ষিত, অনুচ্চারিত।

আবার যাঁরা কমার্শিয়াল ছবির পরিচালক, তাঁরাও এই অনাদরে বিন্দুমাত্র বিচলিত নন। তাঁরা নগদ বিদায়ের জয়োল্লাসেই নিজেদের

চরম পুরস্কৃত জেনে পরিতৃপ্ত। মূলত ইতিহাস রচনা কিংবা ইতিহাসে স্থানলাভের জন্যে বিন্দুমাত্র ব্যগ্রতায় কখনোই এঁদের চিত্তে চাঞ্চল্য জাগে না। অথচ তাঁদের সার্থকতার এই জয়োল্লাসও কত ক্ষণস্থায়ী। আজ যিনি দিগ্বিজয়ী, যাঁর দরজায় প্রযোজকের লাইন, মাত্র একটি কি দুটি ফ্লপ করলেই তাঁর প্রতিভা ম্রিয়মাণ, প্রতিষ্ঠার স্বর্ণসিংহাসন অবজ্ঞার অতলজলে বিসর্জিত।

গত দশ বছরে বাংলা চলচ্চিত্র, নিয়ে যত প্রবন্ধ, যত বক্তৃতা রচনা করা হয়েছে, আমরা তার মধ্যে কোথাও কোন একটি ক্ষুদ্রতম সেন্‌টেন্‌সের এক কোণেও শৈলজানন্দের নাম উচ্চারিত হতে দেখিনি। আজকের জেনারেশন আদৌ জানে না, সাহিত্যিক শৈলজানন্দ একদা ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ পরিচালক। অথচ তখনকার কালে সর্বাধিক ছিল তাঁর প্রতিপত্তি। শুনেছি সম্মানমূল্যও। তাঁর তৈরি একাধিক ছবি পর পর সুপার হিট। হয়তো তার চেয়েও বেশী। তখনকার কালে এত ফিল্ম ম্যাগাজিন ছিল না। অন্যান্য প্রচার মাধ্যমও ছিল সীমাবদ্ধ। রেডিও আজকের মতো গ্রামে গঞ্জে, ঘরে ঘরে কলরব তোলে নি। তা সত্ত্বেও শহর থেকে অনেক দূরে, অনেক দূরান্তেও তাঁর 'শহর থেকে দূরে' এবং অন্যান্য ছবির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল একদিন। মুখে মুখে তাঁর ছবির জনপ্রিয় গান। গায়ে গায়ে তাঁর ছবির নায়ক নায়িকাদের পোশাক পরিচ্ছদের ছাট-কাট। জনপ্রিয়তা, জনগণের মনোরঞ্জনই যাঁদের মতে চলচ্চিত্রের আসল কর্তব্য, তাঁদের কাছে প্রশ্ন, তাহলে শৈলজানন্দ কেন আজ এক বিস্মৃত নাম? কেন তিনি গৌরবহীনতার অন্তরালে?

একেই বলি ইণ্ডাস্ট্রির পরিহাস। এবং এইভাবেই চলে আসছে।

টাকা ঢেলে ছবি করানোর বেলায় কমার্শিয়াল ফিল্মের পরিচালক। বিশেষণ ঢেলে প্রশংসা করার বেলায় আর্ট ফিল্মের পরিচালক। বলাবাহুল্য, গরিষ্ঠ সংখ্যক তরুণ পরিচালকই সহজে আকৃষ্ট হন প্রথমটির দিকে। গৌরব চাই না। চাই গৌরী সেন।

এইভাবে চলে আসছে বলেই, কবিতা, চিত্রকলা এমনকি নাটকের ক্ষেত্রেও আজ যে-তারুণ্য সহজেই দৃশ্যমান, চলচ্চিত্রের বেলায় তা অনুপস্থিত। ফলে কবিতা বা চিত্রশিল্পের জগতকে আমরা যত সহজে

দশকের মাপে মাপতে পারি চলচ্চিত্রের বেলায় পারি না। অমুক দশকের কবি অথবা চিত্রশিল্পী বললে আমাদের চিন্তা বা চেতনায় একটা বিশেষ কালের যে সব অনুষঙ্গ, অভিজ্ঞতা এবং অভিনবত্ব ভেসে ওঠে, চলচ্চিত্রের বেলায় ওঠে না। কবিতা বা চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে এক ঝাঁক তরুণ একটা বিশেষ কালের সজাগ সতর্ক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে মেতে ওঠেন সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে। চলচ্চিত্রের বেলায় তেমন উদ্যম রয়ে গেল অভিজ্ঞতার অগোচরে।

ইতিহাসের করুণ করুণায় মাত্র একবারই বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে ঘটেছিল এমন অলৌকিক ঘটনা। সেটা 'পথের পাঁচালী' পরবর্তী যুগে। তখনই শুধু একবার এক ঝলকের জন্যে আলোকিত হয়ে উঠেছিল অন্ধকার পটভূমি। একদল তরুণ পরিলাচক অতীত চলচ্চিত্রের যাবতীয় প্রাচীন সংস্কার ও রীতিনীতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে, হাত বাড়িয়েছিলেন নতুন স্বাদের, নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর, নতুন ছন্দের চলচ্চিত্র নির্মাণে। সেদিন অযান্ত্রিকের ঋত্বিক ঘটক, লৌহকপাটের তপন সিংহ, বাইশে শ্রাবণের মৃণাল সেন, কোনো ঘোষিত ম্যানিফেস্টোর সূত্রে সংঘবদ্ধ না হয়েও, যেন এক সূত্রে, এক সংকল্পে সত্যবদ্ধ। সে সংকল্প হোল, বাংলা চলচ্চিত্রকে নতুন যৌবনে রাঙানো।

বলা বাহুল্য সেদিনের আন্দোলনে পুরোভাগে ছিলেন সত্যজিৎ রায়। একাধারে তিনিই সেদিনকার নতুন যুগের পথপ্রদর্শক, সহযাত্রী এবং নেতা। সেই অবিস্মরণীয় সময়ের পর, তারুণ্যের এমন উদ্যম বাংলা চলচ্চিত্রের পটভূমিতে আর গড়ে ওঠেনি। সেবারে যে গড়ে উঠতে পেরেছিল তার পিছনেই বা কারণ কি?

কারণ ছিল।

প্রথম কারণ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের প্রচণ্ড এবং বিদ্যুৎময় প্রভাব। দ্বিতীয় কারণ সংখ্যায় স্বল্প হলেও, বেশ কয়েকজন শিক্ষিত সংবেদনশীল প্রগতি মনোভাবাপন্ন প্রযোজকের আবির্ভাব। তাঁদের মধ্যে একজনের অবদান অপরিসীম। তিনি প্রমোদ লাহিড়ী। তাঁর একার প্রযোজনাতেই আমরা পেয়েছিলাম একাধিক অপূর্ব চলচ্চিত্র। যথা, পরশ পাথর, অযান্ত্রিক, বাড়ি থেকে পালিয়ে, লৌহকপাট। এরপর অসিত চৌধুরী। যাঁর প্রযোজনায় অপুর সংসার এবং কাবুলিওয়ালা।

তারপর মহেন্দ্র গুপ্ত। মূলত হিন্দী ছবির পরিবেশক হয়েও একাধিক বলিষ্ঠ বাংলা ছবির পরিবেশনায় স্বেচ্ছায় এবং সাহসের সঙ্গে এগিয়ে এসেছিলেন তিনি। তৃতীয় কারণ, পথের পাঁচালীর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির বিপুল ও ব্যাপক প্রতিক্রিয়া। পথের পাঁচালীতেই আমরা প্রথম পেলাম জীবনের স্বাভাবিক স্বাদ। দেখলাম উনোনে ফুটছে স্বাভাবিক ভাত। স্বাভাবিক মাছি এসে বসছে ঘুমন্ত মানুষের মুখে। ভাঁড়ার ঘরের চালের কলসীতে স্বাভাবিক আরশোলা। বাস্তুভিটের স্বাভাবিক সাপ। সংসারের চারপাশে স্বাভাবিক মলিনতা। প্রাচীন দরজায় স্বাভাবিক জীর্ণতা। জীবনের গায়ে জীবন যাপনের স্বাভাবিক ময়লা। চরিত্রদের মুখে স্বাভাবিক সংলাপ। আবহসংগীতে নেই চিৎকার। মন ভোলানোর খাতিরে নেই অকারণের গান। পথের পাঁচালীর আগে বাংলা ছবিতে কোনো চরিত্র ভাত খায় নি। এর আগে চরিত্রদের শুধু খেতে বসতে দেখা গেছে। গ্রাস উঠে এসে থেমে গেছে মুখের দোরগোড়ায়। পথের পাঁচালীতেই একজন চরিত্র প্রথম স্বাভাবিক ভঙ্গীতে কথা বলে গেল ভাত খেতে খেতে মাছের কাঁটা মুখ থেকে সরিয়ে। স্বাভাবিক বৃষ্টি পড়ল আকাশ থেকে। মাঠের উপর দিয়ে হেঁটে গেল মেঘের স্বাভাবিক কালো ছায়া। এক সঙ্গে সতেরোটা বেহালার আর্তনাদ না তুলেই মৃত্যু এল এবং চলে গেল, স্বাভাবিক নীরবে। মৃত্যুশিয়রে বাংলা চলচ্চিত্রের চিরকেলে প্রতীকের প্রদীপ তার শিখাটুকুকে কাঁপাল, নিভল না। আর দেখলাম স্টার নয়, অভিনেতারাও স্বাভাবিক।

কিন্তু আজ, নিছক বাক্যেই, সত্যজিৎ রায় বাংলা চলচ্চিত্রের গৌরব। তাঁর নিষ্ঠা এবং শিল্পরুচি বাংলা চলচ্চিত্রের আদর্শ নয়, আজো। পথের পাঁচালী সৃষ্টি হওয়ার প্রায় কুড়ি বছর পরেও বাংলা চলচ্চিত্রের বহিরঙ্গের দৈন্য তাই আজো এমন প্রকট। তাই—সংলাপে আজো অতি-নাটকীয়তা। এবং অতিকথন। মেকআপে উৎকট কৃত্রিমতা।

সেট-এ তৈরী দেয়াল বাতাসে দোলে। পরিবেশ রচনায় মোটাদাগের মামুলিয়ানা। ঐতিহাসিক ছবিতে ইতিহাসের প্রতি বিন্দুমাত্র আনুগত্য নেই।

যে-যুগের কাহিনী, সংগীতে সে-যুগের স্বাদ নেই। আবহসংগীত

মানে আজো সেই কান ফাটানো চিৎকার। গগন-বিদারী প্লে-আউট মিউজিক বাজিয়ে আজও ঘোষিত হয় সমাপ্ত।

'ডিটেল', পরিত্যক্ত।

অকারণ ভাঁড়ামি অব্যহত।

সেন্টিমেন্ট, ফোয়ারার মতো অফুরান।

মেলোড্রামা, মুক্তপক্ষ বিহঙ্গম।

সংযম, অ-দৃষ্ট।

রুচি, অস্পৃশ্য।

এরই নাম বার্ধক্য, বিকৃতির ও অধোগতির। এই পরিমাপহীন অধোগতির মূল কারণ একটি মিথ্যাচার। সে মিথ্যাচারের মূলে রয়েছে একটি শব্দ। এই শব্দটির নাম, কমার্শিয়াল। চলচ্চিত্র জগতের নেতৃত্বের আসনে সমাসীন একদল ব্যক্তির দীর্ঘকালের প্রচার ও প্ররোচনায় আমাদের দেশে 'কমার্শিয়াল' শব্দটির শেষ অর্থ হয়ে দাঁড়িয়েছে 'আজগুবি'।

পৃথিবীর সব দেশেই কমার্শিয়াল ছবি তৈরী হয়। কিন্তু সেগুলো আজগুবি ছবি নয়। কাহিনী বা ঘটনার মধ্যে নিশ্চয়ই এমন উপাদানের প্রাধান্য থাকে যা গরিষ্ঠ সংখ্যক মানুষের মন কাড়তে সক্ষম। কিন্তু সে-সব ছবির গড়নে-গঠনে, স্থান কালের ঐতিহাসিকতা বা প্রমাণ্যতাকে বজায় রাখতে বিন্দুমাত্র যত্নের অভাব থাকে না। সামান্য ডিটেলের প্রতিও সেখানে গভীর মনোযোগ। সেখানে বিশেষ ছবির জন্যে তৈরী হয় বিশেষ ক্যামেরা, বিশেষ লেন্স, এমনকি প্রয়োজনে বিশেষ ধরনের ফিল্মও। ছবিকে জনপ্রিয় করার তাগিদে সেখানে নিত্য নতুন আবিষ্কার। এবং এক্সপেরিমেন্টও। যেহেতু অধিক সংখ্যকের জন্যে ছবি, সেইহেতু মনযোগের পরিমাণও অধিক।

কোনো একটা বিশেষ যুগের কাহিনী নির্মাণ করতে হলে সেখানে দীর্ঘদিনের গবেষণা। তৈরী হয় বিশেষ কালের নিখুঁত সাজপোশাক, নিখুঁত আসবাবপত্র, নিখুঁত স্থাপত্য। শিল্পীদের শেখানো হয় বিশেষ কালের হাঁটা-চলার ভঙ্গী, আচার-আচরণ, কথা বলার ধরন-ধারণ। প্রয়োজনে শিল্পীদের ওজন পর্যন্ত কমানো কিংবা বাড়ানো হয় একটি বিশেষ চরিত্রের আদলে। আসলে যে কোনো একটি চলচ্চিত্রকে সর্ববিষয়ে বিশ্বাস-যোগ্য করে তোলার জন্যে সেখানে কত প্রখর দৃষ্টি কত প্রচণ্ড পরিশ্রম।

কিন্তু আমাদের দেশে যে কোনো রকম কদর্যতা ও বিকৃতিতে ইন্ধন জোগানোর সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উপায় ও অমোঘ অস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে 'কমার্শিয়াল' এই শব্দটি। এই শব্দ উচ্চারণ করলেই সাতখুন মাপ। দুশো বছর আগেকার কাহিনীতে যদি শোনা যায় আধুনিক পপ সঙ্গীত, প্রতিবাদ নেই সে প্রতারণার। কারণ এটা যে কমার্শিয়াল ছবি। শিরস্ত্রাণহীন মোগল নবাব, অন্তুতপক্ষে রাজ দরবারে স্বপ্নাতীত। কিন্তু একটি বাংলা ছবিতে তাও দেখা গেল। যিনি নবাবের ভূমিকায়, তিনি বাংলা চলচ্চিত্রে সর্বজনপ্রিয় অভিনেতা। তাঁর মাথায় মুসলমানী পাগড়ী পরালে পাছে ম্যাটিনী আইডলের ইমেজ নষ্ট হয়ে যায়, তাই ঐ ব্যবস্থা। এরকম আরো হাজারটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়, যার মধ্যে যুক্তি অথবা প্রামাণ্যতার কোন স্থান নেই। পরিণামে এমন দাঁড়িয়েছে যে, পিটুলিগোলা জলেরই অপর নাম এখন দুধ। এবং গিলতে গিলতে গিলতে পিটুলিগোলা জলের স্বাদটাই জনসাধারণের রসনায় এমন তৃপ্তিদায়ক হয়ে গেঁথে বসেছে যে, সত্যিকারের দুধের বরাতেই জুটছে বিস্বাদের অপবাদ। সত্যজিৎ রায় যখন 'চারুলতা' করেছিলেন, বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী মহলে উঠেছিল তুমুল প্রতিবাদ। নষ্টনীড়কে নষ্ট করা হয়েছে। যা নেই মূল কাহিনীতে তা-ই-ই ঘটিয়েছেন ছবিতে। আসলে সত্যজিৎবাবু যদি কিছু করে থাকেন সেটা হল তাঁর নিজস্ব ইন্টারপ্রিটেশন। গল্পটিকে নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা। এটা করার স্বাধীনতা চলচ্চিত্রে স্বীকৃত। ম্যাকবেথ অবলম্বনে কুরোসোয়ার থ্রোন অব ব্লাড, হ্যামলেট অবলম্বনে কোজিনৎসেভের ছবি কিংবা পাসোলিনীর খৃষ্ট-চিত্রে আমার এ-রকম স্বাধীনতা নেওয়ার দৃষ্টান্ত দেখেছি। এঁরা কাহিনীর ঐতিহাসিতাকে লঙ্ঘন করে নি। করেছেন চরিত্রদের নতুণ রূপে বিশ্লেষণ।

অথচ আজ যখন বঙ্কিমচন্দ্রের একটি বিখ্যাত কাহিনী অবলম্বনে সৃষ্টি করা হয় বঙ্কিম-কাহিনীর ক্যারিকেচর, যার মধ্যে ঐতিহাসিকতা নেই, স্থান কালের পরিবেশের প্রামাণ্যতা নেই যার সংলাপে বা গানে, আসবাবপত্রে আধুনিক কালের ভেজাল, তার বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবীরা নীরব। পৃথিবীর অন্য কোন দেশ কি এইরকম একটি ক্লাসিক কাহিনীকে এমন শ্রদ্ধাহীন হেলাফেলায়, এমন অশিক্ষিত ভঙ্গীতে নির্মাণ করতে পারতো? নিশ্চয়ই না। আমরা যে করেছি, তার জন্যে আমাদের লজ্জা নেই। বরং

গর্বিত। কেন? না অনেকদিন বাদে একটা কমার্শিয়াল বাংলা ছবি তবু তো লাগল।

নির্ঘাত সত্যভাষণ। গত তিন বছরে শতকরা ৯০ ভাগ বাংলা কমার্শিয়াল ছবি ব্যর্থ হয়েছে জনতার তুষ্টি সাধনে। ফরমুলা-নিয়ন্ত্রিত বাংলা কমার্শিয়াল ছবিও আজ বার্ধক্যের নানাবিধ ব্যাধিতে রুগ্ন ও জরাগ্রস্ত। দুটি একটি ছবির আকস্মিক আকাশচুম্বী সাফল্য আজ আর নিয়ম নয়, ব্যতিক্রম।

চারিদিকের এই স্তূপাকার ব্যর্থতার মাঝখানে তারুণ্য তবুও স্পন্দমান। তার প্রমাণ মেলে 'চারুলতা'র প্রশান্ত ও গম্ভীর পরিচালককে যখন দেখি 'প্রতিদ্বন্দ্বী'তে অস্থির চঞ্চল এবং ক্ষিপ্ত। মনে হয় যেন তিনি ব্রাশ ছেড়ে হাতে তুলে নিয়েছেন বাটালি। এগোতে এগোতে যেন হঠাৎ এসে থমকে দাঁড়িয়েছেন এক আদিমকালের পাথরের দেওয়ালের মুখোমুখি। আরো এগোতে গেলে, একে ভেদ করে, খোদাই করে, শক্ত হাতে কোটকুটে ছিঁড়ে-খুঁড়ে তবেই নিস্তার।

গল্প বলার সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যকরণ আয়ত্ত করে এবং নিজের সমস্ত প্রাচীন প্রবণতাকে সম্পূর্ণ পরিহার করে মৃণাল সেন যখন 'ভুবন সোম' থেকে যাত্রা শুরু করেন জীবনের কিংবা সময়ের আরও গভীর সংকটের শিকড়ের দিকে তখন বুঝতে পারি তারুণ্য কত সজীব ও শক্তিমান। নিজেকে চিরকাল সমালোচকের গণ্ডীতে আটকে রেখে হঠাৎ, প্রায় প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পা দেবার মুহূর্তে চিদানন্দ দাশগুপ্ত যখন আমাদের কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে তুলে ধরেন তাঁর অভিনব এবং অপূর্ব এক ঠাট্টার জগৎ, আশ্চর্য না হয়ে উপায় নেই তাঁর তারুণ্যে। এই তালিকায় আরও একটি স্মরণীয় নাম ঋত্বিক ঘটক। তাঁর তারুণ্য একদিন ছিল আগুনের মতো তাজা। সেই তাজা আগুনের লকলকে শিখায় তিনি যতটা পুড়িয়ে সিদ্ধ অথবা নষ্ট করেছেন নিজেকে, তার ঢের কম মনোযোগ দিয়েছেন সেই আগুনকে নিজের শিল্পসিদ্ধির কাজে লাগাতে। লাগালে বাংলা চলচ্চিত্র আরো সমৃদ্ধ হতো। তাঁর সুবর্ণরেখাই আপাতত আমাদের কাছে শেষ প্রদর্শিত ছবি। যদিও জানি, দীর্ঘ অজ্ঞাতবাসের পর আবার তিনি হাত দিয়েছেন ছবিতে। একটি নয় এক সঙ্গে দুটি। একটি ওপার বাংলায়। আরেকটি এখানে। একটিতে

পূর্ববাংলার নদী জল মাটি ও মানুষ। আরেকটিতে পশ্চিম বাংলার ক্ষুধা তৃষ্ণা বন্দুক ও বুলেট। আমরা উদ্‌গ্রীব তাঁর সাম্প্রতিক দুটি সৃষ্টির মুখোমুখি হওয়ার আগ্রহে। এ ছাড়াও বাংলা চলচ্চিত্রের এদিকে ওদিকে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে আরো কিছু তরুণ পরিচালক।

চারিদিকের অসহযোগিতা এবং উৎসাহহীন পরিবেশের মধ্যেও যে যার নিজের সততা, সাহস এবং সদিচ্ছাকে সম্বল করে নিজেদের সৃষ্টিতে ব্যস্ত।

জানি, আলোর আড়ালে আরো অনেক তরুণ পরিচালক 'প্রথম ক্ষুধায় অস্থির গরুড়ের মতো' দাঁড়িয়ে আছেন রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষায়।

গনগনে আগুনে জ্বলছে আকাঙ্ক্ষার মশাল। এফ এফ সি তাঁদের কাছে অনেক দূরের দিগন্ত। রাজ্য সরকারের সাহায্য ঝকঝকে মরীচিকা। তথাকথিত প্রযোজক পরিবেশকের করুণালাভ দুঃস্বপ্নের চেয়েও অলীক। এমন বিপুল নিঃস্বতার মাঝখানেও তাঁরা যে মেতে আছেন ভবিষ্যতের রঙীন স্বপ্নে, তার উৎস কোথায়? এর যদি কোনো উত্তর থাকে, তাহলে তার সংখ্যা তিন।

১। উন্মাদ হওয়া

২। যন্ত্রণাবোধ

৩। নিষ্ফল হতে পারি জেনেও নিজেদের সৎ এবং সুদৃঢ় সিদ্ধান্তের পাথরে মাথা কোটা।

দেশ। বিনোদন সংখ্যা

সাহিত্যের সংসারে চলচ্চিত্র

সাহিত্য আর চলচ্চিত্রের সম্পর্ক অনেকটা স্বামী-স্ত্রীর মত। প্রায়শই নিবিড় মিলন। কিন্তু মাঝে মাঝে বিচ্ছেদ, বিরহ। কোন কোন ক্ষেত্রে বিবাহ-বন্ধনের রাঙা রাখী ছিঁড়ে যায় অনতিবিলম্বে। আবার সব চলচ্চিত্রই যে সাহিত্যের সঙ্গে বিবাহিত এমনও নয়। কেউ কেউ চিরকুমার। সাহিত্যের গা-ভরা যৌবন, সৌন্দর্য সুষমা, কিছুই টলাতে পারেনা তাদের একাগ্র, একান্ত তপস্যাকে। আবার কোন কোন চলচ্চিত্র অবিবাহিত ঠিকই কিন্তু সাহিত্যের সঙ্গে গোপন প্রেমের লুকোচুরী খেলাটা থেমে নেই। কোন কোন স্বামী আছেন যাঁরা ওঠেন এবং বসেন স্ত্রীর বাক্যে। কোন কোন স্বামী নিজের মনের মাপে বদলে নেন স্ত্রীকে। চলচ্চিত্রও তাই। কোন কোন চলচ্চিত্র সাহিত্যের ক্রীতদাস। কোন কোন চলচ্চিত্র সাহিত্যকে নিংড়ে, ক্ষীরটুকু নেয় ছেঁকে, দুধটুকু দেয় ফেলে।

সাহিত্য এবং চলচ্চিত্রের সুখী পরিবারে প্রথম ফাটল ধরেছিল বোধ হয় নিও রিয়ালিজম-এর যুগে। যখন একদল পরিচালক রগরগে যৌনগন্ধী কাহিনীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ঘুরে তাকালেন বাইরের খোলা বাস্তবের দিকে। যে বাস্তব ময়লা, রুক্ষ, কর্কশ, পারিপাট্যহীন, কদর্য, কিন্তু মানুষের প্রতিদিনের আশা এবং হতাশা, স্বপ্ন এবং সংগ্রাম, জীবন এবং মৃত্যুতে মহিমাময়। ইতালীর পরিচালকেরা বন্ধ করে

দিলেন সাহিত্যের দরজায় কড়ানাড়া। বন্ধ করে দিলেন স্টুডিও-র কৃত্রিম পরিবেশে আসা যাওয়া। বন্ধ করে দিলেন তথাকথিত স্টারদের পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি। তার বদলে চলচ্চিত্রে এল সাদামাঠা জীবন, এল সেই জীবনেরই যোগ্য অকৃত্রিম দৃশ্যপট আর পেশাদার অভিনেতা অভিনেত্রীর জায়গায় অখ্যাত সাধারণ মানুষ।

নিও রিয়ালিজম-এর গোড়ার যুগেও যেটুকু টান ছিল সাহিত্যের দিকে, আন্দোলনের অন্যতম প্রধান পুরুষ এবং প্রসিদ্ধ চিত্রনাট্যকার জাভাতিনি ডাক দিলেন সেটুকু বাঁধনকেও ছিঁড়ে ফেলতে। এ ট্রিপ অ্যারাউণ্ড দা ওয়ার্ল্ড' এই নিয়ে একটা ছবি করবেন। প্রস্তাব পেশ করলেন ডে-সিকা-র কাছে, চিঠিতে।

"It seems to me that this is the right moment for such a film, with no script, but created immediately through our ears and eyes from direct contact with reality (the true destiny of neo-realism, in my opinion). The facts are there; we must pick and choose them as they happen."

অথচ চলচ্চিত্র যখন নির্বাক যুগে, তখনকার প্রধান পুরুষদের দেখা গেছে সাহিত্যের কাছে নতজানু। এমনকি আইজেনস্টাইন, বলতে গেলে প্রথম চলচ্চিত্রের ব্যাকরণ রচনা করলেন যিনি, তিনিতো তাঁর প্রতি পদক্ষেপে সাহিত্যের কাছে কৃতজ্ঞ। তন্ন তন্ন করে ঘেঁটেছেন ডিকেন্স, বালজাক মোপাসাঁ, হুইটম্যান, টলস্টয়, পুশকিন। তাঁর বিখ্যাত 'মন্তাজ' থিয়োরীর মূলে অনেকখানি প্রেরণা আর যুক্তির জোগান পেয়েছেন সাহিত্যের কাছ থেকেই।

ওলটপালটের সুরু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর। সাহিত্যের অনুবাদকের ভূমিকা ছেড়ে চলচ্চিত্র-পরিচালকেরা ধীরে ধীরে অনুভব করতে লাগলেন তাঁদের স্বতন্ত্র দায়িত্ববোধ। ধীরে ধীরে চলচ্চিত্রের সর্বাঙ্গ জুড়ে ফুটে উঠতে লাগল একান্তভাবে পরিচালকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী, নিজস্ব বোধ ও বক্তব্য। চলচ্চিত্র হয়ে উঠল পরিচালকেরই নিজস্ব প্রকাশভঙ্গীর একটা মাধ্যম, যেমন কবির বেলায় কবিতা, ঔপন্যাসিকের বেলায় উপন্যাস, চিত্রকরের বেলায় রঙ, তুলি, ক্যানভাস। ঠিক আজকের এই

সময়ের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, চলচ্চিত্র এবং সাহিত্যের সম্বন্ধ অনেকখানি জটিল। মিলনে, বিচ্ছেদে, প্রত্যাখ্যানে মেশামিশি। চলচ্চিত্র কোথাও কোথাও এখনো সাহিত্যের কাছে নতজানু। প্রসিদ্ধ ক্লাসিক অবলম্বনে ছবি করার স্রোতে ভাটা পড়েনি। এখনো তাই সোফোক্লিস এবং সেক্সপীয়ার, এখনো 'ডলস হাউস' তৈরী হয় একসঙ্গে দুটো। আবার এর উল্টো পিঠটাও সত্য। এমন ছবি হচ্ছে যার কাহিনী কোন মহৎ পরিচিত সাহিত্য থেকে ধার করা নয়। পরিচালকেরই নিজের রচনা। কেউ কেউ আরো দুঃসাহসী। কোন নির্দিষ্ট কাহিনী এবং তার নির্দিষ্ট চিত্রনাট্যকে পরিত্যাগ করে কেউ কেউ ছবি করছেন তাৎক্ষণিক পদ্ধতিতে। অর্থাৎ শিল্পী এবং ক্যামেরা এবং লোকেশনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পরিচালকের মনে যে ধরনের দৃশ্য রচনা এবং সংলাপের প্রয়োজন জাগছে, সেই অনুযায়ী ছবি। অতি সম্প্রতি আমরা এমন একটি সুইডিস ছবি দেখলাম, যেখানে পরিচালক তার ছবির সংলাপটুকুও রচনা করেন নি। অভিনেতাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন ছবির মূল বক্তব্য। অভিনেতাই তৈরী করে নিয়েছেন নিজের সংলাপ নিজে। আবার এর মাঝখানে রয়ে গেছে একটা তৃতীয় পক্ষ। কেউ হযতো ছবি করছেন কোন ক্লাসিক অবলম্বনে। কিন্তু পরিচালকের নিজস্ব 'ইন্টারপ্রিটেশনে' সে ক্লাসিক বদলে গিয়ে চেহারা নিচ্ছে আরেক মূর্তির। 'ম্যাকবেথ' অবলম্বনে কুরোসোয়ার 'থ্রোন অব ব্লাড' ম্যাকবেথের অনুবাদ নয়। সম্পূর্ণ নিজস্ব অথবা স্বতন্ত্র এক সৃষ্টি। আবার ঐ একই ম্যাকবেথকে নিয়ে পোলোনস্কির ছবি স্বাদে গন্ধে ভিন্ন। কুরোসোয়া ম্যাকবেথকে নিয়ে গেলেন সামুরাইয়ের যুগে। পোলানস্কি ম্যাকবেথকে প্রতিষ্ঠা করলেন স্টালিনবাদের বিভীষিকাময় দিনগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে। ঠিক এই ভাবেই মহৎ সাহিত্যেরও নতুন আত্মা, নতুন শরীরে নবজন্ম ঘটে চলেছে চলচ্চিত্রে, বারবার। কোজিন্তসেভের 'হ্যামলেট' অথবা পাসোলিনীর 'ইডিপাস রেক্স' জাতীয় ছবি তারই উদাহরণ।

কিন্তু যাঁরা সাহিত্যের শরণাপন্ন না হয়েও ছবি করে চলেছেন নিরন্তর, তাঁদের সম্পর্কেই আমাদের জিজ্ঞাসা এবং কৌতুহলের মাত্রাটা বেশী হওয়া উচিত। আমরা উন্মুখ আগ্রহে তাকিয়ে থাকি, কী ভাবে তাঁরা পেয়ে যান নিত্য নতুন চলচ্চিত্রের আদল, সেই দিকে।

রবীন্দ্রনাথের তখন পদ্মার উপরে বসবাস। একদিন বোট থেকে দেখতে

পেলেন, ডানপিটে ধরনের একটা বড়সড় মেয়ে শ্বশুরবাড়ি চলেছে কাঁদতে কাঁদতে। তার প্রতি পদক্ষেপে অনিচ্ছা, প্রতি পদক্ষেপে পিছুটান। সামান্য দৃশ্যের সেই বীজটুকুই একদিন ডালপালা ফুলফল নিয়ে সম্পূর্ণ হয়ে উঠল সমাপ্তি নামের গল্পে।

অনেকদিন থেকেই টলষ্টয়ের একটা উপন্যাস লেখার ইচ্ছে, এক তরুণীর জীবন নিয়ে। তিনি যেখানে থাকেন তার কয়েক মাইল দূরের এক স্টেশনের কাছে এক তরুণী আত্মহত্যা করেছে ট্রেনের চাকায় ঝাঁপ দিয়ে। সেই ঘটনাটা শোনার পর থেকেই মনের ভিতরে এক নতুন উপন্যাসের আবেগ ও উত্তেজনা। লিখবো ভাবেন, কিন্তু লেখেন না। কি ভাবে লিখবেন, কোথায় কেমন ভাবে শুরু হবে, এসব প্রশ্ন উত্তরহীন হয়ে যায় তাঁর বুদ্ধি বা বোধের কাছে। হঠাৎ একদিন হাতে এল পুশকিনের একটা ছোট্ট গল্প। বইটা পড়ছিল তাঁর কোন ছেলে। ফেলে গেছে পড়তে পড়তে। টলষ্টয় সেটা হাতে তুলে নিয়ে জোরে জোরে পড়তে লাগলেন স্ত্রীকে শুনিয়ে। 'The guest arrived at the country house' এইটুকু পড়েই টলষ্টয় বুঝলেন পুশকিনের রচনা কৌশল।

হ্যাঁ, এইভাবেই শুরু করতে হয়। পুশকিন এক লাইনেই তাঁর পাঠকদের টেনে নিয়ে গেলেন ঘটনার মাঝখানে। অন্য কেউ হলে আগে বর্ণনা দিতো অতিথিদের, ঘরের চেহারার। পুশকিন তা করলেন না। মুহূর্তেই মিশিয়ে দিলেন ঘটনাস্রোতে, পাঠকদের মনকে।

বিদ্যুৎ-চমকের মত এই অনুভূতি নতুন সাড়া তুললো তাঁর চেতনায়। সেই দিনে শুরু করে দিলেন তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'এ্যানা কারেনিনা'। সাহিত্যে এরকম ঘটনা প্রায়শই ঘটেছে। বাস্তবের সামান্য একটু ইঙ্গিত ইশারা থেকে জন্ম নিয়েছে অনেক শ্রেষ্ঠ রচনা, বাংলা সাহিত্যে এবং বিশ্বসাহিত্যেও।

চলচ্চিত্রেও কি ঘটে তেমন? পথ চলতে চলতে প্রবহমান জীবনের ভীড়ের ভেতর থেকে পরিচালক কুড়িয়ে পেলেন আচমকা একটা অর্থময় সংকেতময় দৃশ্য। তারপর সেই নগ্নপ্রায় দৃশ্যটিকে নিজের মত ঘটনার নানা কাপড় পরিয়ে, সাজিয়ে গুছিয়ে তিনি কি তাকে গড়ে তুলবেন তাঁর আগামী কোন চলচ্চিত্রের মৌলিক কাহিনীরূপে? হ্যাঁ, চলচ্চিত্রের বেলাতেও এমন ঘটনা খুব একটা ব্যতিক্রম নয়।

বার্গম্যানের একটা অতি পরিচিত প্রবন্ধের নাম—'Film has nothing do with literature' সেটি পড়ে আমরা জানতে পারি কি ভাবে সামান্য একটা কথার টুকরো, কারুর একটা মন্তব্য, বিশ্বাস্য কিন্তু আপাতঃ অসংলগ্ন কোনো একটা ঘটনা, সুর অথবা সঙ্গীতের সামান্য একটু ঝলক, অথবা রাস্তার গায়ে লুটিয়ে থাকা আলোর একটুকরো আলপনা ইত্যাদি থেকে তিনি পেয়ে যান তাঁর নতুন চলচ্চিত্রের উপকরণ।

"These are the split-second impression that disappear as quickly as they come, yet leave behind a mood like pleasant dreams. It is a mental state, not an actual story, but one abounding in fertile associations and images. Most of all, it is a brightly coloured thread sticking out of the unconscious. If I began to wind up this thread, and do it carefully, a complete film will emerge."

এই একই বক্তব্যের প্রতিধ্বনি এখনকার প্রায় সব প্রতিভাধর পরিচালকদের কণ্ঠেই। ফেলিনিকে প্রশ্ন করা হয়েছিল ছবি করার ব্যাপারে আপনি কি ভাবে ধাপে ধাপে এগোন? ফেলিনির উত্তর—

"First, I have to be moved by a feeling. I have to be interested in one character or one problem. Once I have that, I don't really need a very well-written story or a very detailed script."

এ্যান্টোনিওনি, বার্গম্যান-এর মতই নিজের ছবির গল্প নিজেই লেখেন। তিনি বলেন, ডষ্টয়েভস্কির ক্রাইম এ্যাণ্ড পানিশমেণ্ট গল্পের মূল কাঠামোটা অতি সাধারণ। ডষ্টয়েভস্কি সেটাকে যে ভঙ্গীতে লিখেছেন, সেটা আলাদা ব্যাপার। এই ক্রাইম এ্যাণ্ড পানিশমেণ্ট নিয়ে ছবি করলে, ভালও হতে পারে আবার নিকৃষ্টও হতে পারে। আমি সেই কারণেই আমার প্রায় সমস্ত ছবির জন্যেই মৌলিক গল্প লিখেছি নিজেই। একজন পরিচালক আসলে তো একজন মানুষ। সুতরাং তার কিছু 'আইডিয়া' আছে। আবার সে একজন শিল্পীও। সুতরাং তার কিছু 'ইমাজিনেশন' আছে। সেগুলো ভালো হোক, আর মন্দই হোক, আমার মনে হয়, মানুষকে শোনানোর মত গল্প আমার জানা আছে অজস্র।

প্রতিদিন যা দেখছি, যা ঘটছে আমার চোখের সামনে, সেগুলোই জোগান দিয়ে চলেছে নিত্য নতুন গল্প বলার ক্ষমতা।

আজকের প্রায় অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ পরিচালকের আছে অপরের কাহিনীর চেয়ে স্বরচিত কাহিনীর প্রয়োজনটা জরুরী। কারণ তাঁদের উদ্দেশ্য মানুষ নামের একদল দর্শককে কোনও একটি আপাদমস্তক নিটোল মুগ্ধ করা নয়। তাঁরা চান মানুষকে কিছু জানিয়ে দিতে, গোপনীয় কোনো সংবাদ। যে মাটির উপরে মানুষের পা, মানুষের অস্তিত্বের গর্বিত চলাহাটা, তার ঠিক কোনখানে কতটুকু ফাটল, কোন ছিদ্রপথে কতটা বন্যাজল, অথবা কোন অগ্নিকোণ থেকে নির্দয় ঘূর্ণি ঝড়ের সম্ভাবনা, মানুষকে আগেভাগে সেই খবরটা জানিয়ে দেওয়াই যেন এঁদের প্রধান দায়। সভ্যতাকে সতর্কীকরণই এঁদের ব্রত যেন।

নিজের ছবির অধিকাংশ কাহিনীরই রচয়িতা স্বয়ং গদার। আবার যখন অন্যের কাহিনী অবলম্বনে ছবি, তখনো সে-কাহিনীতে তুমুল ওলোট পালট। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ সম্ভবত 'ম্যাসকুলিন ফেমিনাইন'। 'হিরোসিমা মন আমুর'-এর প্রযোজক মসিঁয় ডুমাই সেবার গদারকে দিয়ে নির্মান করতে চেয়েছিলেন একটা স্বল্প-দৈর্ঘের ছবি, পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন মিনিট হবে যার রানিং টাইম। প্রস্তাবে সম্মত গদার জানিয়েছিলেন যে তিনি ছবি করবেন মোপাসাঁ-র 'দা সিগন্যাল' গল্পটা নিয়ে, যা অনেকদিন থেকেই গুঞ্জন দিয়ে চলেছে তার মাথায়। গদার যখন চিত্রনাট্য রচনায় ব্যস্ত, সেই সময় প্রযোজক ডুমা এসে জানালেন যে, একটার বদলে আপনি দুটো ছবি করুন মোপাসাঁরই গল্প নিয়ে। দ্বিতীয় গল্পটা হোক 'পলস্ মিসট্রেস'। দুটো গল্পেরই চিত্র-সত্ব কেনা হল। গল্প দুটো, কিন্তু নামকরণ হল একটাই। 'পলস্ মিসট্রেস, উইথ এ স্মাইল।' ১৯৬৬-র এপ্রিলে ছবি শেষ। মোপাসাঁর প্রকাশক এলেন ছবি দেখতে। দেখে অবাক। জানালেন এই ছবির সঙ্গে মোপাসাঁর মূল গল্পের তো বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। সুতরাং ঐ দুটো গল্প নিয়ে, যে হেতু চিত্রস্বত্ব কেনা আছে, অন্য যে-কোনো সময় তাঁরা পুনরায় তৈরী করতে পারবেন ভিন্ন ছবি। 'পলস্ মিসট্রেস, উইথ এ স্মাইল'-এর মৃত্যু হল এইখানে; আর সেই কবর থেকে জন্মাল 'ম্যাসকুলিন-ফেমিনাইন'।

তবু এমন দূরত্ব, এতখানি বিচ্ছেদ-বিরহের পর, স্বীকার করতেই হবে

চলচ্চিত্রের সংসারে সাহিত্যের সম্মান-সমাদর রয়ে গেছে এখনো। এবং রয়ে যাবেও চিরকাল। চলচ্চিত্র তার জন্মলগ্নে অন্যান্য শিল্পকলার মতই সাহিত্যের কাছে ঋণী ছিল সবচেয়ে বেশী। সেই ঋণ ফুরোবেনা কোনদিনও। সাহিত্যের উজ্জ্বল চরিত্রেরা বারংবার তাকে হাতছানি দিয়ে, ডাকবে কাছে। সাহিত্যের বাঁশী বারবার ঘরছাড়া করে বাইরে টেনে আনবে চলচ্চিত্রের রাধাকে। সাহিত্যের কাছ থেকেই পাঠ নেবে চলচ্চিত্র, জীবনের ও মনের অবচেতনার যাবতীয় রহস্যকে জানার এবং বোঝার।

আইজেনষ্টাইন বলেছিলেন, চলচ্চিত্র হল সাহিত্যের পরোক্ষ উত্তরাধিকারী। তিনি চেয়েছিলেন নিয়মিত অধ্যয়ন। কোন্ সাহিত্যের মধ্যে কোন্ জিনিষটা বিশেষ ভাবে অনুশীলনযোগ্য, কোন লেখক কি-ভাবে একটা বিশেষ সমস্যার উপর আলোকপাত করছেন, কোন্ দৃষ্টিকোণ থেকে কোন্ লেখকের গল্প বলার ছন্দটা কি রকমের, এর সব কিছুকেই তন্ন তন্ন করে জানার দরকার শুধু সাহিত্যকে জানার প্রয়োজনেই নয়; চলচ্চিত্রকে সমৃদ্ধ করার প্রয়োজনে। পুশকিন সম্পর্কে বলতে গিয়ে একদা তিনি যে মন্তব্য করেছিলেন, তাঁরই মধ্যে রয়ে গেছে সাহিত্য এবং চলচ্চিত্রের দাম্পত্য সম্পর্কের গোপন সূত্র :

"The greatness of Pushkin is not for films, but how filmic."

তাঁরই অনুসরণে বলতে ইচ্ছে করে—

সাহিত্যের গৌরব চলচ্চিত্রের জন্যে নয়, কিন্তু চলচ্চিত্রকে গৌরবান্বিত করার জন্যে সাহিত্য গেঁথে রেখেছে হীরে মুক্তোর মালা।
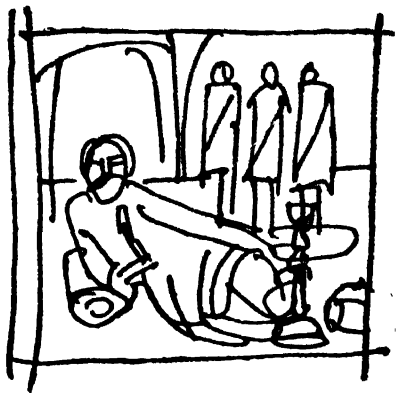
ভারতীয় চলচ্চিত্র

একটা সময় ছিল, যখন সারা বছরে সত্যজিৎ রায় ছাড়া আর কোনো পরিচালককে নিয়ে আমাদের ভাবনা-চিন্তায় জ্বলজ্বল করতো না উৎসাহ-উদ্দীপনার আলো অথবা আগুন। পরে সত্যজিৎ রায়ের পাশে এসে দাঁড়ালেন ঋত্বিককুমার ঘটক, আপন তেজস্বীতায় উজ্জ্বল। তারও পরে, বেশ ধীরে ধীরে, ক্রমশ সলজ্জ সপ্রতিভ ভঙ্গীর আলগা পোষাক গোছাতে গোছাতে, মৃণাল সেন একদিন খাড়া হয়ে দাঁড়ালেন বীরবেশে। ভারতীয় চলচ্চিত্রের আধুনিকতা বলতে তখন এই তিনজনই। আরো কিছু পরে, এক ঢিলে কমার্শিয়াল এবং কমিটেড দু-জাতের পাখি মেরে অঙ্কুরেই গাছ হয়ে উঠলেন শ্যাম বেনেগল। সেটা ১৯৭৪। ঐ বছরেই আরেক পরিচালক এম এস সত্যু, প্রথম ছবিতেই গরম হাওয়া বইয়ে দিলেন ভারতীর চলচ্চিত্রের ঈষৎ-ঠাণ্ডা শরীরে। অবশ্য এঁদের মাঝ-খানে রয়ে গেছেন আর এক শক্তিমান পরিচালক, মণি কাউল। কিন্তু যেহেতু তিনি চলতি হাওয়ার পন্থী হতে অনিচ্ছুক, অনেকটা স্বেচ্ছানির্বাসনের ভঙ্গীতেই যেহেতু তিনি বেছে নেন অথবা বানিয়ে তোলেন এমন ছবি, সংখ্যালঘু কিছু বুদ্ধিজীবী ছাড়া যার সমঝদার জোটা দুঃসাধ্য। তাই তাঁর ক্ষমতা জনপ্রিয়তার স্তরে ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ পায়নি কোনদিন। এখনও না। এঁদেরই কিছু আগে বা পরে গিরীশ কার্নাড, গিরীশ

কাসারভল্লী, অরবিন্দন, আদুর গোপালকৃষ্ণণ প্রমুখেরা। পুণে ইনস্টিটিউটের শিক্ষাক্রম, এফ এফ সির উৎসাহ ও কর্জদান, আর ব্যাক্তিগতভাবে পরিচালকদের অনমনীয় মনোভঙ্গীর যোগফল ভারতীয় চলচ্চিত্রকে প্রতি বছরই উপহার দিয়ে চলল অজস্র তরতাজা প্রতিভা। অথবা ভারতীয় চলচ্চিত্রই যেন আমাদের সামনে পাঠ করে চলল সেইসব অপরিচিতের নাম, যারা অনায়াসে উচ্চারণ করতে পারে—

"পুষ্পমাল্য নাহি মোর, রিক্ত বক্ষতল
নাহি বর্ম, অঙ্গদ, কুণ্ডল।
শূন্য এ ললাট-পটে লিখা
গূঢ় জয়টীকা।
ছিন্নবস্ত্র দারিদ্রের বেশ।
করিব নিঃশেষ
তোমার ভাণ্ডার
খোলো খোলো দ্বার।"

আমাদের চলমনে বিশ্বাসের গায়ে লাগল স্থিতির হাওয়া। আমরা বুঝলাম, ভারতবর্ষ নামের এই দারিদ্র-কাতর দেশে কোটি কোটি টাকার অপব্যয়ে সেকালের বেড়ালের বিয়ের নকলে একালের অর্থহীন, অস্বাস্থ্যকর এবং ক্ষতিকারক প্রমোদ বিতরণের বন্যা চলেছে যখন চলচ্চিত্রের নামে, তখনও, অর্থানুকূল্যের অনিশ্চয়তা এবং অন্ধকার ঠেলে, আমাদের সামনে এসে দাঁড়ানোর মতো সৎ, সাহসী এবং ব্যক্তিত্ববান পরিচালকের সংখ্যায় আর ভাঁটা পড়বে না কোনোদিন।

॥ ২ ॥

গত বছরের ডিসেম্বরে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের প্রতিযোগিতা বিভাগের ছবি বাছাই করার সময় নানান ব্যক্তিগত আলোচনার ফাঁকে চিদানন্দ দাশগুপ্তই কথাটা বলেছিলেন আমাকে—"ভারতীয় চলচ্চিত্রে আসছে একটা ট্যালেন্ট একসপ্লোশনের যুগ।" সে মন্তব্যের যাথার্থতা বুঝতে সময় লাগল আরো তিনমাস। তিন মাস পরে গত মার্চ মাসে রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের ছবি বাছাই-এর কাজে বোম্বাই। তখনই বোঝা গেল, কাকে বলে ট্যালেন্ট একসপ্লোশন।

যদি প্রশ্ন করা হত এবারের রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের জন্যে ছবি বাছাই করতে বসে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা মনে হয়েছে কোনটিকে, আমার ধারণা, প্রত্যেক জুরীই একবাক্যে উত্তর দিতেন—পরিচালকের প্রথম ছবির- সংখ্যাধিক্য। একটু গভীর চোখে তাকালে আরো বিস্ময়ের মতো ঠেকবে যেটা, সেটা শুধু সংখ্যার গুরুত্ব নয়, নতুন পরিচালকদের দৃষ্টি-ভঙ্গী, দক্ষতা এবং দুঃসাহসটাও গুরুত্বে কত প্রবল। গতানুগতিক চলচ্চিত্রের ঘুণ-ধরা নিয়ম-কানুনের মুখে থুতু ছিটিয়ে, ব্যতিক্রমের মতো, ব্যাকরণের সুস্থির নিয়ম ভেঙে আর্য প্রযোগের মতো, এঁদের তৈরী ছবিগুলো স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র। এসব ছবির আসল জোর কলা-কৌশলের বাহাদুরীতে নয়, গিমিক-ঘেঁষা কৃত্রিম উপকরণের বাহুল্যে নয়, অতি নাটকীয়তা অথবা রোমান্টিকতা অথবা যৌনতার সুড়সুড়ি অথবা ভায়োলেন্সের প্রাচুর্যে নয়। এসব ছবির আসল জোর, জীবনবোধের অথবা সামাজিক ন্যায়-অন্যায় বোধের সেই গভীরে যেখানে সেকস এবং ভায়োলেন্সও পেয়ে যায় ভিন্ন তাৎপর্যের গৌরব। জোর, বাস্তবতার প্রতি বিশ্বস্ততায়। এইসব ছবিকে আলোকিত করে রেখেছে সেই অগ্নি-আভাময় আঁচ, যা জীবনের চিতাভস্ম থেকে খুঁটে-ঘেঁটে উদ্ধার করা। এখন আমরা অকপটে, দ্বিধা-সংশয়ের বাইরে বেরিয়ে এসে, অনায়াসে উচ্চারণ করতে পারি, ভারতীয় চলচ্চিত্রের তীরভূমিতে সত্যই আছড়ে পড়েছে 'নিউ ওয়েভ'-এর জোয়ার। অবশ্য এমন ভাবনা আগেও দেখা দিয়েছিল একবার, সত্তরের দশকের শুরুতে। 'নিউ ওয়েভ', 'ন্যুভেল ভাগ', 'অফ-বিট' ইত্যাদি বিশেষনের মালা পরিয়ে আমরা তখনও একবার হেলে-দুলে-নেচে-গেয়ে তুমুল হৈ-হল্লা জাগিয়ে তুলেছিলাম কাগজে-পত্রে আড্ডায়-আলোচনায়। পৃথিবীর চলচ্চিত্রে গদার তখন গুরু। একদা-সাড়া-জাগানো ইতালীর 'নিও রিয়্যালিজমকে ছেড়ে, আমরা তখন ঘুরে তাকিয়েছি ফরাসী করণ-কৌশলের দিকে। ন্যারেটিভ স্টাইলকে ভেঙে তছনছ করার আগ্রহে আমরা কনটেন্টকে কিঞ্চিৎ দূরে সরিয়ে ফর্মকে টেনে এনেছি সামনে। কেউ ফর্ম ভাঙাভাঙি করলেই 'আমরা উচ্ছ্বাসিত কণ্ঠস্বরে সাধুবাদ জানিয়ে বলতে শিখেছি—এই তো 'নিউ ওয়েভ'।

সেই সময়ে এই 'নিউ ওয়েভ' উন্মাদনার বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন সত্যজিৎ রায়। ফিল্মফেয়ারে ছেপে বেরোল তাঁর বহু-বিতর্কিত প্রবন্ধ

'অ্যান ইণ্ডিয়ান নিউ ওয়েভ ?' ১৯১১-এ। পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রাথমিক স্তরে চলতি নিয়ম-নীতিকে অগ্রাহ্য করার ঔদ্ধত্যটা যে বৃষ্টির আগে বৈশাখের দামাল ঝড়ের মতো স্বাভাবিক, সেটা ভুলে গিয়েই সত্যজিৎ রায় সেদিন, ক্ষমাহীন শিক্ষকের ভূমিকায়, উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিলেন তিরস্কারে এবং তিক্ত সমালোচনায়। সাহিত্যের, শিল্পের, সামাজিক এমনকি রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে যখনই কোনো বাঁক ফেরার অথবা মোড় ঘোরার সময় আসে, ইতিহাসকে প্রত্যক্ষ করতে হয় সেই উলঙ্গ উত্তেজনা, যার প্রভাবে ইয়ং বেঙ্গলকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে চীৎকার করে—'আমরা গো-মাংস খেয়েছি,' অথবা সদ্য সাম্যবাদে দীক্ষিত লুই আরাগঁকে লিখতে হয় এমন কবিতা ইউ এস এস আর-এর জয়গান গাইতে গিয়ে, যা কবিতা হিসাবে অপাঠ্য। রবীন্দ্রনাথও তাঁর এক রাজনীতি-বিষয়ক প্রবন্ধে আমাদের শুনিয়েছিলেন যে, যে-কোনো নতুন ভাবনার জলোচ্ছ্বাসের প্রবল বেগ কিছু অনিষ্টকর ঘোলা জলকে টেনে আনেই।

সত্যজিৎ রায়ের দুর্ভাবনা ছিল, নিউ-ওয়েভ পরিচালকেরা 'নিউ কনটেণ্ট'-এর বদলে 'নিউ সিনট্যাক্স' নিয়েই বুঝি মাতামাতি করবে বেশী। তিনি অনুমান করেছিলেন ইউরোপীয় আদলে, বিশেষ করে গদারের প্রায়-অপরিহার্য প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে নিউ ওয়েভ পরিচালকেরা ভুলে যাবেন নিজের দেশ-কালের বাস্তবতা। তাই তাঁকে মনে করিয়ে দিতে হয়েছিল, 'মডার্ণ ইডিয়ম' যদি 'জেনুইনলি মডার্ণ অ্যাটিট্যুড টু লাইফ অ্যাণ্ড সোসাইটির'-র সঙ্গে যুক্ত হতে না পারে, তাহলে সমস্ত উদ্যমটাই 'গিমিক্রী অ্যাণ্ড এম্পটি ফ্রেনবয়্যান্স'-এ অধঃপতিত হতে বাধ্য। এই প্রসঙ্গে তিনি দৃষ্টান্ত টেনেছিলেন দা ভিঞ্চির শয়তান গড়ার সেই ফরমূলা থেকে—"টেক দ্য হেড অফ এ হর্স, দা টর্সো অফ অ্যান এলিফ্যাণ্ট, দা হিণ্ড লেগস অফ এ ক্যামেল…"

ঐ ঐতিহাসিক রচনার শেষে তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন, 'নিউ ওয়েভ' অথবা 'অফ বিট্' ফিল্ম হিসেবে সোরগোল-তোলা মৃণাল সেনের তখনকার ছবি 'ভুবন সোম-এর আংশিক সাফল্যের কার্যকারণ। তাঁর মতে ঐ সাফল্যের মূল কারণ, চলচ্চিত্রের চিরকালীন কনভেনশনকে মেনে নেওয়া। ভুবন সোম ছবিতে যে তিনটি কনভেনশন খুঁজে পেয়েছিলেন তিনি তা হল— ১॥ মনোরমা নায়িকা। ২॥ কান-মাতানো আবহসঙ্গীত। ৩॥ 'এ সিম্পল, হোলসাম উইসফুলফিলিং স্ক্রীন স্টোরী।'

সত্যজিৎ রায়ের সেই রচনার পর ৯ বছর পার। ইতিমধ্যে বদলে গেছে, অবিরল বদলে যাচ্ছে, ভারতীয় ছবির চরিত্র। 'নিউ ওয়েভ' অথবা 'অফ বিট' ছবি এখন আর আটকে থাকতে চাইছে না কোনো নির্দিষ্ট ফরমূলার খুঁটোয়। ৯ বছর আগে যা ছিল স্বল্প কয়েকজনের স্বপ্ন ও সদিচ্ছা, এখন সারা ভারতবর্ষের তরুণ পরিচালকদের কাছে তা জল-হাওয়ার মতো স্বাভাবিক। ৯ বছর আগে যদি 'নিউ সিনট্যাক্স'-এর দিকে ঝুঁকে থাকে 'নিউ ওয়েভ' পরিচালকেরা, এখন সেই অপরাধ-মোচনের দায়িত্বেই যেন বেশী করে ঝুঁকেছে 'নিউ কনটেণ্ট'-এর দিকে। 'গিমিক্রী'র উপর বলতে গেলে জারী হয়ে গেছে নির্বাসন দণ্ড। 'এম্পটি ফ্রেমবয়্যান্স' হয় পলাতক, নয় পালাবার জন্য নিজের আসবাব-পত্র গোছাচ্ছে।

এখনকার 'নিউ ওয়েভ' চলচ্চিত্রের মুখ জীবন, সময় ও সমাজের দিকে ঘোরানো। পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের ভঙ্গীতে সে এখন নেমে আসতে চাইছে গাছ থেকে শিকড়ে, মাটির জটিল গর্ভে। এ-সব ছবিতে ক্যামেরার ভূমিকা যেন দর্শকের নয় শুধু, সমালোচকেরও। আর সেই কারণেই এখনকার চলচ্চিত্রের নামকরণেও ঢুকে পড়তে চাইছে এইসব হিংস্র শব্দ—আক্রোশ, আক্রমণ, গুস্‌সা।

সর্বভারতীয় চলচ্চিত্রে এই জাতীয় উদ্যমের প্রমাণ, এবার রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের জন্যে পাঠানো ছবির তালিকা। জুরি হিসাবে আমাদের হাতে-তুলে দেওয়া হৃষ্টপুষ্ট ফাইলটি ঘাঁটতে গিয়ে যখন হাতে উঠে এল একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা, চমকে না উঠে পারিনি। সে তালিকায় ছিল গত বছরে তৈরী পরিচালকদের প্রথম ছবির নাম। আর সংখ্যায় সেটি ১৭। এই ১৭-র ভিতর থেকেই ৫টি ছবি ছিনিয়ে নিয়েছে এবারের একাধিক শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। পুরস্কৃত হতে পারেনি, এমন ছবির মধ্যেও লক্ষ্য করা গেছে জীবন বা বাস্তব-ঘেঁষা বিষয় নিয়ে অনুশীলনের চেষ্টা। আর যে ৫ টি ছবির গলায় সম্মানের মালা, তারা হল হিন্দীর আক্রোশ ও চক্র, গুজরাটের ভবানী ভাওয়াই, মালয়ালম-এর যক্তম, পাঞ্জাবের চান পরদেশী আর বাংলার ময়না তদন্ত। এইসব এবং অন্যান্য ছবির বিষয়বস্তুর দিকে চোখ ফেরানোর আগে অন্য একটা বিশেষ দিকে এক ঝলক তাকিয়ে নিতে চাই। সেটা হল পুরস্কৃত ছবির প্রযোজক। চিত্র-

প্রযোজনার মূল লক্ষ যেহেতু অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থোপার্জন, সুতরাং সেটা এক ধরণের বিত্তশালী লোকের করতলগত হয়ে থাকাই স্বাভাবিক। এবং স্বাভাবিক নিয়মে তাঁদের হাতেই চলচ্চিত্রের মান, রুচি, সৌন্দর্যবোধ, সমাজ-সচেতনা এবং নবাগত পরিচালকদের স্বপ্ন-সম্ভাবনার চাবিকাঠি। তাঁরাই মূলত নির্মীয়মান অথবা ভাবী-চলচ্চিত্রের ভাগ্যবিধাতা। তাঁদের কৃপা-করুণার জলাভাব মানেই, জলন্ত খরা।

কিন্তু এবারের অধিকাংশ ছবির অর্থনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় অপেশাদার প্রযোজকদের অংশগ্রহণও একটা নতুন সম্ভাবনার ইশারা দেয় যেন। 'আক্রোশ' গোবিন্দ নিহালনির প্রথম ছবি। 'আক্রোশ' গুরু দত্তের ভাই দেবী দত্তেরও প্রথম চিত্রপ্রযোজনা। 'যত্তম' নির্বাচিত হয়েছে মালয়ালমের শ্রেষ্ঠ ছবি। প্রসিদ্ধ ক্যামেরাম্যান শিভম-এর যেমন প্রথম ফিচার ফিল্ম এটি, তেমনি প্রথম চিত্র-প্রযোজনা শ্রীমতী বি চন্দ্রমণি বাই-এরও। আউট-ডোর শুটিং-এর জন্যে যাবতীয় যন্ত্রপাতির সরবরাহকারী একটি ব্যবসায়িক সংস্থার ম্যানেজিং পার্টনার তিনি। পাঞ্জাবী ছবি হিসাবে শ্রেষ্ঠ নির্বাচিত হয়েছে 'চান পরদেশী'। পাঞ্জাবী ছবি, শোনা যায়, ভালগারিটির জন্যে প্রসিদ্ধ। এমনি একটি আপাদ-মস্তক অশ্লীল পাঞ্জাবী ছবির প্রদর্শন বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলাম আমরা। তার পরেই যখন 'চান পরদেশী', আমার সহযোগী জুরীদের মধ্যে একজন বলে উঠছিলেন, 'এতো পাঞ্জাবের 'পথের পাঁচালী'। পরিচালক চিত্রথা সিং-এর প্রথম ছবি। প্রযোজনা করেছেন তিনজনে। শ্রীমতী শরণ সেঠা। চিরকাল থিয়েটার-আন্দোলনের উৎসাহী সংগঠিকা। চিত্র-প্রযোজনায় এই প্রথম সাহসী পদক্ষেপ। তাঁকে আর্থিক সহযোগিতা করেছেন নাট্যকর্মী এবং অভিনেতা বলদেব গীল এবং নাট্য প্রযোজক জে এস চিমা। এঁরা দুজনেই পাঞ্জাবের সরকারী ড্রামা রিপার্টরীর সঙ্গে যুক্ত। শ্রেষ্ঠ তামিল ছবি 'নেনজাত্যাই কিলাথে'। পরিচালক জে মহেন্দ্রন বয়সে তরুণ। ছবিতেও আধুনিক কালের তরুণদের প্রেমের সমস্যা। এমন ছবির যিনি প্রযোজক, তিনি বৃদ্ধ না হলেও প্রৌঢ়ত্বের শেষ ধাপে। কে রাজাগোপাল চেট্টি। এক সময়ে সাউথ ইণ্ডিয়ান ফিল্ম চেম্বার্স অফ কমার্স-এর প্রেসিডেণ্ট। সর্বভারতীয় ফিল্ম ফেডারেশনের কর্ম সমিতির সদস্য। তামিল ভাষায় শ্রেষ্ঠ ছবি 'হরিশ চেন্দ্র র্দ'। পরিচালক ইউ বিশ্বেশ্বর রাও-এর এ-ছবির যিনি প্রযোজক, বয়সে

নিতান্তই যুবক সেই ইউ ভি সুরলী কৃষ্ণ এঞ্জিনিয়ারীং-এর ছাত্র। বছরের শ্রেষ্ঠ দ্বিতীয় ছবির পুরস্কার পেয়েছে মালয়ালম ছবি 'ওপোল'। পরিচালক কে এস সেতু মাধবন। প্রযোজিকা রোজাখা জর্জ। পেশায় সাংবাদিক আর এই 'ওপোল'-এই চিত্র প্রযোজনার শুরু। শ্রেষ্ঠ অসমীয়া ছবি 'অনির্বাণ'-এর পরিচালক ভবেন্দ্রনাথ সাইকিয়ার বেলায়ও মহিলা প্রযোজক। প্রীতি সাইকিয়া।

হয়তো আরো নানা ছবির পিছনেই রয়ে গেছে এমনি সব অপেশাদার প্রযোজক-প্রযোজিকার উৎসাহী অংশ গ্রহণ। জেনে ওঠার মতো তথ্য নেই হাতের কাছে। যেটুকু পাওয়া গেছে, তা থেকে নিশ্চয়ই আমরা এমন সিদ্ধান্তে পৌছতে পারি যে, চলচ্চিত্র নামক শিল্পটিকে সচেতনভাবে সামাজিক দায়-দায়িত্বের কাজে লাগানোর ভাবনায় ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই এবং সব স্তরের মানুষের মধ্যেই, জেগেছে এক অতুলনীয় সাড়া। আর এই উৎফুল্ল অভিজ্ঞতা নিয়ে আমরা যখন ফিরে আসি নিজ বাসভূমে, পশ্চিমবঙ্গে, রঙীন ভাবনাগুলোর গায়ে নীল মরচে পড়তে সময় লাগে না বেশী। এখানে চলচ্চিত্র নির্মাণের সব স্তরে শিক্ষা-দীক্ষা, অথবা রুচি সৌন্দর্যবোধ, অথবা বৃহত্তর সামাজিক ভাবনার চেয়ে, ব্যক্তিগত ইচ্ছাপূরণ আর নিম্নমানের ছল-চাতুরীরই প্রাধান্য। অবশ্যই ব্যতিক্রম আছে অল্পস্বল্প। আর তার ফলেই বাংলা চলচ্চিত্রের মরা গাছে এখনো এমন ফুল ফোটে, যা ভারতীয় চলচ্চিত্রের মর্যাদাকে ব্যাপ্ত করে দেয় বহু দূরে।

॥ ৩ ॥

সাম্প্রতিক বাংলা ছবির ক্ষেত্রে প্রযোজক হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমিকা নিতান্ত গৌণ নয় বলেই, এ প্রসঙ্গে মৌন থাকাটা অসম্ভব। এবারের রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের জন্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিজেদের প্রযোজনায় তৈরী ছবি পাঠিয়েছিলেন মোট ৬টি। দুটি ফিচার। হীরক রাজার দেশে আর নাগপাশ। চারটি শিশু চলচ্চিত্র। এ ছাড়া একাধিক ডকুমেণ্টারী ফিল্ম। তার নির্বাচন হয়েছিল দিল্লীতে। জানা গেল, একটিও মনোনীত হয়নি। বোম্বায়ের নির্বাচনে সম্মানিত হয়েছে কেবল হীরক রাজার দেশে। সত্যজিৎ রায়ের ছবি নিয়ে নির্বাচন-অনির্বাচনের প্রসঙ্গ

অবাস্তর। যে-কেউ প্রযোজক হলেও, তাঁর ছবির গলায় মাল্যদান ঘটতোই। কিন্তু অন্য সব ছবির বেলায় কেন ঘটল এমন বিপর্যয়? আশা করবো, পশ্চিমবঙ্গ সরকারও নিশ্চয়ই মাথা ঘামাবেন এই অকৃত-কার্যতার বিষয়ে। আর তারই পরিপ্রেক্ষিতে স্থির করবেন পরবর্তী পদক্ষেপ। অস্বীকার করার উপায় নেই যে, অন্যান্য সরকারের চেয়ে বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার, বাংলা চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্যে টাকা জুগিয়েছেন দু হাতে। দুভাবে করেছেন সে কাজ। সরাসরি নিজেদের প্রযোজনায় ছবি তৈরী করা। আর ছবি করিয়েদের মোটা টাকা অনুদান বা গ্রাণ্ট-ইন-এড দিয়ে। কিন্তু এ পর্যন্ত 'হীরক রাজার দেশে' ছাড়া সরকারী প্রযোজনায় তৈরী একটি ছবিও উঁচু মানে উন্নীত হতে পারেনি। এমন কি খ্যাতনামা পরিচালকদের মুঠো অকৃপণ দানে ভর্তি করে দিয়েও। এই বিপুল ব্যর্থতার দিকে তাকিয়ে আমাদের ভাবনাগুলোকে যদি অকপটে বলতে পারা যায়, সেগুলোর চেহারা দাঁড়াবে এই রকম :—

১॥ যেখানেই সরকারী টাকা সেখানেই যেন সদব্যবহারের চেয়ে অন্য কোনো দিকে বেশী আগ্রহ, সাধারণ মানুষের মনে গেঁথে বসেছে এমনি এক ধারনা।

২॥ যেহেতু বর্তমান সরকার বামপন্থী সুতরাং সরকারী টাকার বিনিময়ে যেন পরিচালকের ঘাড়ে হাতে-গরম বিপ্লব আমদানি করার দায় চাপানো হয়েছে, এমনি ভঙ্গীতেই বহু ক্ষেত্রে অপ্রোয়জনে এবং অপ্রাসঙ্গিভাবে রাজনৈতিক বোলচালের আধিক্য বা প্রবণতা অনেক সম্ভাবনাময় ছবিকে করে তুলেছে কৃত্রিম এবং অক্ষমতাময়।

৩॥ সরকারী প্রযোজনায় তৈরী পূর্ণাঙ্গ এবং বিশেষ করে স্বল্প দৈর্ঘের ছবিগুলো দফায় দফায় দেখে সুষ্ঠু এবং সুস্থ তদারকির ভার যে-সব কমিটির উপর বিন্যস্ত, তারাও নিশ্চয়ই শিল্পের চেয়ে রাজনৈতিক বুলির সম্বন্ধে বেশি অভিজ্ঞ। কোনও একটি ছবিতে কতটা সঠিক রাজনৈতিক মতামত ব্যক্ত হয়েছে তা দেখে তাঁরা যতখানি সুখী এবং সন্তুষ্ট হতে পেরেছেন, সম্পূর্ণ ছবিটিকে সর্বতোভাবে, অর্থাৎ অভিনয়, এডিটিং, আবহ-সঙ্গীত, শব্দ যোজনা ইত্যাদি মিলিয়ে একটা মোটামুটি উঁচু মানের দিকে উর্ধ্বমুখী না-হয়ে ওঠার জন্যে ঠিক ততখানি সজাগ এবং সমালোচনামুখর হতে পারেননি।

৪ ॥ এমন ঘটনাও ঘটেছে কোনো বিশেষ গল্পের জন্তে প্রাথমিকভাবে সরকার যতখানি দৈর্ঘ্য মনোনয়ন করেছিলেন, বহু ক্ষেত্রেই তা লম্বা হয়ে গেছে আরও। আর অপ্রয়োজনের ঐ দৈর্ঘ্যই সে-সব ছবির ভরাডুবির অন্যতম প্রধান কারণ!

৫। অতীতে এফ এফ সি অথবা এখনকার এন এফ ডি সির কাছে হাত পাতলেই টাকা জোটে না। পেশ করতে হয় পূর্ণাঙ্গ চিত্রনাট্য এবং ন্যায্য বাজেট। খুঁটিয়ে বিচার করে, গল্পের চাহিদার পক্ষে বাজেট বেশী হলে ছেঁটে, কম হলে বাড়িয়ে, তবেই মঞ্জুর করা হয় আবেদন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি সে-রকম পদ্ধতির অনুসরণ করেন, মনে হয় না মানহানি ঘটানো হবে কারো।

দীর্ঘ অভিজ্ঞতার পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিশ্চয় অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছেন ইতিমধ্যে। সরকারী অর্থের বিনিময়ে কারা সরকারকে ফিরিয়ে দিতে চেয়েছে সরকারের প্রাপ্য সম্মান এবং কারা চায়নি জানা হয়ে গেছে সেটাও। অন্যদিকে কারা নিম্নমানের ছবি সম্পর্কে প্রশংসার অথবা বিনা সমালোচনার রিপোর্ট জুগিয়ে মূলত সরকারী মান-মর্যাদার গায়েই মাখিয়ে দিয়েছেন কালি অথবা কলঙ্ক, তাও অজানা থাকার কথা নয়। এঁদের সম্পর্কেও সরকার সতর্ক হবেন নিশ্চয়ই। গায়ে পড়ে এত কথা দুটো কারণে। এক, বোম্বায়ে থাকা কালীন আমাদের লজ্জা। দুই, বাংলা চলচ্চিত্রের সর্বাঙ্গীন উন্নয়নে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আন্তরিক কার্যক্রমের প্রতি আমাদের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও সমর্থন।

॥ ৪ ॥

ডালপালা সরিয়ে এবার আসল অরণ্যে। অর্থাৎ এক বছরের ভারতীয় ছবিতে কি দেখলাম নতুন, আর কি পেলাম উদ্দীপ্ত হওয়ার মতো, তারই হিসেবনিকেশ। এখানে আলোচনার বিষয় থাকবে শুধুমাত্র পুরস্কৃত ছবির মধ্যে সীমাবদ্ধ।

এক সঙ্গে এতগুলো ছবি, কোনও কোনোটি আবার দুবার দেখে ভাবনার অথবা অভিজ্ঞতার স্তরে, বন্যার জল নেমে গেলে পলি পড়ার মতো, যে পাতলা এবং উর্বর আবরণ বিছিয়ে দিয়েছে, সেটার সংক্ষিপ্তসার এই রকম—

১। প্রত্যেকটি ছবিতেই বিষয়ের বৈচিত্র্য।

২। বিষয়-নির্বাচনের মর্মমূলে রয়েছে জীবনের প্রতি গভীর মমতাবোধ। সেই সঙ্গেই সমকালীন পরিবেশের গভীরে নেমে গিয়ে তীক্ষ্ম তীব্র এবং প্রতিবাদমুখর পর্যবেক্ষণ।

৩। ন্যারেটিভ স্টাইলকে খুব বেশী না-ভাঙা।

৪। গিমিক বা যান্ত্রিক চাতুরীকে এড়িয়ে যাওয়া।

৫। সংখ্যালঘুকে ছেড়ে সংখ্যাগুরুকে আকৃষ্ট করার সদিচ্ছা, গল্পের মেরুদণ্ডকে ব্যবসায়িক ছবির ফরমুলার দাপটের দিকে না নুইয়েই।

৬। অভিনয়ের উপর জোর। এবং অভিনয়ে নতুন ধারার সূচনা।

'আক্রোশ' ছবির প্রধান চরিত্রটি আদিবাসী দিনমজুর। 'হরিশচন্দ্রেদু'র প্রধান চরিত্র ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক নেতা, নিজের স্বার্থের প্রয়োজনে যে-কোনো অন্যায় অপরাধে অকম্পিত নন যিনি। 'চান পরদেশী'র নায়কও একজন কৃষক। যার স্ত্রীকে ভোগ করার বাসনায় জমিদারের তৈরী চক্রান্তের নির্মম শিকার হতে হয় এই সরল চাষীটিকে। 'সঙ্গম'-এর নায়ক প্রাচীন সংস্কার ও মূল্যবোধ আঁকড়ে থাকা এমন একটি পরিবারের ছেলে, যে ভিতরে সংবেদনশীল কবি, বাইরে সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের নিষ্ঠাবান কর্মী। 'অনির্বাণ'-এর নায়ক প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক। 'চক্র'র কোনো নির্দিষ্ট নায়ক নেই। বোম্বায়ের 'স্লাম' এলাকার সমস্ত দুর্ভাগাপীড়িত মানুষই যেন এর নায়ক। তবে নায়িকা সম্ভবত একজনই। স্মিতা পাতিলের অভিনীত 'আম্মা', যার জন্যে এ বছর শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার। স্মিতা এ ছবিতে আগাগোড়াই এক বস্তিবাসিনী। এমন কি বালতির জল গায়ে ঢেলে উন্মুক্ত পরিবেশে লজ্জা সংকোচহীন স্নানের দৃশ্যেও তিনি আকর্ষনীয়রূপে স্বাভাবিক। 'ভবানী ভাওয়াই'-এর নায়ক নির্বোধ অক্ষম, অপদার্থ অথচ যুদ্ধবাজ, ক্ষমতাপ্রিয় রাজা। অনেকটা 'হীরক রাজার দেশে'-র রাজার মতোই। দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ ছবি 'ওপোলে'র নায়ক একজন অবসরপ্রাপ্ত মিলিটারী যোদ্ধা, এক পাথুরে পরিবেশে এখন যার সামান্য জমি-জমা, কাঁচা বাড়ি। নিজে চাষীর মতো পরিশ্রমী। স্বপ্ন. এই পরিশ্রমের ফসলে দু বছরের মধ্যেই গড়বে

নিজের পাকা বাড়ি। কঠোরে-কোমলে, পাহাড়ে-ঝরনায় মিশে-থাকা এই চরিত্রটি স্বাদে-গন্ধে বেশ নতুন। বছরের শ্রেষ্ঠ ছবি হিসেবে নির্বাচিত 'আকালের সন্ধানে' অনেকটা 'চক্র'র মতোই। ধৃতিমান অভিনীত পরিচালককে কি এ-ছবির নায়ক বলা চলে? কেননা গল্প একটু এগোতে থাকলেই গল্পের নায়ক হয়ে ওঠে একটা গোটা গ্রামাঞ্চল এবং একটি ফিল্ম-ইউনিটের সমস্ত সদস্য। 'ময়না তদন্তের' নায়ক এক আদিবাসী যুবক।

এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে আমরা সহজেই অনুমান করে নিতে পারি, একালের চলচ্চিত্র তুরপুনের মতো ঘুরে ঘুরে, নানা প্রতিবন্ধকতা ভেদ করে, কিভাবে নেমে যেতে চাইছে ঘুণধরা সমাজের ভিতরে। বাংলা এবং মালয়ালম ছবির নৈপুণ্য এবং সাফল্যকে দূরে সরিয়ে আমরা যদি শুধু মাত্র হিন্দী ছবির দিকে তাকাই, আধুনিক চলচ্চিত্র আন্দোলনের অনেক তথ্য এবং সত্য জানা হয়ে যাবে আমাদের। এক সময় সাধারণভাবে 'হিন্দী' ছবি ছিল আমাদের কাছে দূষিত এবং অসাস্থ্যকর আমোদেরই নামান্তর। এখন জমানা গেছে পাল্টে। পাহাড় প্রমাণ অর্থ ঢেলে বানানো বাঘা-বাঘা কমার্শিয়াল ছবির সঙ্গেও পাঞ্জা লড়ার সাহস খুঁজে পেয়েছে লো-বাজেটের, অর্থাভাবে ১৬ মিলিলিটারে তোলা 'নিউ ওয়েভ'-এর ছবি। এতকাল 'প্যারালাল সিনেমা' কথাটাই শুনে এসেছি আমরা। কিন্তু হিন্দীর 'নিউ ওয়েভ' প্যারালাল সিনেমার আন্দোলনকে জোরদার করার বড় হাতিয়ার হিসেবে তৈরী করে নিয়েছে প্যারালাল অভিনেতা অভিনেত্রী। এ ব্যাপারে সবচেয়ে বড় অভিনন্দন যাঁর প্রাপ্য, তিনি শ্যাম বেনেগল। একদা বাংলা ছবিতে যা করেছিলেন সত্যজিৎ রায়, অর্থাৎ নতুন-নতুন অভিনেতা অভিনেত্রী আবিষ্কার, হিন্দী ছবিতে শ্যাম বেনেগলের অবদান সেই মাপের। স্মিতা, সাবানা, নাসিরুদ্দীন, অমরীশ পুরী, কুলভূষণ, অনন্ত নাগ, আংশিকভাবে গিরীশ কার্নাড, এই এতগুলো দুর্ধর্ষ প্রতিভার আত্মপ্রকাশ বেনেগলের ছবি থেকেই। আর অন্যান্য ছবি থেকে এসেছেন ওম পুরী, অরবিন্দ ও সুলতা দেশপাণ্ডে, শ্রীরাম লাগু, রমা ভিজ প্রমুখেরা। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার আসাম, উড়িষ্যা অর্থাৎ সমগ্র পর্বাঞ্চল বাদ দিলে, ভারতবর্ষের অন্য অনেক

জায়গাতেই নতুন অভিনেতা অভিনেত্রীর আবির্ভাবটা বিস্ময়কর। মনে আছে, গত বছর বাঙ্গালোরে নচিকেতা আর জয়ু পট্টবর্ধনের তৈরী 'টুয়েন্টি সেকেণ্ড জুন' ছবিটা দেখে এসে ঐ ছবির চাপেকর ভায়েদের চেহারা এবং অভিনয়ের প্রশংসায় কীভাবে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন সত্যজিৎ রায়। এই সব প্রতিভার অধিকাংশই এসেছেন স্থানীয় নব-নাট্য আন্দোলনের মারফত। পশ্চিম বাংলার নবনাট্য আন্দোলন গাছপালার মতো অভিনেতার জন্ম দিয়েছে বা দিচ্ছে হয়তো অনেক। কিন্তু শাল-শেগুন শিরিষের মতো কদাচিৎ। হয়তো নাটকের বিষয়টাই অন্তরায় হয়ে উঠছে এখানে বড়-মাপের অভিনেতা গড়ে ওঠার পক্ষে।

'নিউ ওয়েভ' হিন্দী চলচ্চিত্র সম্পর্কে আরো কিছু প্রশস্তিবাক্য উচ্চারণ করতে বাধ্য হই আমরা ঐ সব ছবিতে নাম-করে-যাওয়া অভিনেতা-অভিনেত্রীদের আন্তরিক সহযোগিতার কথা মনে রেখে। চরিত্র ছোটো কি বড়ো, সংলাপ আছে কি নেই, চরিত্রটা ইমেজ বাড়ানোর পক্ষে মিত্র কি শত্রু এসবের দিকে কণামাত্র ভ্রূক্ষেপ না-করেই, তাঁরা নেমে পড়তে পারছেন ডাক-আসা ছবিতে। 'আক্রোশ'-এ স্মিতা, 'অ্যালবার্ট পিন্টোতে' স্মিতা এবং সাবানা, 'চক্রে' কুলভূষণ কী যৎসামান্য চরিত্রেও অভিনয় করেছেন সানন্দে এবং ক্ষমতার ছাপ রেখে।

'নিউ ওয়েভ' হিন্দী ছবি তার বিপুল সাফল্যের পিছনে পেয়ে গেছে আরও দুটি প্রতিভা। চিত্রনাট্যকার বিজয় তেণ্ডুলকর আর সংলাপ রচয়িতা সত্যদেব দুবে। অধিকাংশ উঁচু মানের হিন্দী ছবির টাইটেলে চোখ পাতলেই দেখা যাবে তেণ্ডুলকরের নাম। আজকের হিন্দী নিউ ওয়েভের পিছনে, হিসেব কষলে স্বীকার করতে হবে তাঁর একার কৃতিত্বের দামটাও বিরাট। পেয়েছিলেন নেহরু ফেলোশিপ। গবেষণার বিষয় 'ভায়োলেন্স'। সেই সুবাদে ভারত-পর্যটন। হিংসার চরিত্র, যা কখনো ব্যক্তিগত, কখনো গোষ্ঠীগত, কখনো রাজনৈতিক খুঁটিয়ে দেখে নেওয়া সেই সুযোগে। সাধারণ ভাবে মানুষের জীবনে কীভাবে ম্যালেরীয়া জ্বরের মতো জাঁকিয়ে বসছে নিরাপত্তাহীন এক ভয়, মানুষ কত সহজে, প্রায়

বকের লম্বা ঠোঁটে চুনো-পুঁটির মতো হয়ে পড়েছে এক সন্ত্রাসময় পাকচক্রের শিকার, সেই অভিজ্ঞতার উর্ধ্বমুখী চাপ একদিকে যেমন তাঁর নাটকে, তেমনি চিত্রনাট্যে।

কিন্তু, শ্রদ্ধা বজায় রেখে, এবং আভূমিনত সম্মান জানিয়েও, প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে দুটো-একটা। তেণ্ডুলকরের হাতে-গড়া চিত্রনাট্য শেষ পর্যন্ত কোথাও আটকে যাবে না তো এই দুঃসাহসী জয়যাত্রা? জীবনেকে যিনি এমন ওতপ্রোতভাবে জেনেছেন, মিথ বা পৌরাণিকতার কাছ থেকে তা হলে কেন প্রায় প্রত্যেক চিত্রনাট্যের জন্যেই ধার নিতে হয় নারী-হরণের বা নারী নির্যাতনের 'লেট মোটিভ'? অন্য দিকে সেই নারী কখনোই পায় না কোনো প্রতীকের মাত্রা, তাকে ঘিরে গড়ে ওঠে না নতুন কোনো 'মিথ'-এর সম্ভাবনা। কেন তাঁর প্রায় সমস্ত চিত্রনাট্যের পক্ষেই প্রায় অপরিহার্য হয়ে ওঠে, একটি চেস-এর দৃশ্য, গ্রাম্য বা আঞ্চলিক রিচ্যুয়াল'? এবং কেনই বা তাঁর চিত্রনাট্যে এত সংলাপ?

সাম্প্রতিক 'নিউ ওয়েভ' সম্পর্কে আমার মনে এই একটা জায়গাতেই খটকা। এত কথা-প্রধান ছবিতে চলচ্চিত্রের আসল মহিমা, তার চিত্র-প্রতিমা, তার মর্মভেদী এবং স্মরণীয় নীরবতা, নিশ্চুপ স্থিরতাকে দিয়ে তার অনেক কথা বলিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা, মার খাচ্ছে যেন। 'আক্রোশে' একটা প্রধান চরিত্র আগাগোড়া নিশ্চুপ থাকা সত্ত্বেও চারপাশের অবিরল সংলাপ কোথাও যেন মহৎ বা বৃহৎ চলচ্চিত্রের স্বাদ দিতে গিয়েও থমকে যায়। সংলাপের উপর এতখানি নির্ভরশীল বলেই আক্রোশে নকশাল আন্দোলনের সাংগঠনিক চেহারা দেখানোর বদলে তিনি কত সহজে বেছে নিতে পারেন একটিমাত্র প্রতিভূ চরিত্র। একটি মাত্র চরিত্রের সংলাপে একটা আন্দোলন আর তার আদর্শ দেখাতে গিয়ে কী বিসদৃশ রকমের খোঁড়া এবং কৃত্রিম হয়ে যায় ঐ অংশটি অথবা মূলত ঐ মার্কসবাদী চরিত্রটিই। আর তেমনিই মনে আঁচড় কাটে না নাসিরুদ্দিনের আক্রমণ থেকে উদ্ধারের প্রাণপণ দৌড়। যেহেতু ওটা নিছক নাটকীয়তা তৈরীর প্রয়োজনেই জুড়ে দেওয়া। যে আগেই নানা আক্রমণাত্মক ঘটনার মধ্যে দিয়ে জেনে গেছে যে, তাকে হত্যা করার চক্রান্ত চলেছে চারদিকে, প্রেমিকার সঙ্গে

গল্পেগুজবে মিলিত হওয়ার মতো রোমান্টিক এবং নির্ভাবনাময় ভঙ্গীতে দূরান্তের সমুদ্রতীরে হেঁটে আসার জরুরী প্রয়োজনটা তার কোথায়?

এসব প্রশ্নের অথবা সমালোচনার পরেও, স্বীকার না করে উপায় নেই নিউ ওয়েভ হিন্দী ছবি ভারতীয় চলচ্চিত্রের যজ্ঞশালায় মরা আগুনে ঘি ছিটিয়ে চলেছে বেশ শক্ত হাতেই। এবারের রাষ্ট্রের পুরস্কারের প্রতিযোগিতার জন্যে হিন্দী ছবির সংখ্যাটাই ছিল সবচেয়ে বেশী। ২০। এর মধ্যে যেমন ছিল আকাশ ছোঁয়া বাজেটের 'বার্নিং ট্রেন', তেমনি সাড়ে বত্রিশ ভাজা, 'আলিবাবা আউর চল্লিশ চোর'। এসব ছাড়াও নামজাদা তারকা লাঞ্ছিত অখাদ্য-কুখাদ্য অনেক। আনন্দের খবর, ঝড়ের কুটোর মতো উড়ে গেছে সেসব আবর্জনা। জয়মাল্য পেয়েছে তারাই, যারা জানে আজকের চলচ্চিত্রকে আজকের ভারতবর্ষের নাটমঞ্চে দাঁড়িয়ে অভিনয় করতে হবে কোন্ ভূমিকায়।

এই প্রসঙ্গে পূর্ণচ্ছেদ টানার আগে আরো দুটো সাফল্যের কথা বলে নিতে চাই। তা শিল্প নির্দেশনার প্রসঙ্গে। এবারে শিল্প-নির্দেশকের সম্মান পেয়েছেন গুজরাটী ছবি 'ভবানী ভাওয়াই'-এর মীরা লাখিয়া। বোম্বাইয়ের জে জে স্কুল অব আর্টস-এর ছাত্রী। এখন যুক্ত আমেদাবাদের 'স্পেস অ্যাপ্লিকেশন সেণ্টার'-এর সঙ্গে। ছোটগল্প লেখেন মারাঠীতে। আঁকেন পোস্টার, গড়েন নাটকের সেট, পোশাক-আশাকের ডিজাইন। 'ভবানী ভাওয়াই'-এর যে অংশটুকু রূপকথা বা ফ্যাণ্টাসী, তার জন্যে যে রাজকীয় প্রাসাদ, সেটা নিখুঁত গড়ে তোলার কৃতিত্ব মীরা লাখিয়ারই। ২৫-৩০ বছর বন্ধ হয়ে পড়ে থাকা একটা ভগ্নপ্রায় অট্টালিকা দীর্ঘ অনুসন্ধানে খুঁজে বের করে, তার নষ্ট সৌন্দর্যকে অতীতের ছাঁচে ঢেলে সাজিয়ে গড়ে তুলেছেন সে রাজপ্রাসাদ। তার গায়ে সময়ের ছাপ, বসবাসকারীদের জীবনযাপনের ছোঁয়া। অথচ তা রূপকথার মতোই কাল্পনিক, বাস্তবের চেয়েও বেশী। 'ভবানী ভাওয়াই'-এর শিল্প-নির্দেশনার দিক থেকে চোখ সরিয়ে আমরা যখন 'হীরক রাজার দেশে'র দিকে তাকাই, চোখে ধাক্কা মারে এর ঝকঝকে তকতকে মাজা-ঘসা কৃত্রিমতা। যেন গল্পের জন্যেই এর জন্ম হয়েছে এইমাত্র, ইতিপূর্বে বসবাস করেনি কেউ। গ্রামের পাঠশালা, গ্রামের মানুষ, লং-শটে সত্যিকারের প্রাচীন দুর্গের আভাস, খনিগর্ভের নিখুঁত

বাস্তবতার পাশাপাশি হীরক রাজার এই প্রাসাদকে এতই সাজানো-গোছানো এবং চরিত্রে এতই অভারতীয় লাগে যে, চোখ বেয়ে মনের ভিতরে এসে জোগাতে পারে না স্বতঃস্ফূর্ত আলোড়ন।

আমরা আলোড়িত হয়েছিলাম আর এক ছবির অসামান্য দৃশ্যপট রচনায়। অনায়াসেই পুরস্কৃত হতে পারতেন শিল্প নির্দেশক বংশীচন্দ্র গুপ্ত, 'চক্র' ছবিতে তাঁর অবিশ্বাস্য রকমের নিখুঁত বোম্বাই স্লাম এলাকার সুদীর্ঘ সেট রচনার জন্যে। ছবির শেষ দৃশ্যে এক দানবীয় বুলডোজার হাঁটতে হাঁটতে এগোয় ঐ বস্তীর হাড়-পাঁজর ভাঙতে ভাঙতে। দৃশ্যটিকে আরো মর্মান্তিক চেহারা দেওয়া যেতে পারতো অনায়াসে। বেদনায় আরো গভীর করে তোলা যেতে পারতো মানুষের খুঁটিনাটি ব্যবহার্য জিনিসের ডিটেল জুড়ে দিয়ে। আর এখানে আবহসঙ্গীতের ভূমিকা ছিল বেশ গুরুত্বময়। যান্ত্রিক কোনো ধ্বংসময় শব্দের ব্যবহারে সার্থক হতে পারতো সেটা। কিন্তু পরিচালক এসবের পরিবর্তে জুড়ে দিলেন এক সকরুণ গান। যা হতে পারতো বিস্ফোরণের মতো ভয়ংকর, তা হয়ে গেল ফুলঝুরির মতো চটুল। বংশীচন্দ্র গুপ্তের প্রাণপাত পরিশ্রম মর্যাদা পেলনা এখানে।

৫ ॥

যে কোনো উচ্চ সম্মানে পুরস্কৃত হওয়ার যোগ্য একটি ছবি এ বছরে সন্মানিত হলো না চেয়ারম্যানের ভুল ব্যাখ্যায়। ১৫ জনের মধ্যে ১১ জন জুরী ছিল মণি কাউলের 'সতহ সে উঠতা আদমী'কে স্পেশাল জুরী অ্যাওয়ার্ড দেওয়ার পক্ষে। তবুও যে তা ঘটল না, সেটা মণি কাউলের চেয়ে আমাদের পক্ষেই দুর্ভাগ্যের, যথার্থ শিল্পকর্মকে অনুভবের অক্ষমতার প্রমাণ হিসেবে। শেষ পর্যন্ত ৮ জন জুরী নির্বাচনের পালা ফুরোবার সঙ্গে সঙ্গেই চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ পত্রে স্বাক্ষর করে পাঠিয়ে দেন কেন্দ্রীয় তথ্যমন্ত্রীর কাছে। আশা করা গিয়েছিল তথ্যমন্ত্রীও গুরুত্ব দেবেন এই প্রতিবাদ পত্রকে। পরবর্তী ঘটনায় বোঝা গেল সে প্রতিবাদপত্রের অকালমৃত্যু ঘটেছে ফাইল চাপা পড়ে। মণি কাউলের এই ছবিটি, আমাদের

ধারণায় একটা দুঃসাহসী ছবি, যা গজানন মাধব মুক্তিবোধ-এর সমগ্র রচনায় অন্তঃসার অবলম্বনে তৈরী! যাঁরা কীর্তন শুনতে অভ্যস্ত তাদের কাছে এটা মার্গ সংগীতের মতোই দুরূহ-দুর্বোধ্য ঠেকতে পারে। কিন্তু এর মধ্যে অন্তর্নিহিত রয়েছে আগামীকালের চলচ্চিত্রের মুক্তির আরেক ধরনের সম্ভাবনা, নিয়মের শিকল ছিঁড়ে। ইচ্ছে রইল, সমগ্র চিত্রনাট্যটি সংগ্রহ করে এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার।

ফিল্মোৎসব ৮২

যে-সকল পাঠক বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' নামক উপখ্যানের সহিত পরিচিত তাহারা নগেন্দ্রের নৌকাযাত্রার বিষয়ে অবশ্যই অবগত। নগেন্দ্রের নৌকাযাত্রার সহিত আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয়ের কোনো নিকট সম্বন্ধ নাই বলিলেই সত্য বলা হয়। তত্রাচ উক্ত উপাখ্যানের উল্লেখ এই কারণে যে কলিকাতার ফিল্মোৎসব ৮২-র শুভারম্ভের প্রাক্কালে অবিকল নগেন্দ্রের নৌকাযাত্রার অনুসরণে "আকাশে মেঘ উঠিল, মেঘ আকাশ ঢাকিল, নদীর জল কালো হইল, গাছের মাথা কটা হইল, মেঘের কোলে বক উড়িল, নদী নিস্পন্দ হইল।" অর্থাৎ কলিকাতার চিত্রগৃহগুলিতে ধর্মঘট বাধিল, ধর্মঘট সারা দেশে ব্যাপ্ত হইল, ধর্মঘট মিটিবার সম্ভাবনা লুপ্ত হইল, কলিকাতার সিনেমা-প্রিয় মানুষের মুখ লজ্জায় লাল এবং বেদনায় নীল হইল, ফিল্মোৎসব কলিকাতা হইতে মাদ্রাজে স্থানান্তরিত হইবার গুজব ডানা ছড়াইল, কলিকাতা শোকার্তের অনুকরণে নিস্পন্দ হইল।

কলিকাতা নিবাসী চলচ্চিত্রামোদীর হৃদয় স্পন্দনহীন হইবার পক্ষে অন্যান্য কারণেরও যোগান ছিল প্রচুর। বহুদিনের প্রচারে স্বদেশে এবং বিদেশে কলিকাতা সম্বন্ধে একটি ধারণা ক্রনিক ব্যাধির মতোই পাকাপোক্ত হইয়া উঠিয়াছে যে, ইহা একটি সাংঘাতিক স্থান। ইহাতে

যান-বাহন অপ্রতুল, ইহার বাতাস বিষাক্ত, ইহার দিন দুঃসহ, রাত্রি শ্বাসরোধকর, ইহার আইন-শৃঙ্খলার চরিত্র রাজধানী দিল্লীর ন্যায় নিরাপরাধ ও পবিত্র নয়, ইহাতে বিদেশাগত অতিথিদের যথাযথ আপ্যায়নের যোগ্য আধুনিক উন্নত ও সম্ভ্রান্ত হোটেল ইত্যাদি দুষ্প্রাপ্য, ইহা শহর হিসেবে মৃত এবং চলচ্চিত্র উৎসব নামক একটি মহাযজ্ঞের কাষ্ঠ, ঘৃত ও তৈল সরবরাহে ইহা পরিপূর্ণরূপে অক্ষম।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, নগেন্দ্রের কাহিনীতেও যেমন ঘনান্ধতমোময়ীস্বরূপা রাত্রির আকাশে ঝড়-বৃষ্টি বজ্রাঘাত নিজেদের স্বীয় প্রতিভা ও ক্ষমতার যথাযথ প্রদর্শনীর শেষে শান্তরূপ ধারণ করিয়াছিল, এবং নগেন্দ্রকে একটি ভগ্ন প্রকোষ্ঠে আশ্রয়দান করিয়াছিল, ফিল্মোৎসব ৮২-ও তেমনি কলিকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের উৎসুক উদ্‌ভ্রান্ত দর্শকসমাজের বুকের আশা-নিরাশার আন্দোলিত ঝড়কে থামাইয়া নির্দিষ্ট দিনক্ষণেই তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন সেই সব প্রকোষ্ঠে টানিয়া আনিল, যাহাকে আমরা চিত্রগৃহ বলিয়া সম্ভাষণ করিয়া থাকি।

ইহার পর হইতে নগেন্দ্রের কাহিনীর সহিত এই নিবন্ধের আর কোনো আত্মীয়তা নাই তবে নগেন্দ্র যেমন ভগ্ন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া গৃহচ্যুত ইষ্টকখণ্ডের উপর একটি তৈলাভাবে পীড়িত মৃন্ময় প্রদীপ দেখিতে পাইয়াছিল, শুভ উদ্বোধন দিবসে আমরাও রবীন্দ্রসদন প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ করিয়া মঞ্চোপরি সেইরূপ একটি মৃন্ময় প্রদীপের দর্শন লাভ করি। পার্থক্য এই যে মঞ্চের প্রদীপটি ছিল সুদৃশ্য ও অলংকৃত একটি দীপদানের উপর স্থিত। তাহাতে তৈলাভাব ছিল কিনা জানা সম্ভব হয় নাই। কারণ প্রবেশ মুহূর্তেই মঞ্চের শোভা দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ। অবশ্য সেই সঙ্গে মস্তিষ্ককোষে যে কিছু বিভ্রমজনিত প্রশ্ন উঁকিঝুঁকি মারে নাই তাহা নয়। মঞ্চে উপবিষ্ট গণ্যমান্যদের দিকে এক ঝলক তাকাইয়া সন্দেহ জাগিয়াছিল ইহা এন.এফ.ডি.সি নামক সরকারী সংস্থার বার্ষিক অধিবেশন নয়তো? এরূপ বিভ্রম উৎপাদন নিতান্ত অকারণের নহে। গত বৎসর দিল্লীর প্রতিযোগিতামূলক উৎসবের উদ্বোধন দিবসে উপস্থিত থাকিবার সৌভাগ্যে মঞ্চে দেশ-বিদেশের স্বনামধন্য পরিচালকদের উপস্থিতি প্রত্যক্ষগোচর হইয়াছিল। এবারেও তাহার পুনরাবৃত্তি দেখিবার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকার পরিণামেই সম্ভবত

এহেন বিভ্রম। তবে ইহাই হয়তো সরকারী নীতি। প্রতিযোগিতামূলক উৎসবে থাকিবে পরিচালকদের আধিপত্য। অপ্রতিযোগিতামূলক উৎসবে সরকারী আমলাদের। পরে, নিজস্ব আসন গ্রহণান্তে এবং দৃষ্টিশক্তির সহিত অনুভবশক্তির সমন্বয়ান্তে, মঞ্চে উপবিষ্ট মহামান্য আমলাদের মধ্যে বিপুল কোনো আর্যপ্রয়োগ অথবা বৃহৎ কোনো ব্যতিক্রমের মতো সত্যজিৎ রায়ের সমুজ্জ্বল উপস্থিতি নেত্রপথে উদ্ভাসিত হইলে বিভ্রম দূরীভূত হয়। বুঝিতে পারি চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন উপলক্ষেই এই মঞ্চসজ্জা। আরও কিছু পরে, মঞ্চের সম্মুখবর্তী আসনে বোম্বাই চিত্রকারদের উপর কলিকাতা দূরদর্শনের মুহুর্মুহু আলোকসম্পাত এবং অন্যদিকে উপরের গ্যালারীতে ইতস্তত ও ছত্রাকারে বাঙলার নবীন ও প্রবীণ পরিচালক, স্বনামধন্য কলাকুশলী, যশস্বী সাংবাদিক, বিশ্ববিশ্রুত ক্যামেরাম্যান এবং বাঙলার সবচেয়ে প্রিয় প্রতিভাময়ী অভিনেত্রীকে দূরদর্শনের আলোকোজ্জ্বল দাক্ষিণ্য হইতে বহুদূরে উপবিষ্ট থাকিতে দেখিয়া বুঝিতে আর বিন্দুমাত্র বিলম্ব ঘটিল না যে, অদ্য ফিল্মোৎসব ৮২-র শুভ উদ্বোধন আসন্ন।

যথাসময়ে মহামান্য আমলাগণ একে একে উঠিয়া পরস্পরকে লিখিত ভাষায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন। উৎসবকে সার্থক ও সম্পূর্ণ করিবার জন্য এই জাতীয় মামুলি ভাষণের ধারাবাহিক বর্ষণ সম্ভবত একান্তই অপরিহার্য। যদিচ লোকমুখে শুনিয়া থাকি বিদেশের উৎসবে এইরূপ অনর্গল বাগাড়ম্বরের কোনো স্থান নাই। নামমাত্র ভাষণই সেখানে যথেষ্ট। তবে আমাদের দেশ তো বিদেশ নয়। কর্মে দশ এবং বাক্যে শত, এখানে এইরূপ নিয়ম সচল।

উদ্বোধন দিবসের দুইটি ভাষণের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। তবে ভিন্ন ভিন্ন কারণে। প্রথম কৃতজ্ঞতা সত্যজিৎ রায়ের প্রতি। তাঁহার ভাষণে মৃত কলিকাতা জীবিত হইল। কলিকাতা সম্বন্ধে দেশ-বিদেশের অপবাদ-রটনাকারীদের মুখে তিনি ছাই ঢালিলেন। দুয়োরানীতুল্য এই শহর যেন পুনরায় সম্মানের সোনার পালংক ফিরিয়া পাইল। তিনি যে আবাল্য এই কলিকাতারই সন্তান, ইহাই তাঁহার আজীবনের কর্মস্থল ইহার সহিত তিনি মমতাবদ্ধ, তাঁহার সংক্ষিপ্ত এবং উদ্দীপ্ত ভাষণের মাধ্যমে এই সত্যকে নতুনরূপে আবিষ্কার করিয়া আমাদের চোখ

অজ্ঞাতসারেই অশ্রুসজল হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার ভাষণ যদি যথার্থ ই কর্তৃপক্ষের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া থাকে, তাহা হইলে এখন হইতে আমরা অর্থাৎ এই মহানগরীর জাতকেরা ১৯৮৫-র উৎসব সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হইতে পারি।

আমাদের আরেক ধরনের কৃতজ্ঞতা তথ্য ও বেতার দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী বসন্ত ভাই শাঠে সাহেবের প্রতি। তুচ্ছ কথাও বলিবার নাটকীয় ভঙ্গীতে, উচ্চারণের দৃঢ়তা এবং সুস্পষ্টতায় এবং সর্বোপরি ব্যক্তিত্বের ছোঁয়ায় কীভাবে মূল্যবান হইয়া উঠে, শাঠে সাহেবের সেদিনকার বক্তৃতা তাহার এক চরম দৃষ্টান্ত। যে-সকল কথা বৃদ্ধেরা ট্রামে-বাসে, যুবকেরা গৃহস্থবাড়ির রকে অথবা চায়ের টেবিলে, মহিলারা রন্ধনশালায়, ফিল্ম-জগতের ফোড়েরা ডিস্ট্রিবিউটরদের গুমটিঘরে নিয়মিত উচ্চারণ করিয়া থাকে বলিয়া আমরা সাধারণত কর্ণপাতের অযোগ্য বিবেচনা করিয়া থাকি, সেই জাতীয় নগণ্য বাক্যই যখন মন্ত্রী মহোদয়ের কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে পুনরায় কর্ণগোচর হইল, আমাদের শরীর যেন পুলকে ময়ূরের মতো পেখম ছড়াইতে চাহিল। মন্ত্রী কহিলেন চলচ্চিত্রে আর্ট ফিল্ম এবং কর্মাশিয়াল ফিল্ম ভেদাভেদটা মিথ্যা। আসল ভাগাভাগিটা হইল ভালো ফিল্ম এবং মন্দ ফিল্মের। মন্ত্রী কহিলেন, আকাশযানে কলিকাতা আসিবার প্রাক্কালে জনৈক সহযাত্রী তাঁহাকে বলিয়াছেন, আর্ট ফিল্ম এবং কমার্শিয়াল ফিল্মে কোনো প্রভেদ নাই। কমার্শিয়াল ফিল্ম অর্থ উপার্জন করে সেক্স এবং ভায়োলেন্স বিক্রয় করিয়া। আর্ট ফিল্ম অর্থোপার্জন করে দারিদ্র বিক্রয় করিয়া। বহু শ্রবণে জীর্ণ এই ছেঁদো মন্তব্যও যে-মুহূর্তে মন্ত্রী মহোদয়ের মুখে উচ্চারিত হইল, বাক্যের গায়ে মাংস লাগিল, বাক্য ব্যাঘ্রের আকার পাইল। এবং আমরা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলাম। সত্যই অভিভূত হইবার মতো ব্যাখ্যা বটে! ইহার পর হয়তো ইত্যাকার ব্যাখ্যাও শুনিতে হইবে যে, 'শান', 'বার্নিং ট্রেন', লাওয়ারিস', 'কালাপাথর', 'বরসাত কী একরাত' জাতীয় ছবির পরিচালকদের সহিত বার্গম্যান, সত্যজিৎ, ফেলিনি, আন্তোনিয়নি, ভাইদা, কুবরিকের কোনো পার্থক্য নাই। কারণ একপক্ষ যখন মানুষকে জীবন ও সময়ের সত্যাসংক্রান্ত সমস্যার মুখোমুখি উপস্থিত করিতে উৎসাহী, অপরপক্ষ তখন মানুষকে জীবন ও সময়ের সদর দরজা হইতে খিড়কি দরজায়

টানিয়া আনিয়া পূতিগন্ধময় আবর্জনারাশির মধ্যস্থলে নিমজ্জিত করিতে উদ্যোগী। অতএত ইহাতে কী তর্কাতীতরূপে প্রমাণিত হইল না যে উভয়পক্ষই জীবন ও সময়ের সহিত সম্পৃক্ত?

মন্ত্রী মহোদয় আরো কহিলেন যে, লোক বলে যে-ছবি চিত্রগৃহে দর্শক আকর্ষণে অক্ষম, তাহাই আর্ট ফিল্মরূপে আখ্যাত হয়। এ বিষয়ে মন্ত্রী মহোদয়ের নিজস্ব মত কী তাহা স্বতন্ত্র করিয়া জানা যাইল না। এইরূপ ব্যাখ্যা শুনিতে শুনিতে নষ্ট নাসপাতির মতো পচিয়া গিয়াছে। তথাপি যে শ্রুতিমধুর মনে হইল, তাহার একমাত্র কারণ বক্তা ভারতরাষ্ট্রের সংস্কৃতির ধারক-বাহক, এবং প্রতিপালক। কোনো কোনো অপরিণত অথবা অপোগণ্ড মস্তিষ্ক হয়তো এক্ষেত্রে প্রতিবাদ উত্থাপন করিতে চাহিবে। তাহারা বলিবে রাজ কাপুরের 'সত্যম শিবম সুন্দরম', দেব আনন্দের 'ইস্‌ক্ ইস্‌ক্ ইস্‌ক্', সিপ্পীদের 'শান,' চোপরার 'বার্নিং ট্রেন', অথবা কোটি কোটি টাকার অপব্যয়ে অজস্র চিত্রতারকা খচিত যে-সব ছায়াছবি ব্যবসায়িক সাফল্যের মাপকাঠিতে চূড়ান্তরূপে ব্যর্থ, কে কবে এবং কাহারা ঐ সব ছবিগুলিকে আর্ট ফিল্ম আখ্যায় আপ্যায়িত করিয়াছে জানিতে পারি কি? আবার এ ক্ষেত্রে যদি বিশ্ব-চলচ্চিত্রের প্রসঙ্গ পাড়িতে হয়, তাহা হইলে দেখা যাইবে পৃথিবীর অর্ধেক শ্রেষ্ঠ ছবিই জন-সান্নিধ্যের প্রাথমিক স্তরে আর্থিক সাফল্য এবং শিল্প-সাফল্যের শিরোপা অর্জনে অক্ষম। এই জাতীয় অক্ষম ছবির পরিচালকদের তালিকায় আইজেনস্টাইন, বার্গম্যান, অরসন ওয়েলস, বুনুয়েল প্রমুখ আগ্নেয়গিরি-সুলভ প্রতিভাধরদের নাম আসিয়া পড়ে। তাহা হইলে উভয় ধরনের অক্ষমতাকে কী একই শ্রেণীভুক্ত করা হইবে?

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, অন্যের মতো এমন নির্বোধ নই যে মন্ত্রীদের ভাষণ লইয়া তর্ক হাঁকাইব। এক্ষেত্রে শুনিলাম এবং ভুলিলাম নীতি গ্রহণই সবচেয়ে নিরাপদ। সর্বোপরি আমাদের স্মরণে ইহা সর্বদা অলিম্পিক মশালের মতো জ্বালাইয়া রাখা উচিত যে, সর্বোচ্চ পর্যায়ের মন্ত্রীদের পক্ষে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়া একদিকে যেমন অনুচিত অন্যদিকে তেমনি অসম্ভব। কারণ কে বলিতে পারে যে আজ যিনি সংস্কৃতি বিষয়ে ভাষণ দিতেছেন, কাল তাঁহার উপরই, নতুন

করিয়া দপ্তর বিন্যাসের ফলে, আলকাতরা অথবা কেরোসিন অথবা জন্ম নিয়ন্ত্রণের আশু উপযোগিতা সম্বন্ধে ভাষণ দানের গুরুভার চাপিবে না?

॥ ২ ॥

কোনো একটি চলচ্চিত্র উৎসবকে যদি অন্য কোনো অনুষ্ঠানের উপমায় বাঁধিতে হয়, বিবাহাদি উপলক্ষ্যে পঙ্‌ক্তি ভোজের সহিতই উহা সবচেয়ে মানানসই। বিবাহাদির নিমন্ত্রণে খাদ্যবস্তুর বৈচিত্র্য এবং বাহুল্যই আমাদের বিহ্বল করিয়া তোলে সর্বাগ্রে। কাহার পর কি আসিবে, কোন খাদ্য কাহার চেয়ে বেশী সুস্বাদু, কোন্‌টা না খাইলেও ক্ষতি নাই, কোন্‌টা রন্ধন-নৈপুণ্যে স্মৃতি এবং রসনার কাছে চিরস্থায়ী হইবার যোগ্য, এসব বিষয়ে পূর্ব হইতে জানিবার কোনো উপায় থাকে না বলিয়াই, ভ্রমে নিমজ্জন অবশ্যম্ভাবী। চিংড়ীমাছের মালাইকারীটা সম্ভবত ততোধিক উৎকৃষ্ট হইবে না অনুমান করিয়া যিনি রুইমাছের কালিয়ার প্রতি প্রেমিক চিলপুরুষের মতো ঝাঁপাইয়া পড়িলেন, এবং মাছের যৎকিঞ্চিৎ মুখ-গহ্বরে প্রবেশ করাইবার সঙ্গে সঙ্গেই যাহার জিভের বিস্বাদ মুখে অতৃপ্তির আঁকচোরা কাটিল, ঠিক সেই মুহূর্তেই তাহাকে শুনিতে হয় পার্শ্ববর্তী খাদকের কণ্ঠস্বর, মহাশয়! মালাইকারীটা খাইলেন না? ইহা অমৃতবৎ! চলচ্চিত্র উৎসবের সময় আমাদের বিভ্রান্তের জালে জড়াইতে হয় অনেকটা অনুরূপভাবেই।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশে একটি উৎসবের প্রদীপ নিবিবার সঙ্গে সঙ্গেই পরবর্তী উৎসবের জন্য সলতে পাকানো চলিতে থাকে। ভারতবর্ষের চরিত্র ভিন্নরূপ। প্রতি বছরের উৎসব সম্পর্কে কাগজ-পত্রে যে-সব নিন্দা-ধিক্কার ও সমালোচনা প্রকাশিত হয়, সেগুলিকে সামনে রাখিয়া পরবর্তী বৎসরের উৎসব যাহাতে ত্রুটিহীন হইতে পারে সেই দিকে মনঃসংযোগ, এ দেশের উৎসব-অধিকর্তাদের কোষ্ঠিপত্রে কোথাও লিখিত নাই। অর্থবিভাগ প্রতিবছরই ঠিক এক নিয়মে উৎসব শুরুর দুমাস আগে উৎসবের জন্য বরাদ্দ অর্থের উপর মঞ্জুরীর শিলমোহর ছাপাইবেন। ইহার পর শুরু হইবে উৎসব কর্তাদের দুই মাসের দিগ্বিজয়ের খেলা। মাত্র দুই-তিন মাসের দৌড়-ঝাঁপেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদে শূন্য কোঁচড়কে ভরা-মাসের গর্ভের মতো স্ফীতকায় করিয়া তুলিতে পারিবেন এইরূপ

বিশ্বাস নিশ্চয়ই সফলকাম হইতে পারিত, যদি পৃথিবীর অন্যান্য অগ্রগামী দেশ ভারতবর্ষে এই বাৎসরিক উৎসবটিকে চুম্বন আলিঙ্গনের যোগ্য রমণীয় বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিত। বাস্তবক্ষেত্রে ইহার বিপরীতটাই সত্য। তাহার কারণও একাধিক।

ভারতবর্ষ অন্যান্য দেশের ছবি খরিদ করিবার ব্যাপারে অনিচ্ছুক এবং অক্ষম। একমাত্র আমেরিকার ছবিরই এখানে ঢালাও প্রবেশাধিকার। ইদানীং এন এফ ডি-সির উদ্যোগে য়ুরোপীয় দেশগুলির কিছু কিছু ছবি কেনাকাটার সূত্রপাত ঘটিলেও, বিদেশের মনে নিশ্চিত আস্থা স্থাপনের পক্ষে সেটা বৃহৎ কোনো উদ্যম নয়। ছবি নির্বাচন, নির্বাচিত ছবির পরিচালক প্রযোজক এবং শিল্পীদের আমন্ত্রণ জ্ঞাপন, বিদেশের উৎসবে ভারতের অংশগ্রহণ ইত্যাদি জাতীয় যাবতীয় কর্মকাণ্ডের সঙ্গে শ্লথগতি এবং দ্রুততার সহিত সুস্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণের অক্ষমতা এমন অবিচ্ছেদ্যরূপে সম্পৃক্ত যে, বিদেশের কাছে ভারতীয় চলচ্চিত্র উৎসব এখনো শ্রদ্ধা-সম্মানের স্তরে উত্তীর্ণ হইবার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত রহিয়া গেল। ফলে প্রতি বছরই উৎসবের সময় বিদেশের দরবারে হাত পাতিয়া যাহা সংগ্রহ করিতে হয় তাহা ভিক্ষার চাল কাড়া-আকাড়ার মতোই পাঁচমিশেলী এবং চরিত্রহীন। ভারতবর্ষ ঝুলি পাতিলেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাম্প্রতিক ছবিগুলি সেখানে ঝপাত্ ঝপাত্ করিয়া আছড়াইয়া পড়িবে ইহা অবশ্যই দুরাশার অথবা দিবাস্বপ্নের নামান্তর।

হয়তো পৃথিবীর যে কোনো দেশের পক্ষেই এ-জাতীয় আকাঙ্ক্ষার অচরিতার্থ হইতে বাধ্য। বিরতিহীনরূপে তৎপর থাকিলে ব্যতিক্রম ঘটিয়া যাওয়া অসম্ভব হইত না। ছবি নির্বাচনের ব্যাপারে ঝাড়াই-বাছাই এবং একটা নির্দিষ্ট নীতিরও প্রয়োগ ঘটাইবার সুযোগ মিলিত। তাঁর একটি সাম্প্রতিক রচনায় শ্যাম বেনেগাল যথার্থই ব্যক্ত করিয়াছেন নিজের অভিজ্ঞতাজাত ক্ষোভ। লিখিয়াছেন কোথা হইতে কী চাই—ইহার বদলে কোথা হইতে কী পাওয়া যাইবে ইহাই আমাদের সরকারী নীতি। সমস্ত কর্মোদ্যমের পিছনে শম্বুকগতির পরিণামেই উৎসবের জন্যে নির্বাচিত ছবিগুলি কর্তৃপক্ষের হাতের আওতায় এমন সময়ে আসিয়া উপস্থিত হয় যখন সে-সব ছবি সম্বন্ধে দর্শককে অগ্রিম কোনো সংবাদ পৌঁছাইয়া দেওয়া অসম্ভব। আর এই কারণেই প্রভূত অর্থব্যয় করিয়া, মূল্যবান আর্ট

পেপারে মুদ্রিত করিয়া উৎসব উপলক্ষে যে চিত্র-তালিকা প্রকাশিত হয়, সেখানে চিত্র সম্পর্কিত সমাচার আকারে এমনই ক্ষুদ্র এবং তথ্য সরবরাহে এমনই কৃপণ যে, তাহাকে শৌখীন একটি স্যুভেনির-এর চেয়ে বেশী মর্যাদা আরোপ করা অসাধ্য। তাহা না লাগে যজ্ঞে, না হোমে। অথচ সংবাদ এইরূপ যে, একই উপলক্ষে বিদেশের এ-জাতীয় স্মারকগ্রন্থগুলি তথ্য সম্ভারে অতিরিক্ত পরিমাণে সমৃদ্ধ।

এক্ষেত্রে একটি দৃষ্টান্ত আমাদের সুপরিজ্ঞাত। জ˜ পিয়ের ব্রোসার্ড ছিলেন গত চার বৎসর যাবৎ লোকার্নো ফিল্মোৎসবের ডাইরেকটর। বর্তমানে সে-পদে না থাকিলেও, তিনি এখন ইণ্টারন্যাশনাল ফেডারেশন্ অফ ফিলম সোসাইটির জেনারেল সেক্রেটারী পদে সমাসীন। ঋত্বিককুমার ঘটক নির্মিত চলচ্চিত্রের একটি 'রেট্রসপেকটিভ' ফ্রান্সে এবং সুইজারল্যাণ্ডে উদ্‌যাপিত করিবার জন্য তিনি গত বৎসর হইতে অক্লান্তরূপে উদ্যোগী। কিন্তু এই উপলক্ষে শুধু চিত্র সংগ্রহই তাঁর একমাত্র কার্যক্রম নয়। ঋত্বিক কুমার সম্পর্কে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনাও তাঁর সমগ্র পরিকল্পনার অংশ। কর্মসূত্রে ঋত্বিককুমারের সহিত যুক্ত শিল্পী কলাকুশলীদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার ছাড়াও এই উপলক্ষে তিনি সংগ্রহ করিয়া চলিয়াছেন ঋত্বিককুমার সম্পর্কিত যাবতীয় রচনা।

কলিকাতায় এবারের উৎসবে 'রেট্রসপেকটিভের' আয়োজন হইয়াছিল তিনজন পরিচালকের সৃষ্টি অবলম্বনে। ফ্রান্সের গদার আমাদের কাছে কিছুটা পরিচিত। বাকী দুজনের একজন তুরস্কের ইলমাজ গুনে, অন্যজন হাঙ্গেরীর জাঙ্কসো, যাঁদের চিত্রধারার সঙ্গে বাঙালী দর্শকের আত্মীয়তা তেমন ঘনিষ্ঠ নয়। গদারের তিন-চারটি ছবির সঙ্গে আমাদের পূর্ব পরিচয় থাকিলেও, তিনি যে সহজে বুঝিবার নন, তাঁহাকে মোটামুটি বুঝিতে হইলেও মগজের পক্ষে কী ধরনের ডন-বৈঠক প্রয়োজন তাহা নতুন করিয়া বলিবার অপেক্ষা রাখে না। জাঙ্কসোর সম্পর্কেও একই কথা। প্রচুর টীকা টিপ্পনী ও ফুটনোট গলাধঃকরণ ব্যতিরেকে এই জাতীয় পরিচালকদের রচনার সম্মুখবর্তী হওয়ার পরিণাম আদৌ সুখকর নয়। জনসাধারণকে শুধুমাত্র ছবিগুলি না দেখাইয়া, ছবিগুলিকে সম্যক উপলব্ধির উপযোগী একটি পুস্তিকা প্রণয়ণ করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করিলে উৎসব কর্তৃপক্ষ শুধু দেশবাসীর সাধুবাদ কুড়াইতেন না, দেশবাসীর চলচ্চিত্র সংক্রান্ত ভাবনাচিন্তার

মানোন্নয়নে, চারা গাছে জল সিঞ্চনের মতো, একটি মহৎ কর্মও সাধিত করিতেন।

চলচ্চিত্র উৎসবে বিদেশের দরবারে নিজের দেশের ছবিকে পৌঁছাইয়া দেওয়ার প্রধান একটি খোলা দরজার নাম—ফিল্ম মার্কেট। অথচ প্রতি উৎসবে সবচেয়ে অনাদৃত, অবহেলিত থাকাটাই যেন ঐ মার্কেটের ললাট-লিখন। বিদেশাগত প্রতিনিধিদের গরহাজিরা সবচেয়ে প্রকট যেন সেইখানেই। উৎসব উপলক্ষে আমরা যদি বা কিছু সংখ্যক বিদেশী পরিচালক অথবা সমালোচককে আমন্ত্রণ করিয়া ডাকিয়া আনি, বিদেশের ডিস্ট্রিবিউটরদের বেলায় কর্তৃপক্ষের চোখ অন্ধ, কর্ণ বধির। অথচ আমরা জানি পৃথিবীর অন্য যে-কোনো দেশে চলচ্চিত্রের বেচা-কেনাটা উৎসবের একটা প্রধানতম উদ্দেশ্য ও অঙ্গ। আমাদের দেশে ফিল্ম-মার্কেট নামে স্বতন্ত্র একটা বিভাগ যদিও বা খোলা হইয়া থাকে, সেখানে দক্ষিণ ভারতের প্রতিপত্তি এবং খবরদারীর মাত্রাটা এমনই প্রবল এবং একচ্ছত্রময় যে, অন্যের পক্ষে সেখানে অনুপ্রবেশ করার ইচ্ছাটাই যেন অপরাধজনক।

"গত বছর ভারতে প্রায় সাড়ে সাত শো ছবি তৈরী হয়েছে। তার মধ্যে প্রায় সাড়ে চারশো দক্ষিণ ভারতের। দক্ষিণ ভারত সেই সুবাদে সিনেমার নেতৃত্ব চাইছে। যে মুষ্টিমেয় ছবি নিয়ে মালয়ালম, তামিল, তেলেগু, কনড় চলচ্চিত্র সাংস্কৃতিক উদ্যোগের গর্ব—সেই সব ছবিগুলোকে শিখণ্ডীর মতো সামনে দাঁড় করিয়ে ব্যবসাবন্দিত অপসংস্কৃতির বাহক যে-সিনেমা—সেই সিনেমা দিন দিন বেড়েই চলেছে।" উপরিউক্ত মন্তব্য পরিচালক শ্যাম বেনেগালের। দক্ষিণ ভারত এখন অপসংস্কৃতিপ্রধাণ চিত্রনির্মাণে বোম্বাইকে টেক্কা মারিতে চলিয়াছে। অনান্যবারের উৎসবের মতো এবারের উৎসবের ফিল্ম মার্কেটে ঐ জাতীয় ছবির প্রদর্শনীর জন্যই উদ্যোক্তারা উৎসাহে ফুলন্ত বেলুন। ভারতীয় সংস্কৃতি অথবা ভারতীয় চলচ্চিত্রের মান-মর্য্যাদার উন্নয়নের অপেক্ষা, বিদেশের হাটে-বাজারে এই জাতীয় পচা মাছ বিক্রয় করিয়া নিজেদের লাভের কড়ি গুনিবার জন্যই যেন তাহারা অধিকতর লালায়িত। এ বৎসর মিনি-মার্কেট-এর আসর বসিয়েছিল গোর্কী সদনে। এই উপলক্ষে সেখানে যে মাৎস্যন্যায় সংঘটিত, তার কিছু বিবরণ সংবাদপত্রে ইতিমধ্যে প্রচারিত বলিয়াই আমরা পুনরা-

বৃত্তিতে অনিচ্ছুক।

পৃথিবীর সর্বাধুনিক চলচ্চিত্র আন্দোলনের একটি রূপরেখা আমাদের সামনে তুলিয়া ধরাটাই চলচ্চিত্র উৎসবের প্রধানতম দায়। এই দায়কে সুসম্পূর্ণ করিতে হইলে তৃতীয় বিশ্বের চিত্রগুচ্ছের অন্তর্ভুক্তিটা অনিবার্য। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের ভাষণে যে পরিমাণ দরদ, কাগজে যে পরিমাণ প্রচার, কর্মে তাহার অর্ধেকও অনুপস্থিত। যদিও-বা তৃতীয় বিশ্বের এদিক-সেদিক হইতে ছুটকো-ছাটকা কিছু ছবি হাজিরা খাতায় নাম লেখাইতে আসে, যথাযথ পরিচয় পাইবার পর বুঝিতে পারা যায়, তাহার অধিকাংশই দু-নম্বরী। অন্যদিকে ছবির যদিও-বা ডাক পড়ে, তৃতীয় বিশ্বের পরিচালক বা সমালোচকের রূঢ় অস্তিত্ব সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষ যেন সচেতনভাবেই উদাসীন। এই প্রসঙ্গে ভারতের জনৈকা মহিলা-সমালোচকের রূঢ় মন্তব্য, "টু ম্যাচ ইমপর্টেন্স হ্যাজ বিন গিভেন টু অ্যাংলো-স্যাকসন কানট্রিজ। অ্যাণ্ড দা সেম ডেলিগেটস আর ইনভাইটেড অ্যাণ্ড কমিটেড ইয়ার ইন অ্যাণ্ড ইয়ার আউট।" তৃতীয় বিশ্বের চিত্র-সমালোচকদের উজ্জ্বল অনুপস্থিতিকে স্মরণে রেখেই তিনি ক্ষুব্ধ।

পাঠককে বলিয়াছিলাম বিষবৃক্ষের নগেন্দ্রের সহিত আর এ-রচনার কোনো সম্পর্ক নাই। কিন্তু দেখিয়া-শুনিয়া হঠাৎ আবার নগেন্দ্রকে স্মরণ করিতে সাধ জাগিল।

সদ্য যৌবন-প্রাপ্তা কুন্দনন্দিনীকে ভালোবাসিয়া নগেন্দ্রর নির্মল চরিত্র হঠাৎ মেঘাবৃত হইতে শুরু করিয়াছে। তিনি মদ্যপানে অভ্যস্ত হইয়াছেন। তাঁহার শরীর হইতে উজ্জ্বলতা ঝরিয়া পড়িতেছে। ঔষধ সেবনেও তাঁহার অরুচি। একদিন সূর্যমুখী বলিলেন।

—ঔষধ না খাও—তোমার কি অসুখ আমাকে বল।

নগেন্দ্রের বিরক্ত উত্তর

—কি অসুখ?

সূর্যমুখী বলিলেন

—তোমার শরীর দেখ দেখি কি হইয়াছে?

এই বলিয়া সূর্যমুখী একখানি দর্পণ আনিয়া নিকটে ধরিলেন। নগেন্দ্র তাঁহার হাত হইতে দর্পণ লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন। দর্পণ চূর্ণ হইল।

উৎসব কর্তৃপক্ষও নগেন্দ্রের মতো নিজের অসুখ সম্বন্ধে অচেতন জানিয়া আমরা তাহাদের ভগ্নস্বাস্থ্যের সম্মুখে দর্পণ তুলিয়া ধরিতেছি। সন্দেহ হয়, ইহাও চূর্ণ হইবে।

॥ ৩ ॥

এবারের উৎসব প্রসঙ্গে এক্ষণে আমরা অন্য একটি গুরুতর বিষয় সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। ইহার নাম সেমিনার। সেমিনার কাহাকে বলে তাহা পাঠকের অজ্ঞাত থাকার কথা নয়। কারণ প্রত্যহ এই বাক্যটি জলে-স্থলে উচ্চারিত। বিবিধ বিদ্বান বক্তারা যেখানে উৎকৃষ্ট বাক্যের হরিলুট দিয়ে থাকেন এবং সাধারণে তৎক্ষণাৎ ভুলিবার জন্য মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া শোনেন, সংক্ষেপে তাহাই সেমিনার। ইদানীং রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ের কপালেই এয়োতির সিঁদুর টিপের মতো সেমিনার অপরিহার্যরূপে বিদ্যমান।

এবারের চলচ্চিত্র উৎসবে সেমিনারের বিষয় ছিল, 'সিনেমা ২০০০'। অর্থাৎ মাত্র আঠারো বৎসর পরে যে নূতন শতাব্দী আসন্ন, তাহাতে বিশ্ব-চলচ্চিত্রের আকৃতি-প্রকৃতি অথবা চলন-বলন কিরূপ হইবে তাহা লইয়াই বিশেষজ্ঞদের গবেষণা। বিষয়টি যাহার উর্বর মস্তক হইতে ভূমিষ্ঠ, তাহাকে শতকোটি নমস্কার জানাইতে হয়। আমরা, সাধারণ মানুষেরা, চোখের সম্মুখে যে বাস্তব অবস্থা, সর্বদা তাহা লইয়াই চিন্তিত থাকিতে অভ্যস্ত। যেমন আমাদের এই কলিকাতা নগরীতে স্বাস্থ্যবান স্টুডিওর একান্ত অভাব। আমরা স্টুডিও-র চিন্তায় বিষণ্ণ। যেমন কলিকাতাসহ সমগ্র ভারতবর্ষ এক্ষণে ১৬ মিলিমিটার ফিল্মে শুটিং করিয়া তাহা ৩৫ মিলিমিটারে 'ব্লো-আপ' করিয়া চিত্রনির্মাণের খরচ কমাইবার আন্দোলনে নামিয়াছে। অথচ সমগ্র ভারতবর্ষে ঐ কাজ করিবার যোগ্য ল্যাবরেটরীর সংখ্যা একটি-দুটির বেশী নয়। আমরা ঐ জাতীয় ল্যাবরেটরীর চিন্তায় বিষণ্ণ। আমাদের দেশে সুস্থ-সবল চলচ্চিত্র নির্মাণ তরুণ চিত্রপরিচালকদের নেতৃত্বে দানা বাঁধিয়া উঠিলেও, ঐসব চিত্রকে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিদানের সমস্যা গুরুতর। আমরা চিত্রগৃহের সমস্যায় দিশাহীন। আমরা আকাঙ্ক্ষা করি, আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে প্রতি বৎসর ভারতবর্ষের বিভিন্ন আঞ্চলিক চলচ্চিত্রেরও একটি উৎসব শুরু হওয়া একান্ত

জরুরী। সরকারী উদ্যোগে আঞ্চলিক ছবিগুলির গায়ে ইংরাজী সাবটাইটেল জুড়িয়া দেওয়ার একটি স্থায়ী পরিকল্পনার প্রতিও আমরা আগ্রহী। ইহাতে শুধু যে প্রদেশে প্রদেশে সাংস্কৃতিক ভাবনা-চিন্তার আদন প্রদান ঘটিয়া পরস্পরকে সমৃদ্ধ করিবে তাহাই নয়, ইহা আঞ্চলিক ছবিগুলির অর্থো-পার্জনেরও একটি প্রশস্ত পথ। আমরা আঞ্চলিক ছবির এই ব্যাপ্তির বিষয়ে চিন্তিত।

আমাদের ললাটে চিন্তার রেখা আরও অজস্র। এদেশে অর্থাৎ ভারতবর্ষে চলচ্চিত্র নির্মাণের উপযোগী আধুনিক যন্ত্রপাতির একান্তই অভাব। ভারতবর্ষে তৈরী ছবি যখন বিদেশের বাজারে বিক্রীর জন্য পাঠনো হয়, অনেক সময় নির্বাচিত ছবি খরিদ্দার কিনিতে অসম্মত হয় অনুৎকৃষ্ট প্রিন্টের জন্য। দিল্লী হইতে বার্লিন, কান, অথবা ভেনিসের উৎসবে ছবি পৌছিতে অনেক সময়ই দশ দিনের পরিবর্তে দশ মাশ লাগিয়া যায়। স্বদেশে ছবির 'সাবটাইটেল' করানো একপ্রকার অসম্ভব বলিয়াই আমাদের দেশের ছবিগুলিকে পাঠাইতে হয় সুদূর ব্রাসেল্সে। তাহা যে যথাসময়ে উৎসব কমিটির হাতে আসিয়া পৌছে না এবং না-পৌছানোর ফলে চিত্রগৃহে তাণ্ডব উৎপাদিত হয়, তাহাও আমাদের অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত।

এবংবিধ আরও বহু বিষয়েই ভারতবর্ষ যখন চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে পশ্চাদগামী, তখন এবারের সেমিনারের আলোচ্য বিষয়টির দিকে তাকাইলে মনে না হইয়া উপায় নাই যে ইহা এক ধরনের শৌখিনতা। বলা বাহুল্য, এই জাতীয় শৌখিনতার প্রতি যে কলিকাতার এবং কলিকাতায় আগত চলচ্চিত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ কোনোরূপ আগ্রহ-উৎসাহ দেখান নাই, গর্কী সদনের শূন্য চেয়ারগুলিই ছিল তাহার প্রমাণ। আরও পরিতাপের বিষয়, বিদেশাগত যে-সব অতিথি সমালোচক ঐ সেমিনারে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন, অথবা শ্রোতা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তাঁহারাও যে আলোচ্য বিষয়টি সম্বন্ধে কী ধরণের অনুৎসাহী তাহার প্রমাণও বিভিন্ন সংবাদ-পত্রের মাধ্যমে প্রচারিত। নিম্নে তাহারই কয়েকটি নিদর্শন।

সার্জ দানে। ফরসী 'কাহিয়ের দু সিনেমা'র চিত্রসমালোচক। তাঁর মন্তব্য—এই সিম্পোজিয়াম সময়ের অনর্থক অপব্যয়। এর চেয়ে ঢের ভালো ছিল কিছু ভালো ছবি, অথবা শহরের রাস্তায় ঘুরে মানুষ কী ভাবে বেঁচে আছে দেখে নেওয়া। এখানে লোকে এমনভাবে অনর্গল

বকে চলেছে যেন সিনেমা অনন্তকাল ধরে টিকে থাকবে, যেখানে সিনেমা ইতিমধ্যেই একটা মৃত মাধ্যম। ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও 'পিওর সিনেমা' বেঁচে নেই।

ডেরেক ম্যালকম। লণ্ডনের 'গার্ডিয়ান'-এর সমালোচক। মূল বক্তব্য —আঠারো বছরের পরে কিছুই বদলাবে না। আমরা যেভাবে সিনেমা দেখি সেটা হয়তো বদলাতে পারে। কিন্তু দু' হাজার সালে কি ধরণের ছবি দেখবো সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ প্রশ্ন। টেকনোলজির ভাবনা এখানে অবান্তর। 'ইট হ্যাজ অলওয়েজ বিন এ মিসটেক টু থিংক দ্যাট ওনলি বাই এপিং দা ওয়েস্ট ক্যান ইণ্ডিয়ান ফিল্ম-মেকারস কংকার ইট। ওয়েস্টার্ন টেকনোলজি ইজ, অফ কোর্স, ইমপট্যাণ্ট, উডনট ইট বি নাইস ইফ উই ক্যুড অ্যাকচুয়েলি রিড দা সাব-টাইটেলস অন ইণ্ডিয়ান ফিল্মস অর ডিসকভার এ পারফেকট প্রিণ্ট অফ এভরি ফিল্ম বাই ঘটক, রে, সেন অ্যাণ্ড দা লাইক। হোয়াট দা আউটসাইড ওয়াল্ড ওয়াণ্টস টু সি ফ্রম ইণ্ডিয়ান ফিল্মস ইজ এ কনফিডেন্স ইন ইণ্ডিয়ান সোস্যাল কালচার দ্যাট ইজ টু অফন্ ল্যাকিং।"

প্যাট্রিসিয়া মোরাজ। নিজে সুইজারল্যাণ্ডের চিত্রপরিচালিকা। এবারের উৎসবে তাঁর যে অসামান্য ছবিটির সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় হয়েছে আমাদের তার নাম 'লস্ট ওয়ে।' তিনি জানাচ্ছেন—ভিডিও-র উপদ্রবে সিনেমার ক্ষতি হবে, এমন দুঃস্বপ্ন অহেতুক! শিল্পীরা চিরকালই যন্ত্রকে নিজের কাজে কী ভাবে পোষ মানাতে হয় জানে। 'দেয়ার ইজ অলওয়েজ দা ডেন্জার অফ দা টেকনোলজি ক্রাসিং সেনজিটিভিটি। বাট আই থিংক অথেনটিক ক্রিয়েটারস উইল সারভাইস দা চেঞ্জ।'

সেমিনারের কোনো কোনো বক্তা আশা করিয়াছেন যে দু-হাজার সালে পৃথিবীর চলচ্চিত্র ক্রমশই জমকালো হইবার দিকে ঝুঁকিবে। কিন্তু সিনেমা নামক জনপ্রিয় মাধ্যমটি যে ক্রমশই যথার্থ অর্থে জনগণের মাধ্যম হইয়া উঠিতে পারে, তাহার উল্লেখ কোনো বক্তার মুখেই উচ্চারিত হয় নাই। কক্‌তো একদা বলিয়াছিলেন যে, যেদিন লোকে ফাউণ্টেন-পেনের বদলে ক্যামেরা ব্যবহার করিবে সেইদিনই চলচ্চিত্র মাধ্যমের সার্থকতা। ভারতবর্ষে ক্রমাগত নতুন পরিচালকের আবির্ভাব এবং সার্থকতাকে লক্ষ্য করিয়া আমরা এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইতে পারি যে,

পরবর্তী শতকে আমাদের দেশে চলচ্চিত্রের ভূমিকা এবং চলচ্চিত্রকারের আবির্ভাব আরও ব্যাপ্ত হইবে।

'ইকনামিক টাইমস'-এর প্রতিবেদক এই সেমিনার উপলক্ষে অন্য একটি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। সেমিনারে অংশগ্রহণকারী সকল ব্যক্তিরই বয়স ছিল ৬০-এর কাছাকাছি। এখানে কোনো তরুণ পরিচালক অথবা সমালোচককে আহ্বান জানানো উচিত ছিল—'হুজ ভিউস মাইট স্টিল হ্যাভ রেলেভেন্স ইন দা নেকস্ট সেঞ্চুরী।'

এ বৎসরের সেমিনার হইতেই আশা করি কর্তৃপক্ষ এই শিক্ষালাভ করিবেন যে, আলোচ্য বিষয়ের নামটি শ্রবণে গালভারী হইলেই বিষয়টি গুরুত্বে মর্যাদাবান হইয়া উঠে না। এবং ভবিষ্যতে সেমিনারের বিষয় নির্বাচনের দায়িত্ব পড়িবে এমন ব্যক্তিদের উপর, চলচ্চিত্র-নির্মাণই যাঁহাদের দিনের সদিচ্ছা, রাত্রির স্বপ্ন, সারা বৎসরের চিন্তা এবং সারা জীবনের ধ্যান।

॥ ৪ ॥

এবারের কলিকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের প্রতীক চিহ্নটি কোন্ শিল্পী আঁকিয়াছে আমরা জানি না। প্রথম দৃষ্টিপাতের সময় আমরা ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিলাম বটে, কিন্তু পরবর্তী চিন্তায় ইহার আসল অর্থ বুঝিয়া উঠিবার পর শিল্পীকে মনে মনে অজস্র ধন্যবাদ জানাইতে বাধ্য হইয়াছি। আসল অর্থটি এইরূপ—এই বৎসর হইতেই ফিল্ম-ডাইরেকটরেট বিভাগটি এন এফ ডি সি-র অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। সুতরাং এন এফ ডি সি-র দায়-দায়িত্ব অনেক পরিমাণে বর্ধিত হইয়াছে। তাহার পক্ষে শুধুমাত্র দুইটি ঈশ্বরদত্ত চক্ষু লইয়া কাজ করা সুকঠিন। তৃতীয় নয়ন অবশ্যই অত্যাবশ্যক।

তৃতীয় নয়ন অত্যাবশ্যক অন্য একটি কারণেও। এই ১৯৮২ হইতে ম্যানিলা-য় উদ্বোধন ঘটিল অন্য এক আন্তর্জাতিক উৎসবের। আরও আশ্চর্য, ভারতবর্ষে যেদিন উৎসবের শেষ তাহার ঠিক পরদিন হইতেই এই নবীন উৎসবের জয়যাত্রা। ম্যানিলা ভারতবর্ষ নয়। তাহাকে পিছন হইতে মদত দিবার জন্য অর্থবান একটি ধনকুবের দেশ উৎসাহী। তাই ম্যানিলায় যাহা ঘটিতে চলিয়াছে, ভারতবর্ষের কাছে তাহা

দিবাস্বপ্ন। তাহারা পাইতেছে পৃথিবীর সেরা পরিচালকদের সর্বাধুনিক ছবি। তাহারা প্রতিযোগিতা বিভাগে নির্বাচিত ছবির পরিচালক, প্রযোজক, এবং ছবির প্রধান অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কাছে আমন্ত্রণলিপির সঙ্গে গাঁথিয়া দিয়াছে ঢালাও এয়ার-প্যাসেজ। এমনকি ইনফরমেশন বিভাগের ছবির বেলাতেও এয়ার প্যাসেজ পাঠাইয়াছেন পরিচালক এবং শিল্পীদের জন্য। শুধুমাত্র ম্যুনিখ হইতেই সেখানে সমবেত হইতেছেন ৪০ জন 'ফিল্ম-পিপল'। তাঁহারা এয়ার প্যাসেজ সহযোগে আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন পৃথিবীর ৪০০ জন নামজাদা ফিল্ম-ডিষ্ট্রিবিউটারকে। অর্থাৎ ম্যানিলার চলচ্চিত্র উৎসব এক মহাযজ্ঞ। আগামী বৎসর ভারতবর্ষকে মুখোমুখি হইতে হইবে ম্যানিলার সহিত চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায়। কর্তৃপক্ষকে এইবার হাড়ে-মাসে অনুভব করিতে হইবে যে অন্যান্যবারের মতো বৎসরের আট-দশ মাস নিশ্চিন্তে নিদ্রাযাপন করিয়া, 'এবং হঠাৎ এক সময় জাগিয়া উঠিয়া কর্মোন্মদনাকে রানা প্রতাপের চৈতকের মতো ছুটাইলেই কোনো সাফল্যের সম্ভাবনা নাই।

যে প্রতীক চিহ্নটি এবারের কলকাতা উৎসবের জন্য নির্মিত, তাহাকে এন্ এফ ডি সি-র স্থায়ী প্রতীক অথবা 'লোগো' রূপে গ্রহণ করিলে অনুমান করা যাইতে পারে, কর্তৃপক্ষ দেবী দুর্গার মতোই দশ হাতে কাজ করিবার প্রেরণা পাইবেন। পরিণামে আমরাও ব্যুরোক্র্যাসীর বন্ধনমুক্ত সহজ সাবলীল এবং সর্বাঙ্গসুন্দর চলচ্চিত্র-উৎসবের অংশীদার হইবার সৌভাগ্য অর্জন করিব।

॥ ৫ ॥

ম্যাজিক লণ্ঠন হইতে যাহার জন্ম, এখন, যৌবনোদ্‌গমের পর, সেই চলচ্চিত্র নিজেই ম্যাজিক। তাহাকে এখন অনায়াসে মহাকল্পতরু বলিয়া ভাবিতে পারি। যথাযথ প্রার্থনা করিতে জানিলে, তাহার নিকট হইতে এমন সব হৈমকান্তি অমৃত ফল পাওয়া সম্ভব, যাহার প্রত্যেকটিই স্বাদে গন্ধে, আঙ্গিকে, উপকরণে, বোধে, ব্যাপ্তিতে একে অপরের চেয়ে স্বতন্ত্র এবং সকলেই নিজ নিজ জ্যোতিতে সম্ভ্রান্ত। কোনো একটি বিশেষ কাহিনীর বিশেষ প্রকাশভঙ্গীতে মুগ্ধ হইবার পর মুহূর্তেই ভিন্ন এক কাহিনী যখন ভিন্নতর প্রকাশভঙ্গীর প্রতিভা-দীপ্তিতে আমাদের সামনে

আসিয়া পড়ে, আমাদের চৈতন্যে ঝলসাইয়া ওঠে বিস্ময়ের বিদ্যুৎ। চলচ্চিত্রের এই যাদুকরী ক্ষমতার বিষয়ে আমরা পূর্বেই সচেতন ছিলাম। তবে ফিল্মোৎসব '৮২ আমাদের পূর্ব ধারণার কাঠামোর পিছনে এক নূতন চিত্রিত চালচিত্র স্থাপন করিল। বুঝিলাম নিজেকে নানারূপে ব্যক্ত করিবার ক্ষমতায় ইহা শিল্পের অন্যান্য মাধ্যমগুলিকে দ্রুত অতিক্রম করিয়া যাইবে। এই সুখদ মুহূর্তে ফরাসী দেশের সেই উদ্দাম ও উদ্যমী কবির স্মৃতি মনে পড়িতেছে, প্রায় সদ্যোজাত এই মাধ্যমটির অনির্বাচনীয় তাৎপর্য ও উপযোগিতা প্রসঙ্গে যিনি ভবিষ্যদ্বাণীতুল্য ভাবনায় উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন সমকালীন বুদ্ধিজীবীদের। হ্যাঁ, অপোলিনেয়ারই পৃথিবীর সেই প্রথম কবি। মহৎ কবিদের ভবিষ্যৎ কথন যে কদাচিৎ ব্যর্থ হয়, চলচ্চিত্রের বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠা, তাহার নিয়ত উন্মীলন ও বিস্ফোরণ, নিত্য নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার আগুনে নিজেকে শুদ্ধ করিবার ক্লান্তিহীন প্রয়াস এবং সর্বোপরি তাহার ক্রমাগত জনপ্রিয়তার দৃষ্টান্তে, তাহা স্বতই প্রমাণিত।

ফিল্মোৎসব '৮২ আমদের নিকট উপস্থিত করিয়াছিল মোট ১৪৮ টি চলচ্চিত্র। ইহার মধ্যে ভারতীয় ছবির সংখ্যা ৩৮। বাকী সমস্ত বিদেশের। বিদেশের ছবিগুলিও তিন ভাগে বিভক্ত। উৎসবের সাধারণ বিভাগের ছবি। রেট্রসপেকটিভের ছবি। এবং ১৬ এম-এর ছবি। এখন আমরা কেবলমাত্র 'রেট্রসপেকটিভ' চিত্রমালার দিকে মনঃসংযোগ করিব। এবং প্রথমেই আমাদের শ্রদ্ধার কুসুম গুচ্ছটি অর্পণ করিব তুর্কী পরিচালক ইলমাজ গুনে-র প্রতি।

গুনে নিজ বাসভূমে পরবাসী এবং পলাতক। এই মুহূর্তে তিনি স্বদেশের কারাগারে অথবা লাতিন আমেরিকার কোনো দুর্গম বন্দরে, তাহা আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। তবে উৎসব উপলক্ষে কলিকাতা-বাসীকে পাঠানো তাঁহার অভিনন্দনপত্র আমরা দেখিয়াছি। তাহার জন্য অকুণ্ঠ ধন্যবাদ। এবারের উৎসবে তিনি আমাদের পক্ষে সত্যই এক অপ্রত্যাশিত এবং অবিস্মরণীয় আবিষ্কার। রেট্রসপেকটিভের তিন জন পরিচালকের মধ্যে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে অপরিচিত। উৎসবে আমরা তাঁর নামাঙ্কিত মোট চারটি ছবি দেখিলেও, তিনি নিজে পরিচালক মাত্র দুইটির। হোপ এবং এলিজি। বাকি দুইটির, হার্ড এবং এনিমি-র পরিচালক নেকি ওকতেন। কাহিনী এবং চিত্রনাট্য গুনে-র। নির্দয়

সারল্যই গুনে-র ছবির মাহাত্ম্য এবং মহত্ব। তাঁহার রচনা সমান্তরাল সরলরেখা নয়। বরং কয়েকটি সরল রেখার সমন্বয়ে তিনি গড়িয়া তোলেন এমন একটি চতুষ্কোণ, যাহাতে চলচ্চিত্রায়ণের জন্য নির্বাচিত জীবন অথবা সময় নানা দিক হইতে অনুধাবনের যোগ্য হইয়া ওঠে। গুনে-র ছবিতে যেন আমাদের নক্‌শি কাঁথার আদল। কাহিনী নামক গোলাকার শতদলটি কেন্দ্রে। তাহাকে ঘিরিয়া চতুর্দিকে উল্কা-চূর্ণের ন্যায় ভ্রমণ করিতেছে পশু-পাখী পুষ্করিণী বৃক্ষলতা—জীবন যাপনের পক্ষে অপরিহার্য নানাবিধ সামগ্রী, মানবিক নানা ভঙ্গী, সামাজিক নানা মুহূর্ত। আপাত-দৃষ্টিতে গুনে-র ছবিকে 'নিও-রিয়ালিজম' গোত্রজাত মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক, বিশেষ করিয়া ১৯৭১-এ 'কান' চলচ্চিত্র উৎসবে ইহা সমাদৃত এবং ইতালীর দে-সিকা রচিত 'বাইসাইকেল থীফস'-এর সহিত তুলনীয় হইবার সূত্রে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহার চরিত্র ভিন্ন। 'টেক দা ক্যামেরা আউট ইনটু দা ষ্ট্রীট'—ইহাই ছিল ইতালীয় নিও-রিয়্যালিজম গোষ্ঠীর মূলমন্ত্র অথবা 'ব্যাটল-ক্রাই'। তাঁহারা ছিলেন ধরা-বাঁধা পূর্বপরিকল্পিত চিত্রনাট্যেরও বিরোধী। কিন্তু গুনে-র চিত্রনাট্য সুপরিকল্পিত। সেখানে ঝাড়াই-বাছাই-এর নিদর্শন সর্বত্র। লং-টেক-এর পরিবর্তে খণ্ড খণ্ড নানা দৃশ্যের সমন্বয়ে মুহূর্তে গঠনও লক্ষণীয়। মানুষের স্বাভাবিক আবেগসমূহের প্রতিও অনুরাগ-বর্জিত নন তিনি। ক্রোধ, কাম, লোভ, লালসা, হিংসা নিষ্ঠুরতার দৃশ্য উন্মোচনে তাঁহার ক্যামেরা মানুষের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের খুবই নিকটবর্তী। অথচ তাঁহার চিত্রমালায় চলচ্চিত্রের সর্বাধুনিক ভাষা যথা ফ্ল্যাশব্যাক, জুমিং, জাম্প্‌ কাট, সুপারইমপোজিশন, ইত্যাদি কোথাও সাদরে আমন্ত্রিত নয়। কোথাও চূড়ান্ত-রূপে আধুনিক বা স্মার্ট হইবার প্রবণতায় প্রলুব্ধ নন তিনি। তাঁহার চিন্তা অথবা চেতনার শিরা-উপশিরায় স্বদেশের বাস্তবতার যে-রক্ত প্রবাহ, সম্ভবত তাহাকেই তিনি সঞ্চারিত করিতে চাহিয়াছেন নিজস্ব সৃষ্টিতে। সেই কারণেই তাঁহার চিত্রমালা স্বদেশের জল-মাটির মতো সহজ, আকাশের মতো বজ্র-গর্ভ, ঝড়ের মতো সংঘর্ষময় এবং বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ। তাঁহার চিত্রমালা স্বদেশের রাজনৈতিক, আর্থিক, সামাজিক আন্দোলন-আলোড়নেরই সমৃদ্ধ ফসল।

রচনার আঙ্গিকে, অথবা বিন্যাসে গুনে-র ছবি নিও-রিয়ালিজমের সহোদর না হইলেও বন্ধুত্বে যে ঘনিষ্ঠ তাহা, বিশেষ করিয়া কাহিনীর

চূড়ান্ত গতি-পরিণতির প্রসঙ্গে, অনস্বীকার্য। আমরা পড়িয়াছি "হোয়াট অল দা বেস্ট নিও-রিয়্যালিস্ট ফিল্মস ডিড ডু ওয়াজ টু ইস্যু এ চ্যালেঞ্জ। মোস্ট অফ দেম ডিড্ নট হ্যভ এ রিয়েল এনডিং ইন এ সেন্স উই আর মেড টু ফিল দ্যাট দা সিচুয়েশনস ইন হুইচ দা ক্যারেকটার্স হ্যাভ ফাউণ্ড দেমসেলভ্স আর গোইং টু বি রিপিটেড। আনলেস, দ্যাট ইজ, উই দা অডিয়েন্স ডু সামথিং এ্যবাউট ইট।'

গুনে-র ছবিতেও, সেইভাবে, সমাধানের চিহ্ন অথবা উত্তরণের ইশারা ব্যতিরেকেই কাহিনী যখন সমাপ্তির দিগন্তে ঢলিয়া পড়ে, এক রুদ্ধশ্বাস এবং অসহনীয় হাঁপ-ধরা বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের সত্তা মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় খাঁচায় নিবদ্ধ পাখীর মতোই ডানা ঝাপটাতেই থাকে। কাহিনী যখন শেষ হয়, তখন যেন নতুন করিয়া কাহিনীর অকথিত অংশের অভিনয় শুরু হইয়া যায় আমাদের চেতনার পর্দায়, এবং আমরাও আমাদের অজ্ঞাতসারে, উক্ত চলচ্চিত্রের কুশীলবে রূপান্তরিত হই। আমাদের উপর গুরুতর দায়ভাগ চাপিয়া বসে। রক্তে আলোড়ন ওঠে। বিবেকের ভিতরে জাগিয়া ওঠে বহুবিধ জটিল জিজ্ঞাসার তরঙ্গোচ্ছ্বাস। এইভাবে নিছক দর্শক হইতে আমরা সামাজিক দায়-দায়িত্বের প্রত্যক্ষ অংশীদাররূপে উন্নীত হই।

ইতালীয় নিও-রিয়্যালিস্ট পরিচালকেরা ছিলেন আরও একটি বিষয়ে সচেতন। বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদে আস্থাশীল হওয়া সত্ত্বেও তাঁহারা নিজেদের শিল্পকর্মে, ঐ বিষয়ে মৌনতাকেই বিবেচনা করিতেন শ্রেয়। তাঁহাদের বক্তব্য যেন এইরূপ—আমরা বর্তমান সময়ের বাস্তব পরিস্থিতি তুলিয়া ধরিতেছি। ইহার অভ্যন্তরে মানুষের জীবন-যাপনের দুর্বিষহতার দৃষ্টান্ত আঁকিয়া দিতেছি। দর্শক, আপনিই স্থির করুন, এই ঘৃণ্য সময় অথবা সমাজ ব্যবস্থার বিনাশ ঘটাইয়া সুস্থ-সবল এবং স্বাস্থ্যময় সমাজ নির্মাণের জন্য আপনি কোন্ রাজনৈতিক আদর্শকে আলিঙ্গন করিতে উৎসাহী।

"দা ইতালীয়ান ডাইরেকটর্স এ্যাজ এ গ্রুপ ওয়ার মাচ মোর কনসার্নড উইথ ইনডিভিজুয়ালস দ্যান উইথ সোশ্যাল প্রবলেমস্ ইন দা এ্যাবসট্রাক্ট, এ্যাণ্ড ইন দেয়ার বেসট ফিল্ম দে ডিড নট এ্যাডপ্‌ট সর্ট অব পার্টি পলিটিক্যাল লাইন।"

গুনে যে কৈশোরেই কমিউনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী, আঠার বৎসর বয়সে রচিত গল্পের জন্য কারাবাসই তাহার প্রমাণ। পরবর্তী জীবনে এই মতাদর্শের প্রতি অনড় আনুগত্য আরও একাধিকবার তাঁহাকে কারান্তরালের অন্ধকারের জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলিকে অপচয় করিতে বাধ্য করিয়াছে। কিন্তু গুনের ছবিতে, আমরা লক্ষ করিয়া বিস্মিত হইয়াছি, কোথাও, কোনোভাবেই, কমিউনিস্ট মতাদর্শ প্রচারের ক্ষীণতম প্রয়াসও উপস্থাপিত হয় নাই। তিনি, মহৎ শিল্পীর সহজাত নিরাসক্তিতে, আমাদের সম্মুখে নিজের অভিজ্ঞাতজাত সময় ও সমাজের শাসন-শোষণ আশা-নিরাশা, দুঃখ-দৈন্যের স্বরূপটিকে বিশ্বাসযোগ্য ভঙ্গিমায় চিত্রিত করিতেই অধিকতর মনোযোগী। কোনো সহজ বিশ্বাসের মসৃণ পথে পদযাত্রার পরিবর্তে তিনি যেন আমাদের বিশ্বাস অর্জনের দুরূহ-দুর্গমের দিকেই হাত ধরিয়া টান দেন।

ইংরাজীতে যাহাকে 'সাগা' বলে গুনে-র ছবিতে তাহারও যেন মৃদু আস্বাদন। ব্যক্তি-নির্ভর কাহিনীর শরীরে তাই রূপকের আভাস ঝলসিয়া ওঠে। উপস্থাপনার নৈপুণ্যে, উপস্থাপিত প্রধান চরিত্রদের রক্তমাংসে মহাকাব্যের নায়কদের ন্যায় ভাগ্যের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রামের ইচ্ছাশক্তির উৎসারে, ব্যক্তি-চরিত্রকে শ্রেণী-চরিত্রের স্তরে স্থানিক-কাহিনীকে চিরকালীনতার বিমূর্তিকে, উন্নয়নের দক্ষতায়, আমরা যেন তাঁহার ছবিতে লোকায়ত-গাথার সারল্য ও ব্যাপ্তির সান্নিধ্য পাই। তাঁহারই কাহিনী অবলম্বনে রচিত 'হার্ড' চিত্রটিতে অন্ধ-সংস্কারাচ্ছন্ন পিতার তেজস্বী, অভিজাত এবং স্বীয় বিশ্বাসে অনমনীয় চরিত্রটির ট্রাজিক বিপন্নতার ভিতরে আমাদের লৌকিক গাথার মহানায়ক চাঁদ সদাগরের আদল উপলব্ধি করি।

গুনে আমাদের নিকট সদ্য আবিষ্কৃত। তাঁহার সম্বন্ধে আরো জানিবার, বুঝিবার আগ্রহ এই প্রথম আমাদের চলচ্চিত্র-চেতনায় আরোপিত হইল।

॥ ৬ ॥

"পৃথিবী মতামতে পরিপূর্ণ, কিন্তু জ্ঞানে শূন্য।"

বাক্যবন্ধটি সক্রেটিসের। অনেকটা যেন ইহারই সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া

জাঙ্কসোর মন্তব্য—"ইট সীমস্ টু মি দ্যাট দেয়ার ইজ নো হিসট্রি-ওনলি পারটিকুলার ভার্সনস অফ ইট।" শুধু ইতিহাস নয়, 'মিথ' সম্পর্কেও জাঙ্কসোর ধারণা সম্ভবত একই ধরনের। আর ইতিহাস এবং 'মিথ' এই দুটি স্তম্ভের উপর ভর করিয়াই জাঙ্কসোর নির্মাণের জগৎ। ইতিহাসকে 'মিথ'-এ এবং 'মিথ'কে ইতিহাস করিবার নিরন্তর আবেগই তাঁহার সমগ্র সৃষ্টির আদি উৎস। এই দ্বান্দ্বিকতাই তাঁহার সমগ্র নির্মিতির ধ্রুবপদ। নিজের দেশের বাস্তব ঐতিহাসিক ঘটনা, রাজনৈতিক উত্থান-পতন, আবার অতীতকালের গ্রীক ট্রাজেডী, উভয়কে যে তিনি একসঙ্গে আলিঙ্গন করিতে চান, তাহার কারণ উভয়ের মধ্যেই তিনি খুঁজিয়া পান শক্তির সেই দ্বিস্তর দ্বন্দ্ব, যাহা একদিকে অত্যাচারীকে জোগায় বর্বর দমনপীড়ন-আক্রমণের উদ্দামতা এবং অত্যাচারিতকে জোগায় অত্যাচারী অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঐক্য ও উৎসাহ। মূলত জাঙ্কসোর যে-কোনো ছবিরই মূল কাহিনীর কাঠামো হিসেবে ইতিহাস অথবা 'মিথ' যাহাই থাকুক, দুই প্রান্তে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী, শাসক এবং শোষিত। এই মৌলিক উপকরণ অথবা উপাদান অবলম্বনেই তাঁর ভিন্ন ভিন্ন উৎপাদান।

ইতিহাসকে দূরে সরাইয়া তিনি যখন দূরবর্তী 'মিথ'-এ পৌঁছান, তখন 'মিথ' কীভাবে সমসাময়িক স্পর্শ করিয়া অন্য এক ইতিহাস হইয়া ওঠে, 'ইলেকট্রা' তাহার এক দৃষ্টান্ত। 'ইলেকট্রা-র পোশাক-এ মিশিয়া থাকে 'ভার্জিনাল ব্লু'। আকাশ হইতে নামিয়া আসে রক্ত-বর্ণের হেলিকপটার। কাহিনীর পশ্চাৎপটে কোথাও প্রাচীন গ্রীক সভ্যতা অথবা স্থাপত্যের চিহ্নমাত্র নেই। হাঙ্গেরীর বিস্তীর্ণ, দিগন্ত ছোঁয়া শান্ত নির্জন নিম্নভূমি, জাঙ্কসোর অন্যান্য প্রায় সমস্ত ছবিরই লোকেশন হিসাবে যাহা প্রসিদ্ধ, সেইখানেই অভিনীত হইতে থাকে এই সুপ্রাচীন ট্রাজেড়ী, যে-কাহিনীকে লইয়া ইতিপূর্বে এসকাইলাস, ইউরিপিদিস, সোফোক্লিস, ইউজীন ও নীল, সার্তর প্রমুখ প্রতিভাধর নাট্যকারেরা মাতিয়াছেন বারংবার নিত্য-নতুন ব্যাখায়ও বিশ্লেষণে। জাঙ্কসোর 'ইলেকট্রা' যদিও হাঙ্গেরীয় নাট্যকার লাসজ্‌লো গেয়ুরকোর নাট্যরূপ অবলম্বনে, কিন্তু তিনি চলচ্চিত্রায়ণের সময়, সে-নাট্যরূপকেও অতিক্রম করিয়া যান, নিজের বক্তব্য প্রকাশের জরুরী তাগিদে। পেটার

ডে-র সমালোচনায় আমরা পড়ি— ।

"হি সোজ ইলেকট্রা এ্যাজ বিয়িং অপ্রেসড বাই এগিসথাস, দিস কজেস হার টু বিকাম এ মিলিট্যান্ট রেভলিউশনারী টু ওভারথ্রো এগিসথাস রুল, এ্যাণ্ড ফ্রীস দা পিপল ফ্রম হিজ টির‍্যানি। দা প্লেন প্রোভাইডস জাঙ্কসো উইথ এ্যাম্পল স্কোপ ফর হিজ ডায়ালেকটিক অন দা নেচার অব পাওয়ার ইলডেড বাই দা অপ্রেসর এ্যাণ্ড দা ওয়েজ এ্যাণ্ড মিনস এমপ্লয়েড বাই দা ভিকটিমস টু সিফ্‌ট ছাট অপ্রেশন।"

আর এখানেও, তাঁহার অন্যান্য ছবির মতোই, প্যারাবলস, অ্যালিগোরিস, সাম্‌স এবং নিজস্ব প্রতীকসমূহের বিন্যাস। এখানেও ক্যামেরার ক্রমাগত এবং বিরামহীন চক্রমণ। এখানেও 'স্মোক, দা মিনিসট্রেল-কমেনটেটর, কেপস, নেকেড গার্লস, হিউমিলিয়েশন, ডাভস, লাইনস, র‍্যাঙ্কস, মাস-মার্ডার, করপোরেট মুভমেন্টস্‌, রাইডার্স অন হর্স-ব্যাক, রেজারেকশন, দা সেইব্যা, হিউম্যান এণ্ড স্টোন সার্কেল, ওয়াটার..."

জাঙ্কসো-র ব্যক্তিগত অথবা গুপ্ত প্রতীকগুলিকে ছুঁইতে না পারার ফলেই আমাদের বুদ্ধি অথবা কল্পনা ঘর্মাক্ত। আমাদের ভাবনা কোনো নির্দিষ্ট বিন্দুতে স্থির হইবার পরিবর্তে যেন হরিণ শিশুর মতোই ক্রমাগত পলাতক। ইতস্তত রচনার অক্ষরমালা অনুসন্ধান করিয়া, তন্ত্রসুলভ ঐ জাতীয় গুপ্ত প্রতীকের বন্ধ দরজা খুলিবার যে চাবিকাঠিটুকু হাতে আসিয়াছে তাহা এইরূপ—

ঘোড়সওয়ার = শাসকশ্রেণীর অত্যাচার ও শক্তিমদমত্তা।

কেপ অথবা হাতকাটা কোট—শাসকশ্রেণীর পোশাক।

নগ্ন নারী = নির্যাতন, আত্মসমর্পণ এবং অবমাননা। ইহার সহিত গোপনে সম্পৃক্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন গ্যাস চেম্বারের ভয়াবহ স্মৃতি। গ্যাস চেম্বারের অগ্নিগর্ভে নারীদের নগ্ন করিয়া পাঠানোটাই ছিল নাৎসী নীতি। কদাচ যৌনতার প্রতীক নয়। যখন মঙ্গলদীপ হস্তে চক্রাকারে ভ্রমণরত তখন উর্বরতার ও শক্তির প্রতীক।

হেলিকপটার = ভবিষ্যদ্‌মুখী যান। ইলেকট্রা এবং অরেসটেস্‌কে লইয়া এই যান পাড়ি দেয় আকাশে। আবার যখন তাহা ফিরিয়া আসিবে, তখন এই 'ল্যাণ্ড অব অপ্রেসড' রূপান্তরিত হইবে 'ইন এ কানট্রি ফ্রিড ফ্রম ইনইকোয়ালিটি এণ্ড দা অপ্রেসার।'

মৃত্যু=পুনরুজ্জীবন। শাসকগোষ্ঠীর মৃত্যু, মৃত্যুই। একটি বিশেষ শ্রেণীর অবলুপ্তি। কিন্তু যাহারা নির্যাতিত শ্রেণীর প্রতিনিধি, তাহারা মৃত্যুর পরেও পুনরুজ্জীবিত হয় বারংবার।

ইলেকট্রা ছবিতে ইলেকট্রার সংলাপে তাহা আভাসিত। ইলেকট্রা এমন একটি অগ্নিবস্তু পাখির কাহিনী শোনায়, যে নিহত হয় প্রতিরাত্রে এবং পূর্ব হইতে অধিকতর রূপ যৌবন লইয়া জাগিয়া ওঠে পরদিন প্রভাতে।

জাঙ্কসোর ছবি আমাদের অভিজ্ঞতার পক্ষে যতখানি নূতন, অভিনব, এবং বিস্ময়কর, উপলব্ধির পক্ষে ঠিক ততখানিই সুকঠিন। কিন্তু দুর্বোধ্য বা জটিল বিশেষণের ব্যবহারে সাধারণ একটি শিল্পকে যত সহজে অবজ্ঞা অথবা অগৌরবের গর্তে ঠেলিয়া ফেলা যায়, জাঙ্কসোর ক্ষেত্রে তাহা অসম্ভব। এলিয়ট বলিয়াছিলেন, মহৎ কবিতা আক্ষরিকভাবে বুঝিয়া উঠিবার আগেই আমাদের উপলব্ধিকে প্লাবিত করিয়া তোলে। অনেকটা যেন সেইভাবেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সঙ্গীতের সহিত আমাদের আত্মীয়তা। গায়ক অথবা রচয়িতার আরোপিত উপমা, অলঙ্কার, ব্যঞ্জনার সম্পূর্ণ অর্থোদ্ধারে অপারগ হইলেও আমরা প্রবাহমাণ এক মুগ্ধতার ক্রীতদাস হইয়া যাই।

জাঙ্কসো তাঁর চলচ্চিত্রকে ব্যালাড করিয়া তোলেন ক্যামেরার নিরন্তর গতিময়তায়। সেই আবর্তনের স্তরে স্তরে দৃশ্যের রূপকথা-সুলভ পরিবর্তন, দৃশ্যের ত্রিভুবন-ব্যাপ্তি, দৃশ্যের নিয়ত দ্বান্দ্বিকতা, দৃশ্যের বর্ণময়তা গড়িয়া তোলে সৌন্দর্যের এক সৌরলোক। আমরা তখন যেন সুদূর কোনো পুরাণ কাহিনীর অভ্যন্তরে লিপ্ত, বাস্তব-অবাস্তবের মধ্যবর্তী প্রাচীর চূর্ণ, সময় সেখানে ইতিহাসের সাল-তারিখে চিহ্নিত নয়, সময়ের আবহমান প্রবাহ চতুর্দিকের ধ্বংস, মৃত্যু, হত্যা, রক্তপাত, বিদ্রোহ, বিপ্লব সম্পর্কে এক নির্লিপ্ত কথকমাত্র।

এই পুরাণ-প্রতিমাই জাঙ্কসোর ছবির প্রাণ-ভোমরা। তাই কোনো অসম্ভবই সেখানে অবাস্তব নয়, নির্মিতির অঙ্গীভূত। সেখানে যৌথ-উৎসব নিমেষেই রূপান্তরিত হয় ধ্বংসস্তূপে, পুনরুজ্জীবিত হয় মৃত, মন্ত্রবলে অকস্মাৎ জলিয়া ওঠে শত শত দীপ-শিখা, শূন্য শ্মশান-সদৃশ্য প্রান্তরে অগণিত নরনারীর শোভাযাত্রা যেন বঙ্কিম রেখার আলপনা আঁকিতে

আঁকে, শাসকগোষ্ঠীর অনুচরদের হাতের টর্চ হইতে নির্গত অনর্গল পিঙ্গল ধোঁয়া আণবিক বিস্ফোরণের আদলে দৃশ্যপট হইতে সভ্যতার অথবা জীবনপ্রবাহের চিহ্নগুলি মুছিয়া ফেলিতে চায়। আর মানুষকে আমরা ক্রমাগত ডাঙা হইতে জলে নামিতে দেখি, সম্ভবত অন্তর্দ্বন্দ্বময় মানসিকতার পক্ষে তাহা কোনো মুক্তিস্নান।

কাহিনীর উৎস ইতিহাস অথবা পুরাণ যাহাই হোক না কেন জাঙ্কসোর দৃশ্যপটে অসামান্য কোনো রূপান্তর ঘটে না। কোনোরূপ রাজকীয় স্থাপত্য, নগর-বন্দর অথবা বিশেষ কালের জনপদ ইত্যাদি রচনা না করিয়াই তিনি হাঙ্গেরীর উন্মুক্ত, রুক্ষ, ঐশ্বর্যহীন একটি দিগন্তব্যাপ্ত নিম্নভূমিকেই নিজের অধিকাংশ ছবির মঞ্চ হিসাবে ব্যবহার করিয়া থাকেন। দৃশ্যগ্রহণ করেন দিনান্তে অস্তসূর্যের এক বিশেষ রক্তিম আবহে, সারাদিনের নিরবচ্ছিন্ন মহড়ার পর। সেই অস্ত-আলোয় কেলভিনের সামান্য তারতম্য ঘটিলেই শুটিং বন্ধ। নিজে শিল্পকলার ইতিহাসের ছাত্র বলিয়াই বর্ণ ব্যবহারের প্রতি তাঁহার বিশেষ সচেতনতা। পিটার ডে-র সমালোচনায় আমরা পড়ি—

"হিজ ফিল্মস ইন কালার হ্যাড অল হ্যাড এ সেপারেট এ্যাণ্ড ইনডিভিজুয়াল হিউ: 'দা কনফ্রনটেশন' হ্যাড দোজ সামার টোনস অফ সেজানে প্রোভেনস্, 'এ্যাগনাস দি' দা ডেলিকেট ওয়াসেস অফ এ গিয়োটো ফ্রেসকো, 'রেড সাম্' দা প্রাইমারী কালারস অব আ মেডিয়াভ্যাল ম্যানাসক্রাপট ইলাসট্রেশন, 'রোম ওয়ান্টস এ্যানাদার সীজার' দা সান-ব্লীচড কোয়ালিটি অব দা ডেজার্ট। 'ইলেকট্রা' ইজ সাফিউজড উইথ দা অরেঞ্জস এ্যাণ্ড মভ্স অব ডাস্ক এ্যাণ্ড ডন।"

এই প্রসঙ্গে, পাঠক বিরক্ত না হইলে, একটি ভিন্ন প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে ইচ্ছুক। জাঙ্কসোর চিত্রমালা দেখিতে দেখিতে ঠারে-ঠোরে কমলকুমার মজুমদারের রচনার স্মৃতি মনে আসা-যাওয়া করিতেছিল। কেন, তাহা গবেষণার বিষয়। মূল কারণ কী এই যে ইহাদের রচনা প্রচীন শিলালিপির মতো ভিন্ন অক্ষরে লিখিত? ইহারা জীবন ও সময়কে নৃত্য-সদৃশ্য ক্রীড়াচ্ছন্দে প্রকাশ করিতেই অধিকতর আহ্লাদিত? অথবা তৃতীয় কারণটি কী এইরূপ যে দেশজ সংস্কৃতির প্রতি, লোকগাথা, পুরাণ, লোকশিল্প প্রভৃতি যাহার অন্তর্গত, উভয়ের অনুধ্যান

এবং নিজেদের সৃজনে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার উৎসাহ দুই প্রতিভার মধ্যেই অনিবারণীয় ? দুইটি বিচ্ছিন্ন দেশকালের দুই স্রষ্টাকে, আত্মপ্রকাশের মাধ্যমেও যাহাদের মৌলিক প্রভেদ, একসূত্রে স্মরণ করিবার পক্ষে আমাদের নিকট আরও কিছু উপকরণের সঞ্চয় রহিয়াছে। তাহা এইরূপ—

জাঙ্কসো ছাত্রজীবনে ছিলেন শিল্পকলার ইতিহাসের ছাত্র। লোক-গাথার অনুরাগী। পরে নাটক ও চলচ্চিত্র বিষয়ে অধ্যয়ন। অতিরিক্ত আরও দুটি বিষয়েও তিনি শিক্ষিত। যথা, আইন ও এথনোগ্রাফী। লোকজ সঙ্গীত সম্বন্ধে তিনি অতিমাত্রায় সচেতন। তাঁহার ছবিতে লোকজ এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের হাতিয়ারস্বরূপ গণ-সঙ্গীত-এর ব্যবহার ঘটিয়া থাকে সচেতনভাবেই। তিনি নিজে গায়ক না হইলেও, শুটিং-এর অবসরে গণ-সঙ্গীত, নিজের ছাত্রজীবনের রাজনৈতিক আন্দোলনের স্মৃতিতে যাহা নস্‌ট্যালজিক, গাহিতে অভ্যস্ত। 'কোরিওগ্রাফী' তাঁহার চলচ্চিত্রের প্রাণস্রোত, যাহা কখনো কখনো সমান্তরাল, কখনো বৃত্তা-কার, কখনো অর্ধবৃত্ত, কখনো উর্ধ্বমুখী, এবং সতত চঞ্চল।

কমলকুমারের সমগ্র জীবন চিত্রকলা, সঙ্গীত, নাটক এবং লোকায়ত শিল্পের অবিচ্ছিন্ন চর্চার সঙ্গে লতাগুল্মের বন্ধনে জড়িত। দেশজ শিল্পকলার সম্পর্কে তিনি ছিলেন জীবন্ত এবং চলমান এক অভিধান। তাঁহার যে-কোনো একটি রচনা-পাঠে পলকপাতেই প্রমাণিত হইয়া যায়, বাংলার, কখনো ভারতেরও, লোকগাথা, উপকথা, ছড়া, গ্রাম্য কেচ্ছা, পুরাণ কাহিনী, লোকসঙ্গীত প্রভৃতি কী নিপুণতায় সেখানে আহরিত এবং খোদিত। কমলকুমারের নির্দেশিত নাটকে যেমন, তেমনি তাঁহার রচনাতেও কোরিওগ্রাফী-র ভূমিকা গুরুত্বময়। জাঙ্কাসোর মতই তাঁহার অধিকাংশ রচনাই বহির্দৃশ্যপ্রধান। জাঙ্কসোর ন্যায়, তাঁহার রচনাও অবাধ গতি সত্ত্বেও কখনো স্থিরচিত্রবৎ, কখনো স্থিরতর দৃশ্যও বর্ণনার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সমাবেশে গতিময়। একজন তাঁহার চলচ্চিত্রে যেমন করিয়া গাঁথিয়া তোলেন বিরতিহীন এক-একটি দীর্ঘতর দৃশ্য, যাহার স্থায়িত্ব সাধারণত দশ বা এগারো মিনিটের মতো, অন্যজন তাঁহার গদ্যে সেইরূপ বুনিয়া যান জয়েস-সুলভ যতিহীন দীর্ঘস্থায়ী পঙ্‌ক্তি। কমলকুমারের রচনা সমসাময়িকতাকে মিথে-র বিমূর্ত ব্যাপকতায় উত্তীর্ণ করিয়া দেন বলিয়া এক তরুণ ঔপন্যাসিক তাঁহার রচনাকে সম্ভাষণ জানাইয়াছেন 'অভিনব

ব্রতকথা'। জাক্সোর চিত্রমালা প্রসঙ্গেও এই মন্তব্য অভ্রান্ত।

॥ ৭ ॥

গদার বিশ্ব চলচ্চিত্রের বিস্ময়। সম্প্রতি ফরাসী দেশেও তাঁহার জ্যোতির্বলয়ে ধূসর ছায়াপাত ঘটিলেও, এবং সম্প্রতি তাঁহার কর্মোন্মাদনায় ঈষৎ ভাঁটার টান লাগিলেও, চলচ্চিত্র মাধ্যমের উত্থান-আরোহণের ইতিহাস সম্পর্কে সম্যক শিক্ষিত হইতে চাহিলে গদারের রচনা অপরিহার্য পাঠ্যপুস্তক। ইতিপূর্বে আমরা তাহার অল্প কয়েকটি ছবি দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। ফিল্মোৎসব '৮২ উপলক্ষে ১৪টি চিত্রের গুচ্ছ উপহার পাইয়া আমরা একই সঙ্গে আলোড়িত এবং বিভ্রান্ত। আলোড়িত, যখন তিনি একই সঙ্গে আমাদের হৃদয় ও বুদ্ধির দরজায় হাতুড়ী হাঁকান। বিভ্রান্ত, যখন তিনি শুধুমাত্র আমাদের বুদ্ধির দরজা ভাঙিয়া ডাকাতি করিতে চান। গদার কখনোই নিজের মুখ লইয়া আমাদের সামনে উপস্থিত হন না। সর্বদাই সে-মুখাবয়ব একাধিক মুখোশে আবৃত। এবং যথার্থ অর্থে, গদার বলিতে আমরা এমন এক ব্যক্তিত্বকে বুঝি, যিনি সর্বদাই আক্রমণকারী। তাঁহার হাত, দাঁত, কালো চশমা পরিহিত চোখ, তীক্ষ্ণ নাসা, এবং সর্বোপরি আগ্নেয় মস্তিষ্ক সর্বদাই নানাবিধ মারাত্মক অস্ত্রে সুসজ্জিত এবং প্রতিপক্ষকে পর্যুদস্ত করিতে উন্মুখ। পৃথিবীর চলচ্চিত্রে সবচেয়ে নন্দিত এবং নিন্দিত পরিচালক বলিতে তিনিই।

গদার এবং ত্রুফো সমসাময়িক এবং দুজনেই ফরাসী 'নিউ ওয়েভ'-এর প্রধানতম স্থপতি। দুজনেই 'কাহিয়ের দু সিনেমার' প্রথা-বিরোধী সমালোচনার জন্য প্রসিদ্ধ। এমনকি, আরম্ভের যুগে, গদারের একটি সংক্ষিপ্ত ও একটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবির কাহিনীকারও ত্রুফো। এই ত্রুফো, কুড়ি বছর পূর্বের এক সাক্ষাৎকারে বলিয়াছিলেন—

"আই অনেস্টলি বিলিভ দ্যাট প্লিসিং পিপ্‌ল ইজ ইমপর্ট্যান্ট, বাট আই অলসো বিলিভ দ্যাট এভরি ফিল্ম মাস্ট কন্‌টেন সাম ডিগরী অব 'প্ল্যানড ভায়োলেন্স' আপন্‌ দা অডিয়েন্স।" গদারের ছবিতে অংশবিশেষ নয়, আপাদমস্তকই প্ল্যান্‌ড ভায়োলেন্স। দর্শক তৃপ্ত হউক, এমন সদিচ্ছা গদারের স্বপ্নের সীমানায় কখনো অনুপ্রবেশ করিয়াছে কিনা সন্দেহ। দর্শককে বিরক্ত, বিচলিত, বিক্ষুব্ধ করিয়া তোলাই তাঁহার প্রাণপণ

সংকল্প। শুধু দর্শক নয়, তাঁহার শিকারের তালিকায় রহিয়াছে সমালোচকও। গদার সম্পর্কিত একটি গ্রন্থের ভূমিকায় তাই উচ্চারিত হইতে দেখি—

"ইফ ভায়োলেন্স এভার ব্রেকস আউট ইন দা নরম্যালি পিসেব্‌ল র‍্যাঙ্কস অব ফিল্ম ক্রিটিক, ইট উইল অলমোস্ট সার্টেনলি বি প্রোভোক্‌ড বাই দা ওয়র্ক অব জঁা-লুক-গদার।"

কাহিনীটি নিটোল, ঘটনার গতি-প্রকৃতি বোধগম্যতায় সরল, চরিত্রগুলিকেও 'আইডেনটিফাই' করা সহজ, এ-জাতীয় চলচ্চিত্রের প্রতি গদারের অনীহা উচ্চতায় পর্বততুল্য, গভীরতায় সমুদ্রবৎ। তিনি, তাঁহার চলচ্চিত্রে, দুই হাতে দুইখানি বল লইয়া খেলিতে ভালবাসেন, যে বল দুইটির নাম রিয়্যালিটি এবং ইলিউশন। তিনি দর্শককে বারংবার স্মরণ করাইয়া দেন, তুমি যাহা দেখিতেছ তাহা বাস্তব এবং অবাস্তবের, সত্য এবং স্বপ্নের, কাহিনী এবং কথকতার, মূর্ত এবং বিমূর্তের নিরন্তর সংঘর্ষে রচিত একটি শিল্প, এবং ইহাই আসল চলচ্চিত্র।

"ফর দিস রিজন হি ক্র্যামস অল কাইণ্ডস্ অব থিংস ইনটু হিজ ফিল্মস, জাষ্ট এ্যাজ ইউ মাইট মেক আপ এ নোটবুক ইনটু হুইচ ইউ পুট অল দা আইডিয়াস দ্যাট অকার টু ইউ, স্টোরীস ইয়োর ফ্রেণ্ডস টেল ইউ, এ ফিউ লাইনস অব এ পোয়েম ইউ রীড অর লাইকড, সাম পার্টিকুলারলি অ্যাট্রোসিয়াস পান ইউ হ্যাভ জাষ্ট হার্ড অর ইনভেনটেড অ্যাণ্ড সো অন।"

গদারের চলচ্চিত্র এক অর্থে সত্যই তাঁহার ব্যক্তিগত ডায়েরী। ডায়েরীর নিকট সাহিত্যের অবিচ্ছিন্ন শৃঙ্খলা প্রত্যাশা করা নিরর্থক। ডায়েরীর বৈশিষ্ট্য তাহার অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতায়, নিয়ম-নীতিহীন অসংলগ্নতায়। প্রশ্ন উঠিতে পারে গদারের চরিত্রে এইরূপ স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিবার উৎসটি কি অথবা কোথায়? একমাত্র না হইলেও ইহার অন্যমত প্রধান উত্তর সম্ভবত এই যে, প্যারিসের সিনেমাথেক-এ ঘণ্টার পর ঘণ্টা এবং দিনের পর দিন ছবি দেখিবার অভিজ্ঞতা। সিনেমাথেক-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং অধিকর্তা অঁরি ল্যাংলোয়ার ইচ্ছানুসারে সেখানে একটানা চিত্র প্রদর্শনী চলিত কোনো প্রকার ঝাড়াই বাছাই ব্যতিরেকেই। পুরনো এবং নতুন; ভালো এবং মন্দ, ফরাসী এবং আমেরিকান, জানা এবং অজানা, ক্লাসিক এবং সমসাময়িক সব একাকার। গদার, সমসাময়িককালে চলচ্চিত্র বিষয়ক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় যাঁহার

বুৎপত্তি বিশ্ববিদিত নয় শুধু, বিশ্ব-স্বীকৃত, সম্ভবত এইভাবেই খুঁজিয়া পান নিজের বেপরোয় নির্মাণভঙ্গী।

যুদ্ধকালীন দীর্ঘ অবরুদ্ধতার পর প্যারিসের বাতাসে যখন মুক্তির স্বাদ, তখনই হলিউডী চিত্রমালার সঙ্গে ভবিষৎ নিউ-ওয়েভ পরিচালকদের শুভদৃষ্টি। ফরাসী চত্রচ্চিত্রের প্রাঙ্গণে সে যেন বসন্তের এক উতল হাওয়া। গদারের মানসিকতায় এই হলিউডী ছবির প্রভাব যেন অনেকটা স্থায়ী উল্‌কি চিহ্নের মতো। গদার নিজে স্বীকার করিয়াছেন যে তাঁহার প্রথম ফিচার ছবিতে ছিল সচেতনভাবে হলিউডী ছবির অনুসরণ। ১৯৫৯এ যখন 'ব্রেথলেস' তখন অটো প্রেমিনজার-এর ছবি দেখেই নায়ক চরিত্রে জঁা সেকার্জ-এর নির্বাচন। 'আউটসাইডার' ছবিতে হামফ্রে বোগার্টের জন্যে এক মিনিট নীরবতা। ১৯৬৬-তে যখন 'মেড ইন ইউ এস এ', তখনও গদারের চিন্তায় বোগার্ট।

'আই হ্যাড দি আইডিয়া অফ এ ফিল্ম ইন হুইচ এ হামফ্রে বোগার্ট রোল উড বি প্লেড বাই-এ উওম্যান, ইন দিস কেস আনা ক্যারিনা।"

পাছে তাঁহার চলচ্চিত্র গতানুগতিকতার গর্তে অথবা গহ্বরে পতিত হয়, সেই উদ্বেগে তিনি একদিকে যেমন সদাসতর্ক, অন্যদিকে নানা বিচিত্র পন্থা অবলম্বনেও নিয়ত ব্যস্ত। একদা কানে ফিলম ফেসটিভ্যালে গদারের সাহিত তুমুল বিতর্ক বাধিয়াছিল ফরাসী দেশের প্রাচীন এবং প্রতিভাবান পরিচালক ফ্রঁাজুর সহিত।

তাঁহার প্রশ্ন,

—মহাশয়, আপনি কী স্বীকার করিবেন যে আপনার ছবিতে আদি মধ্য ও অন্তের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে?

গদারের উত্তর,

—অবশ্যই। 'বাট নট নিসেসারিলি ইন দ্যাট অর্ডার।'

এক অর্থে তিনি চলচ্চিত্রের ব্রেশ্‌ট। দর্শককে আবেগপ্লুত করার পরিবর্তে, কাহিনীর সর্বাঙ্গ হইতে আবেগের শিকড়গুলিকে কাটিয়া, ডালপালাগুলিকে ছাঁটিয়া, ফুলগুলিকে ছিন্নভিন্ন করিয়া, দর্শককে ঘটনাবলীর বাস্তব কারণ সম্পর্কে অবহিত অথবা জিজ্ঞাসু করিয়া তোলার জন্যই তাহার যত ব্যস্ততা। সেই কারণে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিকট হইতে প্রগাঢ় অভিনয়ের পরিবর্তে তিনি যাহা চান, তাহা অনেকটাই

ভাস্কর্যের মতো একপ্রকার ভঙ্গী। সেই কারণেই পরিপাটিরূপে নির্মিত চিত্রনাট্যের প্রতি তিনি চিরউদাসীন। সেই কারণেই নানা সময়ে তিনি অভিনেতা-অভিনেত্রীদের উপরই অর্পণ করেন একটি বিশেষ মুহূর্তে নিজেদের সংলাপ নিজেদেরই রচনা করিয়া লইবার দায়িত্ব। সেই কারণেই, প্রথা ভাঙিয়া কাহিনীর মধ্যে আচম্বিতে অনুপ্রবেশ করে পরিচালকের কথকতা বা কমেণ্টারী। সেই কারণেই কাহিনীর সহিত যোগসূত্র থাকুক বা না থাকুক, তাঁহার রচনায় ক্রমাগতই ঝলসিয়া ওঠে সাহিত্য অর্থাৎ 'লিটেরারী টেক্সট'। 'দা সোলজার'-এ যেমন মায়াকভস্কি, 'মাই লাইফ টু লিভ'-এ পো-এর গল্প, 'কনটেম্পট'-এ ফ্রিজ ল্যাং-এর মুখে দান্তে-হেল্ডারলিন-ব্রেশট, 'পিয়ের লে ফু'-এ ফার্দিনান্দ এর মুখে হিসট্রি অব আর্ট এর একটা অধ্যায়, 'ব্যাণ্ড অব আউট-সাইডার'এ রোমিও জুলিয়েটের অংশ, পরবর্তী রাজনৈতিক, ছবিতে মাও সে তুঙের বচন। এখানেও ব্রেশটের প্রভাব : 'দা এ্যাকটর মাস্ট কোট্।'

আমরা যদি শুধুমাত্র 'পিয়ের লে ফু' ছবিটির চিত্রনাট্যের দিকে তাকাই, সেখানে পদে পদে চোখে পড়িবে বিশ্বের সাহিত্য শিল্পের অফুরন্ত উল্লেখ। যথা রনে শাতেব্রিয়ঁ, লুই ফের্দিন সেলিন, বালজাক, জুলে ভার্নে-র উপন্যাস, বোদলেয়র রবার্ট ব্রাউনিং, লোরকা, র‍্যাঁবোর কবিতা, এলি ফোরে-র আধুনিক শিল্পের আলোচনা, পিকাশো, রেনোয়া, ক্লয়ঁ, মদিগিলিয়ানীর ছবি এবং বিঠোফেন-এর পঞ্চম সিমফনি।

ফিল্মোৎসবে প্রদর্শিত গদারের প্রত্যেকটি ছবি সম্পর্কে স্বতন্ত্র আলোচনা এখানে অসম্ভব। অসম্ভবের কারণ শুধু স্থানাভাব নয়। আরও বড় কারণ, তাঁহাকে মোটামুটি বুঝিয়া উঠিবার পক্ষে সময়াভাব। বিশেষ করিয়া তাঁহার শেষ পর্বের রাজনৈতিক চিত্রমালা সম্পর্কে আমাদের গভীর আগ্রহ এবং গভীর সন্দেহ যেন সমান্তরাল। বিষয়টি যথেষ্ট পঠনপাঠনের দাবী রাখে। শুধুমাত্র আবেগ তাড়িত উচ্ছ্বাস অথবা নিরাবেগ জারিত নিন্দায় তাঁহাকে ভুল বুঝিবার সম্ভাবনাটাই অধিক। তবে এই রাজনৈতিক চিত্রমালা সম্পর্কে তিনি যে নিজেও তৃপ্ত নন, ইহাদের নির্মাণ এবং কাযকারিতা সম্পর্কে তিনি নিজেই যে যথেষ্ট পরিমাণ সন্দিগ্ধ, তাহার কিছু নিদর্শন রহিয়াছে বেশ কয়েকটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে।

১। 'ব্রিটিশ সাউণ্ড' প্রসঙ্গে

"ইটস নট এ সাকসেস বিকস, আফটার সিইং ইট, ইউ নো নাথিং মোর দ্যান ইউ অলরেডি নিউ এ্যাবাউট ইংল্যাণ্ড। দা পিকচার অফারস নো পসিবিলিটি ফর রিয়েল ডিসকাসন এ্যাবাউট দা রিয়েল সিচুয়েশন।"

২। 'প্রাভদা' প্রসঙ্গে

"ইট'স টু এ্যামবিসাস ফর ইটস পসিবিলিটিস, ইট'স ইনটারেস্টিং, বাট নো মোর ছ্যান ছ্যাট।"

৩। 'দা চাইনীজ' প্রসঙ্গে।

"ইট ওয়াজ ডান ওনলি উইথ ফিলিংস, এ্যাণ্ড দা ফিলিংস এনডেড হোয়েন আই ওয়জ ডুইং 'ওয়ান এ. এস', মে বি দা ফিলিংস ওয়্যার গুড, বাট এ্যাট এ সার্টেন পয়েন্ট দে স্টপ বিইং গুড। ইউ হ্যাভ টু এ্যানালাইজ, টু ডিসট্যাণ্ট ইয়োরসেল্‌ফ ফ্রম ফিলিংস, অ্যাণ্ড টু নো হোয়ার দি ফিলিংস আর কামিং ফ্রম।'

গদারের রাজনৈতিক ছবিগুলি দেখিতে দেখিতে মায়াকভস্কির স্মৃতি মনে হাওয়া তোলে। ১৯১৩-য় 'সাধারণের রুচির উপর চপেটাঘাত নামে যে ম্যানিফেস্টো প্রকাশিত হয়, তার নেতৃত্বে ছিলেন মায়াকোভস্কি। তিনি ভালবাসিতেন "প্রেক্ষাগৃহের জনতার সঙ্গে খেলতে, তাকে জ্বালাতন করতে, ষাঁড়ের মতো তাকে ক্ষেপিয়ে দিতে এবং সব সময় নিজের ইচ্ছামতো তাকে যে কোন দিকে চালিয়ে নিয়ে যেতে⋯।"

১৯৬৮-র বিখ্যাত প্যারিস আন্দোলনের পর হইতেই গদার নতুন মানুষ। তাঁহার নতুন পরিচয়, চলচ্চিত্রের রাজনৈতিক ভাষ্যকার। তাহার নতুন বিশ্বাস, "দেয়ার ইজ নো সাচ থিং এ্যাজ ক্ল্যাসিকাল সিনেমা, দেয়ার ইজ ওনলি ক্যাপিটালিস্ট সিনেমা এ্যাণ্ড রেভলিউশনারী সিনেমা।" তাহার নতুন ইচ্ছা, জীবন বা সময়ের কাহিনী রচনা নয়। জীবন ও সময়ের ডকুমেনটেশন। গদার যাহাই করুন, তাঁহার অন্তর্গত কবিকে তিনি কখনো একলা ফেলিয়া যাইতে পারেন না, সর্বদাই বন্ধুর মতো পার্শ্ববর্তী। গদার যে মূলত একজন কবি, তাহার প্রমাণ শুধু এই নয় যে, তাঁহার চলচ্চিত্রে কবিতার ব্যবহার থাকে প্রায় সর্বত্র, অথবা তাঁহার চরিত্রদের সংলাপে অধিকাংশ সময়ে কবিতার রৌদ্র জলিয়া ওঠে, অথবা কাহিনীর পিছনে তাঁহার নিরাসক্ত কমেনটারীর ভাষাতেও অভ্র কুঁচির মতো ঝলসিয়া ওঠে কবিতা। তিনি জীবনকে দেখেন কবিতার চোখেই।

'আলফাভিল' ছবিতে আমরা একটি ডিকশনারীর উল্লেখ পাই, প্রত্যেক নতুন সংস্করণে যেখান হইতে কিছু কিছু শব্দ অদৃশ্য হয়, কারণ কমপিউটার-চালিত এই যন্ত্র নগরীতে তাহাদের প্রয়োজন নিঃশেষিত। যে শব্দগুলিকে হারাইয়া নাতাশা ব্যথিত, তাহা যথাক্রমে—রবিন রেড-ব্রেস্ট, অটম নাইট, টেনডারনেস এবং কনশেন্স। সবশেষে, লাভ অর্থাৎ ভলোবাসা।

নাতাশার কণ্ঠস্বরে ইহা কবি গদারেরই ক্রন্দন এবং অন্বেষণ।

॥ ৮ ॥

মূল উৎসব প্রাঙ্গণে নির্বাচিত ছবির সংখ্যা ছিল ৮৩। পড়িয়া শুনিয়া আমরা বুঝিয়াছি যে পৃথিবীর কোনো চলচ্চিত্র উৎসবেই দশ পনেরোটির বেশী ভালো ছবির সাক্ষাৎ মেলে না। অথচ উৎসব চালাইতে হইলে গোনা-গুনতিতে তালিকাটি ভাগলপুরী গাভীর মতো হৃষ্টপুষ্ট হওয়া একান্তই প্রয়োজন। অতএব দুধে জলের ভেজাল। ভেজাল দুধ জাল দিয়া পরিমাণমত ছানা বা ক্ষীর পাওয়া সম্ভব নয়। আমরাও ৮৩টি ছবি হইতে পাঁচ-সাতটির বেশী স্মরণীয় ছবির স্বাদ পাই নাই। উৎসবের উদ্বোধনী ছবিটি ছিল স্পেনের 'ব্লাড ওয়েডিং'। পরিচালক কার্লো সাওরার 'ব্লাড ওয়েডিং'-এর অবলম্বন কবি লোরকার ১৯৩৭-এ রচিত ঐ নামেরই মহান কাব্যনাট্য। রচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অভিনীত হয় মাদ্রিদে। পরে ইহা পৃথিবী পর্যটন করে এবং পৃথিবীর প্রায় সমস্ত ভাষায় অনূদিত হয়। ইহাতে পার্বতী-পরমেশ্বরের ন্যায় মিলিত হয় নাটকের চিরায়ত কাঠামোর সহিত স্থানিক লোকগাথা, লোকসঙ্গীত এবং লোরকার কবিতার যাবতীয় আদিম, ও বলবান আবেগ। সাওরার চলচ্চিত্রটি মূল নাটক অবলম্বনে নির্মিত নয়, ইহার নির্ভরতা মূল নাটক অবলম্বনে রচিত একটি ব্যালের উপর। সাওরা আবার সম্পূর্ণ ব্যালেটিকেও চিত্রায়িত করেন নাই। চলচ্চিত্রের প্রয়োজনে বাছিয়া লইয়াছেন প্রয়োজনীয় অংশবিশেষ। যেন জীবন বা জাগরণ হইতে অন্তিম মৃত্যু পর্যন্ত ব্যাপ্তিকে ধরিবার জন্যই তাঁহার চলচ্চিত্র শুরু হয় গ্রীন রুমের অন্ধকার হইতে। আলো একে একে জ্বলিয়া ওঠে, নৃত্যে অংশগ্রহণকারী চরিত্রেরা একে একে নিজেদের নির্দিষ্ট স্থানে উপবেশন করিয়া

নির্ধারিত সাজ-সজ্জায় রত হয়। এই সময়ে আমরা তাহাদের ব্যক্তিগত জীবনের রুচি ও সংস্কারের কিছু মৃদু আস্বাদন পাই। চারিদিকে ব্যস্ত প্রস্তুতির মাঝখানে প্রধান দুইটি চরিত্র, যাহারা একে অপেরের দ্বারা নিহত হইবে, নীরবে, বিশাল পৃথিবীতে নিঃসঙ্গ সংগ্রামীর ন্যায়, নিজেদের অস্তিত্ব এবং নাটকের চরিত্রের মধ্যেকার ব্যবধানকে লুপ্ত করিবার মানসিকতায়-প্রস্তুত হইতে থাকে, একটু পরেই যাহাদের রক্তের যাবতীয় উজ্জ্বলতা পৃথিবীর মাটি শোষণ করিবে। "ব্লাড হুইচ সিজ দা অফ ডে লাইট ইজ ড্রাঙ্ক আপ বাই দা আর্থ।"

সাওরার চলচ্চিত্র লোরকার কাব্যনাট্যের আদ্যন্ত অনুসরণ নয়, বরং, এক অর্থে, ইণ্টারপ্রিটেশন। ইহার সবচেয়ে স্মরণীয় দৃশ্য দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পরস্পর পরস্পরেব ছুরিকাঘাতে নিহত হইতেছে। আমরা অনেক মৃত্যুদৃশ্য দেখিয়াছি। কিন্তু এমন মৃত্যু-শিল্প দেখি নাই। লোরকা তাঁহার নাটকে যাহা বলিতে চাহিয়াছিলেন, এবং ফ্যাসিস্ট ফ্রাঙ্কো-র সশস্ত্র অনুচরদের হাতে লোরকার নিজের জীবনে যাহা ঘটিয়াছিল, আমরা তাহাই প্রত্যক্ষ করিলাম। 'আর্থস টেরিবল হাঙ্গার ফর ব্লাড'।

সাওরার ছবি আরও একটি কারণে আমাদের চমকিত করিল। ইহাতে ইংরাজী সাব-টাইটেল ছিল না। ছিল ফারাসী। ভাষার এখানে দুস্তর প্রাচীর হইয়া উঠিবার কথা। কিন্তু ঘটিল বিপরীতটাই। চলচ্চিত্রের ভাষা সাহিত্যের বা সংলাপের ভাষাকে অতিক্রম করিয়া নিজের বিজয় পতাকা উড়াইয়া দিল।

'ব্লাড ওয়েডিং' শুধু ফিল্মোৎসব ৮২-র শ্রেষ্ঠ ছবি নয়, যে অল্প কয়েকটি স্মরণীয় ছবি কোনোদিনই আমাদের স্মৃতিতে শুকাইবে না, ঝরিবে না, ইহা তাহাদেরই একটি।

পরবর্তী স্মরণীয় ছবি 'মেফিস্টো', হাঙ্গেরী এবং ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানীর যৌথ উদ্যোগে নির্মিত। পরিচালক ইস্তভান জাবো। নাৎসী শক্তির অভ্যুদয়ের মুহূর্তে একজন বিবেকবান শিল্পীর মৌলিক এবং মানবিক সমস্যাই এই ছবিটির বিষয়। আরম্ভে ঈষৎ লোকরঞ্জক, কিন্তু যতই সমাপ্তির দিকে অগ্রসর হয়, টেনশন দানা বাঁধিতে থাকে, আমরাও শিল্পের আত্মপ্রকাশের এবং শিল্পীর স্বাধীনতার ভয়াবহ সংকটের সহিত একাত্ম হইতে থাকি। অন্তিম দৃশ্যে এই সংকট নির্দিষ্ট স্থান-কালকে

অতিক্রম করিয়া সর্বজনীনতার স্তরে উন্নীত হয়। ছবিটির সবচেয়ে আলোকময় দৃশ্য, বিবেক-পীড়িত নায়কের মুখে 'হ্যামলেট' চরিত্রের আধুনিক বিশ্লেষণ, যাহা আধুনিক সমাজ-সত্যের সহিত সম্পৃক্ত।

পরের ভালো লাগা ছবিগুলি মোটামুটি চারভাগে বিভক্ত।

১। জাঁক-জমক, গতিপ্রধান ও সঙ্গীতমুখর।

ইহার মধ্যে সর্বাগ্রে নাম করিতে হয় মিলোস ফোরম্যানের 'হেয়ার'। হালকা চালের এই ছবিটি প্রারম্ভে আমাদের গানে মাৎ করিতেছিল। পরে শেষাংশে এক আশ্চর্য নাটকীয় ঘটনার মাধ্যমে ইহার শরীর হইতে স্ফূর্তির খোলস খসিয়া পড়িল। আমরা একটি করুণ ট্র্যাজেডীর মুখোমুখি হইলাম। ছবিটিও স্মরণীয়তার মুখদর্শন করিল। 'হেয়ার'-এর মতো 'হংকি টংক হাইওয়ে'-ও আমেরিকার ছবি এবং এ্যাকশন প্রধান। তবে যতক্ষণ চোখের সম্মুখে, ততক্ষণই মন্ত্রোমুগ্ধকর এবং উপভোগ্য। হেয়ার-এর অপেক্ষা ইহাতে কৌতুকের উপাদান প্রভূত। কিন্তু স্মৃতির ফ্রেমে স্থায়ী হইবার যোগ্য নয়। যেমন 'দা উইজ'। 'দা ওয়াণ্ডারফুল উইজার্ড অফ ওজ' নামক বিখ্যাত মিউজিক্যাল অবলম্বনে এই ছবি। ইহাতে সেট-সেটিং-এর জাঁকজমকে যত বাহাদুরি, ছবিটি ততখানি মর্মস্পর্শী হইয়া উঠিতে পারে নাই। ইহাও আমেরিকান। আমেরিকা কি সম্প্রতি কলোসাল-মিউজিক্যাল-এর মাধ্যমে দিগ্বিজয় করিতে চাহিতেছে? আমেরিকান হইলেও 'রেজিং বুল'-এর চরিত্র ভিন্নরূপ। প্রথমত ইহা সাদা-কালোয় নির্মিত, গত বৎসর আমরা এইরূপ একটি সাদা-কালোর ছবি দেখিয়াছিলাম। নাম 'দা এলিফেন্ট বয়'। 'রেজিং বুল' বিশ্ববিখ্যাত মিডলওয়েট বক্সিং চ্যামপিয়ন জাকে লা মোটা-র ঘটনাবহুল জীবনী অবলম্বনে নির্মিত। এই গতিময় ছবিটির বাঁধন আঁটো-সাঁটো, ঘটনা উত্তেজনাপূর্ণ এবং কাহিনী মানবিক। শুনিয়াছি, ব্রিটিশ ছবি 'চ্যারিয়টস অব ফায়ার'-ও এই রকমই উত্তেজনাময় এবং মানবিকগুণসম্পন্ন ছবি।

২। সামাজিক, রাজনৈতিক অথচ সাসপেন্স মুখর।

এই জাতীয় ছবির তালিকায় আছে ওয়েস্ট জার্মানীর 'পুট অন আইস,' সুইজারল্যাণ্ডের 'দা সুইসমেকার', সুইডেনের 'টু বি এ মিলিওনেয়ার'।

৩। রাজনৈতিক মনোভাবাপন্ন।

সুইজারল্যাণ্ডের 'দা লস্ট ওয়ে', 'দা বোট ইজ ফুল', ছদ্মবেশে পোলাণ্ডের 'চান্স', ওয়েস্ট জার্মানীর 'স্লো এ্যাটাক', এবং সেনেগালের 'সেদো'। 'দা লস্ট ওয়ে'-র পরিচালিকা প্যাটরিসিয়া মোরাজ স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন এবারের উৎসবে। কাহিনী এবং চিত্রনাট্য নিজের। ছবিটিতে একই সঙ্গে তিনটি জেনারেশন উপস্থিত। বৃদ্ধ দাদু, যাঁহার রাজনৈতিক বিশ্বাস, লেনিনের সঙ্গে শেষ করমর্দনে স্মৃতি, এখনো অটুট। বৃদ্ধের পুত্র ও পুত্রবধূ, যাহারা নিজেদের ব্যবসা এবং স্বার্থের বাহিরে অন্য সব কিছু এমনকি নিজেদের পুত্রকন্যার সম্পর্কেও উদাসীন। শিশু কন্যাটি দাদুর নিকট হইতে দীক্ষা নেয় বিদ্রোহের এবং ঘৃণার। বয়সের তুলনায় ভাবনার ব্যাপকতায় সে বাল্যেই হইয়া ওঠে পরিণত। কনিষ্ঠ ভাইটি তাহার দ্বারা প্রভাবিত। দাদু মারা যায়। বালিকা সেসিল পিতামাতাকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করিয়া নিজের জীবন গড়িতে চায়। মানুষের মধ্যে দাদুর রাজনৈতিক বিশ্বাস সন্ধান করে অথবা রোপণ করিতে উৎসাহিত হয়। কিন্তু সময় অথবা সমাজ তাহাকে বিপরীত দিক হইতে আঘাত করে। নিজেদের প্রিয় বিড়ালটিকে লইয়া একদিন রাত্রে কনিষ্ঠ ভায়ের সঙ্গে সেসিল বাড়ির টালির ছাদে উঠিয়া চন্দ্রোদয়ের জন্যে অপেক্ষা করে। চাঁদ উঠিলেই তাহারা অন্য পৃথিবীতে উড়িয়া যাইবে। দুটি অপরিণত বালক-বালিকাকে কেন্দ্র করিয়া একটি পরিণত মননের ছবি, যাহাতে আধুনিক সময়ের জটিলতা, বিশ্বাসহীনতা এবং 'এ্যালিনেশন' সূক্ষ্ম রেখায় সুস্পষ্ট। 'দা বোট ইজ ফুল্' একাধিক আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কৃত ও সম্মানিত। যুদ্ধকালীন অসামরিক পরিবেশে এক গুচ্ছ ভিন্ন ভাষাভাষী রেফিউজির, আত্মরক্ষার তাগিদে, নিজেদের এক পরিবারভুক্তরূপে গড়িয়া তুলিবার প্রয়াস এবং তাহার ব্যর্থতাই ছবিটির মূল বিষয়। ছবিতে সাময়িকভাবে আশ্রয়দাতা স্বামী-স্ত্রীর চরিত্র দুটি এই ছবিটিকে স্থাপত্যবৎ খাড়া করিয়া রাখিবার দুটি স্তম্ভ যেন। স্লো-অ্যাটাক-এর পরিচালক রেনহার্ড হফ আমাদের নিকট অতিশয় পরিচিত, ছবি এবং ব্যক্তিগত দুই সূত্রেই। তাঁহার পূর্বের ছবিতেও যেমন, এ ছবিতেও তেমনি, সময় বা মানব চরিত্রের বিশ্লেষণে তিনি নির্মম। সেনেগালের 'সেদো' গঠনের শিথিলতায়, বিষয়বস্তুর বলিষ্ঠতা সত্ত্বেও, প্রত্যাশা অনুযায়ী

ক্ষুরধার হইয়া উঠিতে পারে নাই। সেনেগালের দরিদ্র মানুষের দুই দিকে দুই শত্রু। দুই শত্রুই আঁটিয়া চলিয়াছে ধর্মীয় শাসন-শোষণের চক্রান্ত। একদিকে মুসলিম ধর্ম অন্য দিকে খৃশ্চান। সময়, গত শতক। 'চান্স' আপাতদৃষ্টিতে আদৌ রাজনৈতিক নয়। কিন্তু রূপকের খোলসটি ভাঙিয়া ফেলিতে পারিলেই অনুভব করা সহজ হইয়া ওঠে যে, ইহা খেলাচ্ছলে অর্থাৎ খেলাধূলার প্রসঙ্গের মধ্য দিয়াই সংগোপনে প্রকাশ করিতে চাহিতেছে ব্যক্তি স্বাধীনতা বনাম ডিকটেটরশিপের সেই দ্বন্দ্ব, যাহার পরিণামে ব্যক্তির আকাংক্ষা অভিলাষের চূড়ান্ত পরিণতি রক্তপাতময় ট্রাজেডীতে।

৪। ভালো-মন্দে মেশামেশি।

বাকী এক গুচ্ছ ছবিতে ভালো এবং মন্দের মিশ্রণ সমপরিমাণ। হয় বিষয় মামুলি, টেকনিকে উজ্জ্বল। অথবা বিষয়টি জটিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোথাও উত্তরণ ঘটে না। যেমন বুলগেরিয়ার 'অল ইজ লাভ,' ইতালীর 'দে অল লাভড হিম', ওয়েস্ট জার্মানীর 'সিস্টার্স অব দা স্কেলস অব হ্যাপিনেস', হাঙ্গেরী-ফিনল্যাণ্ডের যৌথ উদ্যোগে 'ডিউটি ফ্রী ম্যারেজ', নিউজিল্যাণ্ডের 'পিকচার্স', আগাথা ক্রিষ্টি অবলম্বনে ব্রিটিশ গোয়েন্দা চিত্র 'দা মিরর ক্রাক্‌কড', ইউ এস এস আর-এর 'মেন উইদাউট উইমেন', মরক্কো-ফ্রান্সের যৌথ উদ্যোগে 'ট্রানসেস', স্পেনের 'চেঞ্জিং হর্সেস'. ব্রিটিশ ছবি 'ব্রাদার্স এ্যাণ্ড সিসটার্স।

স্বীকার করতে কুন্ঠিত নই যে বেশ কয়েকটি উপভোগ্য ছবি হইতেই আমি স্বেচ্ছা-বঞ্চিত। তবে আন্তরিকভাবে দুঃখিত কেবল একটি ছবির জন্য, যাহা দুই-পর্বে নির্মিত মলিয়েরের জীবনী। ঐ সময়ে এন এফ ডি সি-র ফিল্ড প্রোডকসন্স সেণ্টারের উদ্বোধন থাকাতেই এই ক্ষয়-ক্ষতি। প্রথম পর্বের শেষাংশটুকু দেখিয়াই বুঝিলাম, উৎসবের একমাত্র ক্লাসিকাল গড়নের ছবি এই একটিই।

৯॥

ইণ্ডিয়ান প্যানোরমার ছবিগুলির দিকে অনেকটা ইচ্ছা করিয়াই মনোযোগ পাতি নাই। কোনো না কোনো সময়ে উক্ত ছবিগুলির সহিত পুনরায় মুখোমুখি হইবার সুযোগ মিলিবে জানিয়াই বিদেশাগত

ছবিগুলির দিকেই যথাসম্ভব আগ্রহে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলাম। তবে এক্ষেত্রেও অবশেষে একটি ব্যতিক্রম ঘটিল। একটি ছবির জন্য ভবিষ্যতের ভরসায় নিজেকে নিথর রাখিতে অক্ষম হইলাম। কারণ কলিকাতার আকাশে বাতাসে তখন ছবিটি বা ছবি দুইটির প্রশংসা মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনির গাম্ভীর্যে বাজিতেছিল।

আমি যখন নিউ এম্পায়ার চিত্রগৃহে উপস্থিত হই, তখন রণক্ষেত্রে সবেমাত্র শুরু হইয়াছে যুদ্ধ দামামা। যুদ্ধ থামিলেও চিত্রগৃহের দ্বারদেশে তখনো মর্মাহত দর্শকদের এমনই চাপ-বাঁধা ভীড় যে, পদচারণাই দুঃসাধ্য। পকেটস্থিত ডেলিগেট কার্ডের সুবাদে যদিও বা চিত্রগৃহের ভিতরে প্রবেশ করিলাম, বসিবার যোগ্য তিলমাত্র স্থান দুর্লভ। যদিও বা কোনোমতে দর্শকাক্রান্ত সিঁড়ির একপ্রান্তে বসিবার যোগ্য বিন্দুমাত্র আসন মিলিল, ততক্ষণে 'পিকু', ছবিটির প্রদর্শনী শুরু হইয়া গিয়াছে। যেহেতু সম্পূর্ণ ছবিটি দেখা হয় নাই, সেই কারণে এখানে ঐ ছবিটির সম্পর্কে আমি আলোচনা হইতে বিরত থাকিব। যদিও যে দীর্ঘ অংশটুকু দেখিয়াছি, তাহা মর্মস্থলে, এখনো রূপবান আকৃতিতেই জীবিত।

'সদ্গতি' দেখিবার পর কোথা হইতে এবং কেমন করিয়া যে আমার মস্তিষ্কে ভাস্কর্য শব্দটি ঢুকিয়া পড়িল, তাহা আমারও অজ্ঞাত। পরে বুঝিলাম, 'সদ্গতি'কে নিটোল একটি ভাস্কর্য ছাড়া অন্য কোনো উপমায় বাঙ্ময় করা অসম্ভব। এখন মনে হইতেছে গত কয়েকবৎসর যাবৎ সত্যজিৎ রায় জলরঙ লইয়া খেলা করিতেছিলেন। অবশ্য ইহার মধ্যে 'সতরঞ্জ কে খিলাড়ী' জলরঙের কাজ নয়। তাহা মোগল মিনিয়েচার। কারণ তাহাতে রেখার টানগুলি ছিল সবল এবং সুনির্বাচিত, তাহাতে রাজপুত পেনটিং এর মতো রঙের বিচ্ছিন্নতা এবং আলোর সমবণ্টনের পরিবর্তে ছিল আলো-ছায়ার ঘনীভূত যুদ্ধ এবং এক রঙের সহিত অন্য রঙের প্রগাঢ় প্রণয়। তাহার চারিপাশে ছিল অভিজাত নক্শার বেড়। সর্বাঙ্গে সূক্ষ্ম তুলির দক্ষতা। অপরাজিত, দেবী এবং কাঞ্চনজঙ্ঘার পর সত্যজিৎ রায় আর ভাস্কর্যে ফিরিয়া আসেন নাই। মাঝখানে একটি অয়েল পেনটিং রচনা করিয়াছিলেন, যাহা চারুলতা, প্রায় রেমব্রাঁর মতো ছায়াবিন্যাসে যাহা আলোকিত করিয়া তুলিয়াছিল কাহিনীর অন্তর্গত ট্রাজেডীকে। দীর্ঘদিন পরে পুনরায় তিনি হাতে

ছেনী বাটালী ও সম্মুখে কঠিন পাথর খণ্ড গ্রহণ করিলেন দেখিয়া আনন্দে আমাদের অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধির শরীরে জ্যোৎস্নাস্পর্শ ঘটিল। তবে পিকু ও সদ্গতি একই প্রকারের ভাস্কর্য নয়। পিকু সম্ভবত মডেলিং জাত। সদ্গতি কারভিং, ছেনী বাটালীর বলিষ্ঠ আঘাতে খোদিত। দেখা শেষ হইলে রদ্যাঁর কোনো ভাস্কর্য দর্শনের তৃপ্তি আনে। কখনো কখনো রদ্যাঁ পাথরের সবটুকু খোদাই করিতেন না। অমসৃণ, আদিম পাথরখণ্ড ভেদ করিয়া একটি মূর্তির অংশ বা মুখাবয়ব চাহিদা অনুযায়ী ভঙ্গীতে জাগিয়া উঠিলেই তিনি বাকিটুকু অসমাপ্তই রাখিয়া দিতেন। সদ্গতি দেখিতে দেখিতে আমাদের মধ্যেও তেমনি অনুভব। যেন আরও কিছু রাগ, ক্ষোভ, উত্তেজনাকে অনুদ্গত রাখিয়াই ঠিক যতটুকু খোদাই করিলে প্রেমচান্দর এই নির্মম উৎপীড়নের কাহিনীটি মূর্তিমন্ত হইয়া ওঠে, ঠিক ততটুকুকে জীবন্ত করিয়াই তিনি স্থির। ভাস্কর্যের নিকট আমাদের প্রার্থনা 'বিউটি' নহে, 'ভাইটালিটি'। 'সদ্গতি'-র শরীরে আমরা সেই 'ভাইটালিটি'-র স্বাদ পাইয়াই পরিতৃপ্ত।

চিত্রকলা সাজিতে চাহে। কমপক্ষে তাহার জন্য একটি সৌখীন গড়নের ফ্রেম অত্যাবশ্যক। ভাস্কর্য নিরাভরণেই মূর্ত। প্রেস কনফারেন্সের সুবাদে আমরা জানিতে পারিলাম যে সত্যজিৎ রায় নির্মাণের মুহূর্তে সেইভাবেই ভাবিয়াছিলেন। তাই 'সদ্গতি'কে করিতে চাহিয়াছিলেন আবহসঙ্গীতশূন্য। যাহা থাকিবে তাহা শুধু স্বাভাবিক আবহ-ধ্বনি। পরে ঈষৎ সঙ্গীত সংযোজনা ঘটিলেও, তাহার উপস্থিতি কোথাও উগ্রতর তো নয়ই, মনে হয় যেন মানুষের সমাজের ইতরতা সম্পর্কে বিরক্ত প্রকৃতিরই বক্ষস্পন্দন।

এই মুহূর্তে আমরা এ-ছবির অভিনয়, সম্পাদনা, অথবা ফটোগ্রাফী ইত্যাদি বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে অনিচ্ছুক। কেননা যখন আমরা মহৎ কোনো সিমফনীর নিকট অবনত হই, তখন কী তৎক্ষণাৎ আমরা জানিতে উৎসুক হই, কাহার হাতে কোন্ বাদ্যযন্ত্র ?

দেশ

চলচ্চিত্র এবং প্রেম

হৃদয়বান পাঠকের মার্জনা পাওয়ার প্রত্যাশাকে মনে রেখে, নিজের কথা দিয়েই শুরু করছি এ-লেখা। ১৯৬৫। বাংলা চলাচ্চত্রের উঠোন অর্থাৎ টালিগঞ্জে পা ফেলে জীবনের প্রথম ছবিতে হাত। 'স্বপ্ন নিয়ে'। অবলম্বন, প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার'। শুরু থেকেই সমস্যা। জল ছুঁতে না ছুঁতেই নৌকো ডুবুডুবু। পরিচিত একজন ডিসট্রিবিউটার কথা দিয়েছিলেন, হাজার দশেক টাকা খরচ করে কিছুটা তুলুন। তারপরে আমি আছি। আদর-আবদারের জোরে ঐ টাকাটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়েছিলাম ছোট কাকার কাছ থেকে। কিন্তু সিনেমার কুমীরের হাঁ-এর কাছে দশ হাজার তো চুনো-পুঁটি। এদিকে দশ হাজার শেষ করে যখন প্রতিশ্রুত ডিসট্রিবিউটারের কাছে হাজির, তিনি জানিয়ে দিলেন : দুঃখিত। কারণ সদ্য তিনি মার খেয়েছেন এক হিন্দি ছবিতে। আরম্ভে সমস্যাটা ছিল ধূসর। ক্রমশ হয়ে উঠল মহিষ-কালো। নতুন করে ডিসট্রিবিউটার জোগাড়ের তাগিদে যাঁকেই চিত্রনাট্য শোনাই, তাঁরই কোঁচকানো ভুরুতে একটাই ঝলসানো প্রশ্ন : মশাই! আর গপ্পো পেলেন না?

কবে যেন শেক্সপীয়রের একটা ঝকঝকে উক্তি চোখে পড়েছিল : 'ইয়ং ম্যান্স লাভ লাই ইন দেয়ার আই, নট দেয়ার হার্ট'। যে-সব ইয়ং ম্যানরা সিনেমার প্রেমে পড়ে, তাদের বেলাতেও কথাটা আকট্য সত্যি, যদি

উল্টে নেওয়া যায়। অর্থাৎ তারা সিনেমাকে দেখে হৃদয় দিয়ে, চোখ দিয়ে নয়। অর্থাৎ তাদের নজরটা থাকে নিজের উপোষী হৃদয়ের খিদে মেটানোর দিকেই বেশি, দর্শক কতখানি তৃপ্ত হবেন ভোজনে-র চেয়ে।

'স্বপ্ন নিয়ে' তৈরীর বেলায়, গল্প বাছাই থেকে চিত্রনাট্য রচনা, আগাগোড়াই ভূতের মতো ঘাড়ে চেপে বসেছিল একটাই অভিপ্রায়, এক্সপেরিমেণ্ট। কেটলির ভিতরের ফুটন্ত জল হয়ে টগবগ করতো সেই সব মুহূর্তগুলো, যখন গল্পের নির্ধারিত কাঠামোকে বজায় রেখেই চিত্রনাট্যে জুড়ে দিতে পারছি নিজের কল্পনা দিয়ে তৈরী এমন সব ঘটনা অথবা মুহূর্ত অথবা চরিত্র যার গায়ে সত্যি সত্যিই স্বপ্নের অস্বাভাবিকতা অথচ স্বপ্নের খোলসটা খুলে যাদের সত্যি হয়ে ওঠার পক্ষে বিধি-নিষেধ নেই কোনো। উপন্যাসের চেয়ে ছোটগল্প এই কারণেই, সিনেমা তৈরীর ব্যাপারে, আমাকে টানে এত বেশি। যতই আটোসাঁটো হোক, ছোট গল্পের মধ্যে থেকে যায় এমন সব ফাঁক-ফোঁকর, খালি জায়গা, খোলা দরজা, যেখানে সহজেই ঢুকে পড়তে পারে, প্রায় বিনা অনুমতিতেই, পরিপূরক অনেক কিছুই। ছাপা-গান যখন গাওয়া-গান হতে যায়, তখন স্বচ্ছন্দে 'প্রেলুড', 'ইণ্টারলুডের' ফাঁকা জায়গায় ঢুকে পড়ে আবহসঙ্গীতের যন্ত্রেরা। উপন্যাস অনেকটা রেলগাড়ির রিজার্ভ কামরার মতো। জায়গা অনেক। কিন্তু নির্দিষ্ট কয়েকজনের বাইরে অন্যের প্রবেশ নিষিদ্ধ। ছোটগল্প ইণ্টারক্লাস। জায়গা সীমিত। কিন্তু অজস্রের প্রবেশাধিকারে আপত্তি নেই কোথায়।

প্রথম আলাপে চমকে উঠেছিলেন মাধবী তাই। 'কাপুরুষ' করার সুবাদে প্রেমেন্দ্র মিত্রের তেলেনাপোতা পড়াও ছিল তার। যখন জানালাম আপনাকে অভিনয় করতে হবে আমার এই ছবিতে, তার চোখে বিস্ময়কর জিজ্ঞাসা।

—কোন্ চরিত্রে ? আমার করার মতো কোনো চরিত্রতো নেই ও গল্পে।

—মূল গল্পে নেই। কিন্তু আমার চিত্রনাট্যে আছে।

—তার মানে ?

—তার মানে, চরিত্রটা আমার তৈরি-করা। এবং আপনাকে মনে রেখেই।

—সে-আর কতো বড়ো চরিত্র হবে যে আমাকে দরকার ?

—যতটা বড়ো হলে আপনাকে সম্মানিত করা যায়, ততটাই।

মাধবীর বিস্ময়ের চোখে ততক্ষণে ফুরফুরে হাসির প্রলেপ। কী ধরনের উন্মাদের থপ্প্‌রে পড়েছে বুঝে নেওয়ার জন্যেই তার পরের প্রশ্ন,

—চরিত্রটা কী রকম একটু বুঝিয়ে বললেন ?

বলেছিলাম।

যে-পোড়ো বাড়িটায় মনিদা তার দুই সঙ্গীকে নিয়ে দিন কাটাবে, আপনি সেই বাড়ির বৌ। নাম দিয়েছি কমলা। শিক্ষিত পরিবারের মেয়ে। এম.এ. পাশ। ঘটনাচক্রে এই একদা-ধনী পরিবারে ঘটে গেছে বিয়েটা। আছেন অনেকটা খাঁচার পাখির মতো। খাঁচাটা ভাঙা-চোরা হলেও উড়ে পালাবার মতো ফাঁক নেই। স্বামী মদ্য এবং অন্য-মহিলায় আসক্ত। একটি মেয়ে আছে, ছোট্ট। মূল গল্পে বিজনের কোনো নির্দিষ্ট চেহারা নেই বলেই আমি তাকে বানিয়ে দিয়েছি কবি। ইমোশনাল। চাপা-রোমান্টিক। আপনার খণ্ডিত জীবনের কিছু ভগ্নাংশ চোখে পড়বে তার। বাকিটা সে বানিয়ে নেবে নিজের মতো করে। এইভাবেই তার মনের ভিতরে অর্ধেক বাস্তব আর অর্ধেক কল্পনা দিয়ে তৈরী হয়ে উঠবে কমলা বৌদি-র অর্থাৎ আপনার শ্বেত পাথরের ভাস্কর্যের মতো একটা আকর্ষনীয় মূর্তি। আপনি ছেয়ে থাকবেন তার স্বপ্নে, তার জ্বরের বিকারে। অবচেতনার মারফৎ সে জড়িয়ে পড়বে আপনার সঙ্গে প্রেমে। তার কোনো সময়ের স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক সংলাপের মাধ্যমে আপনি বুঝতে পারবেন আপনাকে সে মিলিয়ে নিয়েছে যোগাযোগের কুমু আর ডল্‌স হাউসের নোরা-র সঙ্গে। আত্মউন্মোচনের অন্তরায় এবং অসহায়তা আপনাকে আত্মহত্যার দিকে টেনে নিয়ে যেতে পারে এমন আশঙ্কায় সে চীৎকার করে উঠবে একবার নেশার ঘোরে। এমনকি একথাও দর্শকদের মনে হয়ে যেতে পারে যে, আপনার সান্নিধ্য পাওয়ার সুযোগটা মনে রেখেই তেলেনাপোতা ছেড়ে যাওয়ার সময় সে যামিনীকে জানিয়ে গেল বিবাহের সম্মতি।

'স্বপ্ন নিয়ে' করার সময় আমি নিজেই প্রগাঢ় প্রেমে জড়িয়ে পড়েছিলাম আমার অবচেতনের সঙ্গে। আর তার সবটাই বিজন ও কমলা বৌদির সম্পর্ককে কেন্দ্র করে। ছবির শেষাংশে জ্বরের ঘোরে ভুল-স্বপ্ন দেখছে বিজন :

জ্যোৎস্না রাতের বাগান। বাগানে বসে পিয়ানো বাজাচ্ছে কমলা।

স্বপ্নের বিজন হঠাৎ কোন্‌খান থেকে এসে দাঁড়াল তার সামনে। দুজনে চোখে চোখে হাসল। পিয়ানো ছেড়ে উঠে দাঁড়াল কমলা। বিজনের পাশাপাশি কোথায় যেন চলে যাবে।

পরের দৃশ্য

অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে একটা সিঁড়ি। মাটি থেকে সরাসরি উঠে গেছে নক্ষত্রের দিকেই বুঝি বা। বিজন এবং কমলা পাশাপাশি উপরে উঠে চলেছে ধীরে ধীরে। অদ্ভুত স্নিগ্ধ এক হাসি দুজনের মুখে। যেন কী এক স্বার্থকতার স্বাদ পেয়েছে বুঝি বা দুজনেই। উঠতে উঠতে অন্ধকারে হারিয়ে যাবে তারা।

পরের দৃশ্য

কমলা বৌদি যামিনীকে সাজিয়ে দিচ্ছে বিয়ের সাজে, নানা ভাবে। তারপর বিজন এবং যামিনী যখন বিয়ের সাজে মুখোমুখি, ওদের দুজনের অন্ধকার শূন্যতা ভেদ করে হঠাৎ ফেড ইন করবে কমলা। মুখে রহস্যের হাসি নিয়ে ওদের দিকে এগিয়ে আসতে আসতেই ফেড আউট।

আরও একটা দৃশ্য গ্রহনের ইচ্ছে ছিল আমার। বিজন তার স্বপ্নে হাঁটবে অথবা হাঁটছে যেন এক কমলা-বৌদিময় পৃথিবীতে। আমরা স্টুডিওর ভিতর তৈরি করতে চেয়েছিলাম কমলা বৌদিময় পটভূমি। কমলা বৌদির সাজসজ্জায় মাধবীর একটা বাছাই-করা স্টিল ফটোকে স্লাইড বানিয়ে প্রোজেক্ট করা হবে বিশাল একটা পর্দার উপর। সেই আবহ ছুঁয়েই হেঁটে যাবে বিজন।

কিন্তু তোলা গেলনা দৃশ্যটা। প্রথম গোল বাধল স্লাইড প্রোজেকটর। বন্ধু এবং অসম্ভব গুনী ফটোগ্রাফার আমিনুল হক্‌ তার চূড়ান্ত দারিদ্রের মুহূর্তে চল্লিশ টাকায় আমাকে বেচে দিয়েছিল সেটা। আমিও তাকে সাহায্যের কথাটা মনে রেখেই কিনেছিলাম, ব্যবহারের কথা ভেবে নয়। কারণ সেটা ছিল আমিনুলের নিজের হাতে বানানো নড়বড়ে, ধড়ধড়ে একটা কিম্ভুতকিমাকার বস্তু। তার লেন্স এমন শক্তিমান নয় যে তা দিয়ে আকাশ-পাতাল জোড়া, আসলে অরোরা স্টুডিও-র ফ্লোরের পক্ষে যতটা উচ্চতা আনা সম্ভব, একটা সাধারণ পর্দায় প্রক্ষিপ্ত করতে পারবে সাদা কালোর ঘনত্বময় এনলার্জমেণ্ট। আমরা কিন্তু সারাদিন ঐ মচকানো মেশিন আর জমকালো উদ্যম নিয়ে মেতে আছি। আমাদের

ভঙ্গীটা যেন ডু আর ডাই এর মতো। বিকেলের দিকে বড়দা ,অর্থাৎ স্টুডিওর কর্ণধার অজিত বসু পৌছলেন স্টুডিওয়। কেন জানিনা সেই সময়ে তিনি হয়ে উঠেছিলেন আমার যাবতীয় পাগলামির এক আন্তরিক পৃষ্ঠপোষক। বড়দা আমাদের পরিকল্পনার সব কথা শুনে পরামর্শ দিলেন, পর্দাটাকে জলে ভেজালে প্রজেক্টেড ইমেজের ডেপ্‌থ বাড়বে।

অমনি হোস্‌ পাইপ নিয়ে প্রোডাকসনের লোকেরা লেগে গেল পর্দা ভেজাতে। স্টুডিওর ফ্লোর জলে জলাকার। কিন্তু শেষ পরিণাম একই। অগত্যা ব্ল্যাকবোর্ডে ডাস্টার দিয়ে বাসী অঙ্ক মোছার মতো চিত্রনাট্য থেকে মুছে দিতে হলো দৃশ্যটা। বাস্তবে অসম্ভব, কিন্তু আমার অবচেতন দৃশ্যটাকে গড়েছিল রাজকীয় মহিমায়। সিনেমার পর্দায় কবিতা লিখতে চেয়েছিলাম আমি।

এই রকমই ঘটে আমাদের বেলায়, বার বার। আমাদের দেশে বলেই ঘটে হয়তো। লোকে বলে, চলচ্চিত্র উন্নত দেশের শিল্প। দুপায়ে নোটের তোড়ার নূপুর না বাজিয়ে হাঁটতে পারে না সে। যান্ত্রিক কলা-কৌশলের দশ রকম দাসী দশ দিকে দাঁড়িয়ে সেবা না করলে জীবন-যাপন মিথ্যে হয়ে যায় তার। কিন্তু আমরা তো লো-বাজেটের নিউ ওয়েভ। আমাদের বামনের হাত চাঁদের দিকে বাড়ালে হাতেরও লজ্জা, চাঁদেরও লজ্জা। যে দৃশ্যে বিজন এবং কমলা বৌদি বিস্তীর্ণ অন্ধকারের মাঝখানে এক আলোকিত সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে যাবে, তার জন্যে চেয়েছিলাম মাত্র ফুট চল্লিশেক উচ্চতার একটি সিঁড়ি। মাথার মধ্যে তখন ঘুরছে জীবনানন্দের এক দীপ্ত পংক্তি—

"একটি অমেয় সিঁড়ি নক্ষত্রের দিকে উঠে গেছে—।"

অবশ্য কল্পনার এই সব ফোলা বেলুনের চুপসে যেতে দেরী হয়নি খুব। কাজের সময় স্টুডিও-র সেটিং এর লোকেরা জানিয়ে দিলে, তাদের কাছে যা কাঠ-কাঠরা আছে তা দিয়ে মেরে-কেটে চোদ্দ ফুট উচ্চতার একটা সিঁড়ি তৈরী সম্ভব। অতএব ঘাড় গুঁজে চোদ্দ ফুটের চৌহদ্দীতেই নেমে এল অনন্তনক্ষত্রবিথীর সিঁড়ি। প্রথম ছবিতে প্রেমকে ঐ চোদ্দ ফুটের চেয়ে বেশী উঁচুতে তুলতে পারলাম না আর।

॥ ২ ॥

কবিতা-গল্প-উপন্যাস-ছবি-ভাস্কর্য এদের গায়ে বোধ হয় কোনো গন্ধ থাকে না। আর সিনেমার শরীরে সম্ভবত কোনো এক অজানা গন্ধের এমন অপরিহরণীয় টান, যা সর্বদাই মাতিয়ে রাখে সাংবাদিকদের। এই একটি বিষয়ে সাংবাদিকদের কৌতূহল ও প্রতিক্রিয়া মারাত্মক রকমের দ্রুত এবং দুর্বার। আর এই-সব কারণেই আমাদের দেশের জনগনও অধুনা শিল্প সংস্কৃতি বলতে সিনেমাকেই ঠাঁই দিয়েছেন সবার আগে। গৃহিনীদের এখন আর দ্বিপ্রহর কাটাতে হচ্ছে না 'চোখের বালি' বা 'বিষবৃক্ষ' পড়ে। সে স্বাদ তাঁরা পেয়ে যাচ্ছেন জনপ্রিয় চিত্রতারকাদের জীবনকাহিনী থেকে। সিনেমা-সাংবাদিকতার এই প্রভাব প্রতিপত্তির ফলে আমরাও লাভবান হয়েছি খুব। পুরোপুরি এবং পরিনত পরিচালক হয়ে ওঠার আগেই শিখে যাচ্ছি ভীষণ ভাবণের কায়দা-কানুন। পুরোপুরি পরিচালক হয়ে ওঠার আগে আমরাও বরাতে জুড়ে গিয়েছিল সাংবাদিক সাক্ষাৎকার।

—আপনার পরবর্তী ভাবনা ?

যেন আগে থেকেই টোটা ভরা ছিল বন্দুকে, সেইভাবেই ফেটে পড়ল উত্তর।

—একটা ট্রিলজী। 'স্বপ্ন নিয়ে'র পর 'প্রেম নিয়ে'। তারপর 'স্মৃতি নিয়ে'।

—কাদের কাহিনী ?

—'প্রেম নিয়ে' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শৈলজ শিলা' অবলম্বনে। আর 'স্মৃতি নিয়ে'র জন্যে আবার ফিরে যাবো প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাছেই, তাঁর 'ভস্মশেষ' গল্পের জন্যে।

ছাপার অক্ষরে এই সাক্ষাৎকার পড়ে জনৈক বন্ধু, যিনি একদিকে ঝানু সাংবাদিক অন্য দিকে ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের স্তম্ভস্বরূপ, একদিন রক্ত চক্ষু জ্বালিয়ে ধমকে উঠল হের হিটলারের ভঙ্গীতে।

—'শৈলজ শিলা' নিয়ে ফিল্ম করার কথা ভাবছো ?

—ইচ্ছে তো সেই রকম।

—মাথায় পোকা ঢুকেছে ? মার খেয়ে মরে যাবে যে।

—কেন ?

—ভুলে যেওনা এটা পশ্চিমবঙ্গ। তোমার যে সব বন্ধু-বান্ধব মুখে প্রগতিশীলতার বুলি কপচাচ্ছে, তারা বাংলা ছবির দর্শক নয়। একটা সিরিয়াস বাংলা ছবিকে বাঁচিয়ে রাখার মতো সংখ্যাগরিষ্ঠ নয় তারা! আর যারা গরিষ্ঠ সংখ্যক দর্শক, তাদের চিন্তা ভাবনার জগত মধ্যবিত্ত-মানসিকতার যাবতীয় অন্ধ সংস্কারে প্যাক করা। সেখানে 'শৈলজ শিলা'?

—কিন্তু ওতো প্রেমের গল্প?

—জানি হে জানি। গল্পটা আমার পড়া বলেই এত কথা বলছি। দর্শক যখন দেখবে প্রায় পিতৃতুল্য নায়ক কন্যার বয়সী নায়িকাকে দৈহিক সম্ভোগের কামনায় অস্থির, আর ঐ সম্ভোগ-তৃষ্ণাটাই ক্লাইমাক্স অব দা স্টোরী, টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবে পর্দা। এদেশ এখনও একটা বিষয়ে একান্নবর্তী পরিবার হতে চায়, আর সেটা ঐ সিনেমা দেখার বেলায়।

হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগোচ্ছিল চিত্রনাট্যের খসড়া। নির্ভরশীল বন্ধুর কণ্ঠস্বরে যুদ্ধকালীন সাইরেন-এর মতো সতর্কতা ধ্বনির ধমকে মন থেকে মুছে ফেলতে হলো সে-উদ্যম। তাহলে প্রেম নিয়ে ছবি করতে গেলে আমাকে বাছতে হবে এমন গল্প যা গরিষ্ঠ সংখ্যক দর্শকের শ্লীলতাবোধকে আক্রান্ত করবে না কোনো সময়েই। মসৃণ চিরুনীর মতো যা তাদের পরিপাটি করে গোছানো সংস্কার-বিকারের সিঁথি অথবা তেড়ির উপর দিয়ে আলতো হেঁটে যাবে কেবল, কোনো কিছু ঘেঁটে-ঘুঁটে তছনছ না করে।

মনে পড়ে গেলো মাত্র ক'বছর আগের কথা। সত্যজিৎ রায় হাত দিয়েছেন 'চারুলতা'-য়। স্টুডিও পাড়ায়, তথাকথিত মাতব্বর ডিসট্রিবিউটারদের মজলিসে মুখরিত আলোচনা: কলকাতা শহরে কে দেখবে মশাই ও-ছবি? দেওরের সঙ্গে বৌদির প্রেম। ছবি দেখে কোনো বাড়ির বৌ বাড়ি ফিরে তাকাতে পারবে তার দেওরের দিকে? স্বামী-স্ত্রী পাশাপাশি দেখতে পারবে ঐ ছবি? ইত্যাদি ইত্যাদি।

বাঙালী দর্শককে ধন্যবাদ। 'চারুলতা'র বেলায় তাঁরা অন্তত এই সব সংকীর্ণ আস্ফালনের মুখে থুথু ছিটিয়ে দিতে পেরেছেন যথাসময়ে।

'প্রেম নিয়ে' খোঁড়া হল আগে। এর একটু পরেই খোঁড়া হলাম আমি। ১৯৬৬-র মাঝামাঝি মুক্তি পেল 'স্বপ্ন নিয়ে'। কলকাতার

বাতাসে তুমুল হৈ-হল্লা তর্ক-বিতর্কের, নিন্দার, ধিক্কারের। লঘিষ্ঠসংখ্যক বন্ধুজনেরাই শুধু বিমুগ্ধ। গরিষ্ঠসংখ্যক দর্শক বিরক্ত এবং বিহ্বল। পত্র-পত্রিকার সমালোচনায় কোথাও হয়তো ফুলের ঘা, কিন্তু বেশীর ভাগটাই হাতের চড়-চাপড়। এইভাবে, রাধা এবং পূর্ণ চিত্রগৃহে মাত্র পাঁচ সপ্তাহের ক্ষণ জীবন কাটিয়ে 'স্বপ্ন নিয়ে' মরল। কিন্তু 'প্রেম নিয়ে' বেঁচে রইল আমার স্বপ্নে। রবি ঠাকুরের কবিতায় আমরা পড়েছি: 'ঘরেতে এলো না সে তো, মনে তার নিত্য যাওয়া আসা'। স্বপ্নে ছবির চিত্রনাট্য লেখা আর শুটিং করে যাওয়াটাও অনেকটা সেই রকম।

প্রধানত মলাট রচনার সূত্রেই একটু একটু করে বেশ একটা হৃদ্য সম্পর্ক জমে উঠেছে বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে। প্রায়ই আসা-যাওয়া তাঁর তখনকার রাসবিহারী এ্যাভিনিউ এর বাড়িতে। ইতিমধ্যে জেনে গেছি অকপট মন্তব্য প্রকাশের অবাধ স্বাধীনতা দিয়ে থাকেন তিনি একান্ত কনিষ্ঠকেও। সেই সাহসকে মাফলারের মতো মনে জড়িয়ে বলেই ফেললাম একদিন

—আপনার 'আমরা তিনজন' গল্পটাকে নিয়ে একটা ছবি করতে চাই। চলচ্চিত্রে কিন্তু ওর নাম হবে 'প্রেম নিয়ে'।

চলচ্চিত্র সম্পর্কে তিনি ছিলেন অনেকটা সন্ন্যাসীর মতো উদাসীন। ছবি যে একেবারেই দেখতেন না তা নয়। কিন্তু কবিতা, গান, সাহিত্য, শিল্পকলা প্রসঙ্গে যিনি নিয়তই আন্দোলিত নদী, সিনেমার বেলায় তিনিই যেন বৃক্ষ ইবো স্তব্ধ। হয়তো বা সাহিত্যের অন্তর্ভেদী গতি-প্রকৃতির সীমাহীন ক্ষমতাকে মনে রেখেই সিনেমার সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে সুনিশ্চিত আর তার অগ্রসরতা সম্পর্কে সন্দীহান ছিলেন তিনি। যদিও 'চ্যাপলিন' নামের অবিস্মরণীয় রচনাটি তাঁরই উদ্বুদ্ধ ও আভভূত ভাবনার সোনালী ফসল। আমার প্রস্তাবটাকে কিছুদিন মনের মধ্যে নাড়া-চাড়া করে একদা সম্মতি দিলেন, তবে সর্ত সাপেক্ষে। প্রধান সর্ত, চিত্রনাট্য রচনা করবেন তিনিই। আমি গররাজী। চিত্রনাট্য রচনায় সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চাইলাম আমি। তিনি অসম্মত। তখন সমরেশ বসুর 'বিবর' নিয়ে সারা দেশ জুড়ে তুমুল হৈ হৈ। তরুণ পাঠকদের মুখে, জিন্দাবাদ, সনাতনীদের মুখে মুর্দাবাদ। কোনো একটা উপন্যাস নিয়ে

এমন ভূমিকম্পের অভিজ্ঞতা আমাদের জীবনে সেই প্রথম।

বুদ্ধদেববাবু 'বিবর'-এর বিরুদ্ধে। আমি বা আমারা পক্ষে জেনেই একদিন জানালেন তাঁর উদ্বিগ্নতার উৎস। তাঁর আশঙ্কা, সাহিত্যের এই ফিচেল হাওয়ার প্রভাবে আমি হয়তো গল্পের তিনটি যুবকের মুখে এমনকিছু সংলাপ বসিয়ে ফেলব যাতে ভালগারিটির আঁশটে গন্ধ। এমনকি 'শালা' শব্দের ব্যবহারেও আপত্তি জানালেন তিনি। প্রতিশ্রুতি দিলাম, যুবক তিনটিকে সমসাময়িক করার জন্যে যে-জাতীয় সংলাপ নিতান্তই জরুরী, তার বাইরে এমন কোনো মাত্রা যোগ করব না যাতে ভালগারিটির অনুপ্রবেশ ঘটে। তিনি মোটামুটি সম্মতি দিলেন। কিন্তু কপালদোষে সে চন্দনের কৌটাও চড়-বড় করে ফেটে গেল।

এই প্রসঙ্গে, সাংঘাতিক জরুরী না হলেও, দুটো-একটা কথা বলতে ইচ্ছে করছে আরো। বুদ্ধদেব বাবু কোনদিনই রক্ষণশীলতার ছাতা মাথায় দিয়ে হাঁটেন নি। যখন সারা দেশ জুড়ে গো-হত্যা নিবারনের তীব্রতর আন্দোলন তখন তিনি নিজের বুদ্ধি-বিবেক এবং প্রাচীন শাস্ত্র ঘেঁটে আমাদের সঙ্গে গো-মাংস ভক্ষণের ঐতিহাসিকতা এবং উপযোগিতা নিয়ে আলোচনা করেছেন যুবকের মতো দৃপ্ত আবেগে। কিন্তু নিজের রচনার ক্ষেত্রে তিনি হয়ত ঠিক সেই সময়ে সাময়িক চাপল্যের উর্ধ্বে উঠতে চেয়েছিলেন। কলকাতার বাতাস যখন 'বিবর'কে নিয়ে মাতাল, এই-জাতীয় 'মরবিড' সাহিত্যের বিরুদ্ধে কথা বলতে বলতেই সাহিত্যে অশ্লীলতার স্বাদও হতে পারে কত চিরস্থায়ীরূপে সজীব, সেই সব সিদ্ধান্তকে নিজের রচনায় প্রমাণ করতে গিয়ে, তিনি শেষ পর্যন্ত যেখানে পা ফেললেন, সেটা তাঁর পক্ষে না হলো সম্মানের, না হলো সৃজন হিসেবে স্মরণীয়।

'আমরা তিনজন' গেল, এল সুনীলের জ্বলজ্বলে যৌবনের 'আত্মপ্রকাশ'। সুনীল আগে গল্প লিখতো না। লিখতো বরং শক্তিই। আমেরিকা থেকে ফেরার পর বিধাতাপুরুষ সুনীলের মাথায় পরিয়ে দিলেন এমন মুকুট যাতে তিনটে মূল্যবান রত্ন। প্রথমটার নাম দারিদ্র, দ্বিতীটার নাম দুর্দান্ত প্রেম. তৃতীয়টা গল্প লেখার সাহস। দারিদ্রকে লাথি মারার মরীয়া তাগিদেই সুনীল হাতে তুলে নিল গল্পের কলম। আর প্রেম নামের স্বাতী-নক্ষত্রই হয়ে উঠল তার অফুরাণ লিখে যাওয়ার প্রেরণা।

সুনীলের প্রথম উপন্যাস 'আত্মপ্রকাশ' আর আমার প্রথম চলচ্চিত্র একই বছরের ঘটনা। সুনীল কথা দিল এ উপন্যাস নিয়ে আর কাউকে ছবি করার অনুমতি দেবে না। কিন্তু দুর্ভাগ্য, অমন তরমুজের মতো তাজা প্রেমের কাহিনীকেও পৃষ্ঠ-পোষকতা করার মতো প্রযোজক জুটলনা কপালে। হয়তো জুটতো, যদি 'লাভ স্টোরী' জাতীয় কোনো হিট ফিল্ম তখন দেখানো হতো কলকাতায়। আমাদের দেশের গড়-পড়তা প্রযোজকেরা নিজেদের বোধ-বুদ্ধির চেয়ে অন্যের কোনো সাফল্যের অনুকরণেই বেশী আগ্রহী।

এরপর একটানা পাঁচ বছর ছবি-করার ইচ্ছে-আকাঙ্ক্ষার বাঘটাকে খাঁচায় পুরো রাখা। ছ'বছরের মাথায় রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র' নিয়ে আবার ফিল্মের শ্যাওলা-পড়া চাতালে ফিরে আসা। যে-ভাবে তিনবছর ধরে হাজার রকমের হতাশা, বিপর্যয় আর অর্থসমস্যার অন্ধকার সাঁৎরিয়ে ছবিটা শেষ করা, পঙ্গুর পক্ষে পর্বত ডিঙোনো বোধ হয় তার চেয়ে ঢের সহজ। শুরু করার চার বছরের মাথায় মুক্তি পেল 'স্ত্রীর পত্র'। পাড়াগাঁর মুশকিল-আসান ফকিরের জোড়াতালি দেওয়া আলখাল্লার মতো এই ছবিটা যে কোনদিন মুক্তি পেয়ে আমাদের অশ্রু, ঘাম আর স্বপ্নকে সফল করবে, তা স্বপ্নেও আশা করিনি। 'স্ত্রীর পত্র'-র সর্ববিধ সার্থকতার ফলে পরের ছবির প্রযোজক পেতে কাঠ-খড় পোড়াতে হলনা খুব বেশী। কিন্তু ঐ সার্থকতার ঘোরটাই হয়ে উঠল পরের ছবির ব্যবসায়িক-ব্যর্থতার আসল কারণ।

পরের ছবির মূল কাহিনী ছিল সমরেশ বসুর ছোট গল্প 'ছেঁড়া তমসুক'। বেশ জমিয়েই তৈরি করেছিলাম চিত্রনাট্য। কিন্তু হঠাৎ একদিন মাথার মধ্যে ঢুকে পড়ল একটা ঘুন পোকা। নিজেকে মনে করলাম বার্গম্যান ফেলিনীর ভায়রা ভাই। আর সেই গোপন আত্মঅহমিকাই আমাকে টেনে নিয়ে গেল সর্বনাশের রাস্তায়। নিজের বিরুদ্ধে এক সুগভীর ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে পড়লাম আমি। চিত্রনাট্যের খাতা থেকে ছিঁড়তে লাগলাম শুধু সেই সব দৃশ্য যার মধ্যে রয়েছে প্রেম, একটি নারীর প্রতি অভিন্ন-হৃদয় তিন বন্ধুর ভিন্ন ভিন্ন মুহূর্তের সংগোপন ও হৃদয়-নিংড়োনো ভালোবাসার দৃশ্যাবলী।

তীরে পৌঁছে নৌকাডুবি হলে যেমন হয় সেইভাবেই মার খেল

'ছেঁড়া-তমসুক'। সব দর্শকেরই এক অভিযোগ, যে ভালোবাসাকে কেন্দ্র করে এই ট্রাজেডী তাতে ভালোবাসাটাই অনুপস্থিত। এমনকি এ-মত সত্যজিৎ রায়েরও, ছবি দেখার পর। একদিন যখন একটানা সাত ঘণ্টা আলোচনায় বসেছিলাম তাঁর সঙ্গে, তিনি বলেছিলেন: প্রথম একঘণ্টা 'ফ্ল-লেস'। তারপর থেকেই গণ্ডগোল। পরে নিজেও হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি, কী ভুল করেছি চিত্রনাট্য থেকে ভালোবাসার দৃশ্য গুলোকে বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে। পঞ্চদশী থেকে পূর্ণিমায় পৌঁছনো প্রেমের গায়ে বিধবার থান পরানোর অপরাধে মনে মনে নাকে খৎ দিয়ে চলেছি এখনো।

॥ ৩ ॥

বিদেশের ছবিতে প্রেমের অঢেল উদ্দীপনা। কখনো তা ঢলে পড়ছে নিছক ব্যবসায়িক মুনাফা-লুণ্ঠনের তাগিদে ভালগারিটির দিকে। কখনো প্রেম হয়ে উঠেছে সামাজিক অবক্ষয়-উন্মোচনের সবচেয়ে অনুকুল উপককণ। প্রেম রয়ে গেছে এই দুয়ের বাইরেও। সেখানে প্রেমের জন্যেই প্রেম। রোমাণ্টিক বিলাসিতাই আসল অভিপ্রায়। কিন্তু আমরা যদি শুধুমাত্র সেই জাতীয় ছবির দিকেই নজর পাততে যাই যেখানে প্রেমের পিছনে টাঙানো রয়েছে আধুনিক সভ্যতার মর্মান্তিক সংকটের পটভূমি, তারও দৃষ্টান্ত মিলবে অজস্র।

অ্যালা রেনে-র 'হিরোসিমা মন্ আমুর' প্রথম যখন দেখি, আমাদের অভিজ্ঞতায় ভূমিকম্পের কাঁপুনী লাগে। ছবির আরম্ভ হয় দুটি নর-নারীর সঙ্গমরত অবস্থার কথোপকথন দিয়ে। আমরা চরিত্র দুটির চোখ মুখ হাত-পা দেখতে পাইনা কিছুই। ক্যামেরা স্থির হয়ে থাকে তাদের শরীরের মধ্যবর্তী অংশের নগ্ন উত্থান-পতনের উপর। পুরুষটি জাপানী আর্কিটেক্ট। মহিলাটি ফরাসী অভিনেত্রী। জাপানে এসেছে শান্তি-আন্দোলনের উপর এক সিনেমার শুটিং-এ। দুজনেই বিবাহিত এবং বিবাহিত জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন। মহিলাটির জীবনের অভিজ্ঞতা আরও তীব্রতররূপে বেদনাদায়ক। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সে ভালোবেসে ফেলেছিল এক নাৎসী সৈন্যকে। পরিনামে প্রচণ্ড শারীরিক নির্যাতন সইতে হয়েছে তাকে।

এই দুই চরিত্রের সঙ্গমকালীন কথোপকথনের মাধ্যমে আমরা শুনি, মহিলাটি বলে চলেছে হিরোসিমার বীভৎস-বর্বর ধ্বংসের কতখানি দেখেছে সে। তার দেখার সূত্রেই পর্দায় ভেসে ওঠে হিরোসিমার অসহ্য এবং অবর্ণনীয় ধ্বংস-মৃত্যুর আতঙ্কময় দৃশ্যাবলী। আর মহিলাটি থামলেই পুরুষটি কবিতার রিফ্রেনের মতো বারবার বলে যায়: না, কিছুই দেখো নি তুমি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের নাটকীয় পটভূমিকায় ব্যক্তিগত প্রণয়-সমস্যার সঙ্গে সভ্যতার অন্তর্গত সংকটকে মিলিয়ে 'হিরোসিমা মন্ আমুর'-কে মনে হয়েছিল আধুনিক প্রেমের এক দীর্ঘ কবিতা যেন।

সুস্থ প্রেমের আর এক রূপ দেখেছি গৃহ-যুদ্ধে-মগ্ন পোলাণ্ডের এক অসুস্থ সময়ের পরিমণ্ডলে, ভাইদা-র 'এ্যাসেজ এ্যাণ্ড ডায়মণ্ড-এ'। দুটি যুবক-যুবতী হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছে শহরের উপকণ্ঠে। যুদ্ধের খড়্গের ঘায়ে ভাঙা একটা গীর্জা। কাঠের তৈরী ক্রাইস্টের দেবোপম মূর্তিটা ধ্বসে পড়েছে নিজের মহিমার আসন থেকে। এখন তাঁর পা দুটো শূন্যে, মাথাটা নীচে। বৃষ্টি হয়ে গেছে একটু আগে। ক্রাইস্টের চোখ বেয়ে ঈশ্বরের নিভৃত কান্নার মতো বৃষ্টির ফোঁটা একটা একটা করে গড়িয়ে পড়ছে মাটিতে। চার্চের পবিত্র বেদীতে তারা খুলে রাখে তাদের ভিজে জুতো। চার্চের ধ্বংসস্তূপের ভিতরে তারা ঘুরে ঘুরে জীবনের মানে খোঁজে যেন। তারা কবিতা পড়ে। চুম্বনে লিপ্ত হয়। প্রেম তাদের আত্মার ভিতরে বুনতে থাকে সুগন্ধী উদ্যান। মৃত্যু এবং বিচ্ছেদ অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে বাইরের অন্ধকারে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত এমন সব সংখ্যাতীত ছবি দেখেছি আমরা যেখানে প্রেমের ভূমিকা বিরাট। সে সব ছবি আমাদের অনুভূতি-তরঙ্গে আছড়ানো ঢেউ-এর মতোই পৌঁছে দিতে চেয়েছে একটিই মূল্যবান সংবাদ, প্রেমের মৃত্যু মানেই সভ্যতার মৃত্যু। চেক 'রোমিও-জুলিয়েট এ্যাণ্ড দা ডার্কনেস' যেন এই জাতীয় ছবির প্রতীক।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম একজন সিনেমা-সচেতন এবং সভ্যতা-সচেতন পরিচালকের নাম যে গদার তা আর আমাদের অজানা নয়। রাজনীতি তাঁর চায়ের কাপ। রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি যে আপোসপন্থী নন, বরং একটু বেশি মাত্রায় উগ্রপন্থী, সেটাও সর্বজনবিদিত। এই গদারেরই একটি ছবির নাম 'ম্যাসকুলিন ফেমিনাইন'। ছবিটির

প্রসঙ্গে গদারের নিজের মন্তব্য—

"Let's say that it speak of youth, but it is a piece of music, a ''Concerts on youth'......it's all musical notes, it's music, whereas in novel's, the words are young, but the meaning is not necessarily youth."

'কনসার্ট অন ইয়ুথ' না বলে 'কনসার্ট অন লাভ'ও বলতে পারতেন তিনি। কখনো কখনো বলেছেনও। এমনকি এও হতে পারতো তাঁর সব ছবিরই একটাই নাম, 'ম্যাসকুলিন ফেমিনাইন'। তাহলে হয়তো অর্থহীনও হতোনা কারণ সমকালীন যুবক-যুবতীর মানসিকতাকে বিভিন্ন ভঙ্গীতে, বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে 'সারভে' করে যাওয়াটাই তো তাঁর আবহমান সিনেমা-চর্চার প্রধানতম এবং প্রিয়তম বিষয়। তাঁর প্রায় সমস্ত ছবিরই মূল কেন্দ্রে প্রেম। প্রেমেরই শূন্যতা, শীতলতা, অর্থহীনতা, মৃত্যুমুখী-নতার সঙ্গে প্রেমেরই সৃজনশীলতা, সজীবতা, জীবন অথবা সংগ্রামমুখীনতার, সংঘর্ষ ; এইই যেন তাঁর সমস্ত রচনার আদি বীজ, মূল মন্ত্র। তাঁর ছবিতে ভালোবাসাবাসির সম্পর্ক নির্মাণে লিপ্ত দুটি যুবক-যুবতীই হয়ে ওঠে এমন এক ঝকমকে আয়না, যার মধ্যে তিনি সহজেই প্রতিফলিত করতে পারেন বাইরের জর্জর, অসুস্থ, উদ্‌ভ্রান্ত সময়ের প্রতিচ্ছবি। তাঁর চলচ্চিত্রের অভিধানে ভালোবাসা অথবা প্রেম শব্দটিরই প্রতিশব্দরূপে ভরা থাকে পৃথিবীর পক্ষে ব্যবহারযোগ্য যাবতীয় শব্দাবলী। আর ভালোবাসা সংক্রান্ত প্রশ্ন তাঁর সংলাপে ফিরে আসে বারবার, ভালোবাসারই গভীরতর সত্যসন্ধানে। কয়েকটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত :

১। 'ম্যাসকুলিন ফেমিনাইন' থেকে

মাদলেন (অফ্‌) : তোমার কাছে পৃথিবীর কেন্দ্র কোনটা ?

পল : পৃথিবীর কেন্দ্র !

মাদলেন (অফ্‌) : হ্যাঁ।

পল : মজার প্রশ্ন। মনে হচ্ছে এর আগে আমরা কেউ কারো সঙ্গে কথা বলিনি, এই প্রথম বলছি, এমনভাবে এই অবাক-করা প্রশ্নটা করলে (পল একটু হেসে নেয়)।

মাদলেন (অফ্‌) : না, আমার তো মনে হয় একটা সাধারণ প্রশ্ন।

পল : তা বটে।

মাদলেন (অফ্‌) : তাহলে উত্তর দাও!

পল : সেটা…ভালোবাসা, আমার মনে হয়।

২। 'পিয়ের লে ফু' থেকে, গদার যে-ছবিতে আঁকতে চেয়েছেন পৃথিবীর শেষ রোমাণ্টিক দম্পতী।

ফরাসী-না-জানা একজন আমেরিকান চিত্রপরিচালকের সঙ্গে কথা হচ্ছে ছবির নায়ক ফার্দিনান্দ-এর, জনৈকা বালিকার মাধ্যমে। পরিচালক জানালেন তাঁর ছবির নাম 'ফ্লাওয়ার অফ ইভল'

ফার্দিনান্দ : বোদলেয়ার! বাঃ বেশ। তবে আমি জানতে চাইছি ছবির নির্দিষ্ট বিষয়টা কি?

বালিকাটি ইংরেজীতে অনুবাদ করে কথা জানাল আমেরিকান পরিচালককে। পরিচালক উত্তর দিতে গিয়ে প্রথমেই উচ্চারন করলেন

—লাভ।

আর একেবারে শেষে

—ইমোশন।

মাঝখানে হেট, এ্যাকশন, ভাযোলেন্স।

গদার মাঝের এই এই বাক্যগুলিকে এমনভাবে সাজান যেন মনে হয় এরা সবাই ভালোবাসারই গর্ভজাত সন্তান-সন্ততি বুঝি।

৩। 'আলফাভিল' থেকে

ছবির একেবারে শেষ দৃশ্য। নাতাশাকে 'আলফাভিল'-এর মৃত্যু-জঠর থেকে উদ্ধার করে লেমি রাত্রির অন্ধকারে গাড়ি চালিয়ে চলেছে পৃথিবীর দিকে। এক সময়ে নাতাশা-র প্রশ্ন—

নাতাশা : তুমি বড় অদ্ভুত ভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছ। মনে হচ্ছে আমার কাছে থেকে কিছু শুনতে চাইছো তুমি।

লেমি : হ্যাঁ।

নাতাশা : কি বলার আছে আমি জানিনা। অন্তত তার ভাষাটা জানা নেই আমার। কখনো শিখিনি। প্লীজ হেল্‌প মি…

লেমি : অসম্ভব, রাজকুমারী। তোমাকে নিজেকেই শিখতে হবে! আর একমাত্র তখনই বাঁচবে তুমি। যদি না পার…আলফাভিলের মৃতদের সঙ্গে মিশে যেতে হবে তোমাকে।

নাতাশা :   …আমি…

…ভালোবাসা…

…তোমাকে…

আমি তোমাকে ভালবাসি।

ছবি শেষ হয়।

॥ ৪ ॥

ভারতবর্ষ কিংবা পশ্চিমবঙ্গের সিনেমায় প্রেম দুই প্রকার। উলঙ্গ এবং লজ্জাবতী। তথাকথিত রগরগে স্পেকটাকুলার ছবিতে, যা প্রধানত মুনাফা-লুণ্ঠনের তাগিদেই তৈরী, সেখানে লেবু চটকিয়ে ভালগারিটিতে না-পৌছনো পর্যন্ত স্বস্তি নেই যেন। ঐ জাতীয় ছবিতে প্রেমকে হতে হবে অবিশ্বাস্য, অলৌকিক, অকারণ অশ্রুজলে সিক্ত, অযৌক্তিক কারণে সন্দেহভারাতুর, অনর্থক ভাবালুতায় অসুস্থ, অবিরল নাচে-গানে-তরবারিযুদ্ধে বিকৃত, অর্থহীন সংলাপে আক্রান্ত। সেখানে প্রেম যখন ট্রাজেডীর উৎস, হাস্যকর। প্রেম যখন কমেডীর উপকরণ, ট্রাজিক। ভালোবাসার ভাগ্যটাই মন্দ, কেননা একটা নাসপাতিরও পচতে যতটা সময় লাগে, তার চেয়ে অনেক কম সময়ে ভালোবাসাকে পচিয়ে নষ্ট করতে পারি আমরা, আমাদের অগভীর জীবনবোধের অক্ষমতার দারুন দাপটে। হেমেন্তের অরুণাবরণ অমল আকাশের দিকে তাকিয়ে একদা বোদলেয়ার উচ্চারণ করেছিলেন যে-জাতীয় অভিজ্ঞতা, ভারতীয় সিনেমায় আসল প্রেমের ধ্বংসাবশেষের দিকে তাকিয়ে আমাদেরও বলার কথা হয়ে যায় সেটাই—

'অথচ সিন্ধুর মতো দুলে ওঠে আমার বিষাদ,

এবং ভাঁটার টানে রেখে যায় কর্কশ লবণ

অধরে স্মৃতির জ্বালা, কর্দমের পিচ্ছিল আস্বাদ।”

অথবা মনে পড়ে যায় ব্রেশটের সেই কবিতা যার নাম 'একটি তরুণীর উদ্ঘাটন'। বেচাকেনার পণ্য-হিসাবে ব্যবহৃত হতে হতে এক প্রতারিত নারীর মূর্তি উদ্ঘাটন করতে গিয়ে নিজেকে প্রতারক সমাজের প্রতিভূ সাজিয়ে বিরাট ঠাট্টার সুরে তিনি বলে ওঠেন—

“আর শুধু এক রাত্রি থাকবো করেছি অভিপ্রায়

তোমার সময়টুকু চরিতার্থ করো এ-সুযোগে।"

আমাদের ইন্দ্রিয়-লিপ্সাকে লালায়িত করার জন্যে প্রেম নয়, প্রেমের ক্লেদজ উপকরণে ভরা তথাকথিত ব্যবসায়িক ছবিতে অদৃশ্য আমন্ত্রণ-লিপির ভাবটাও যেন যে, এসো! এক রাত্তিরের সময়-সুযোগকে চরিতার্থ করে নাও যাবতীয় নগ্ন দৃশ্যের সঙ্গে দৃষ্টির সঙ্গমে।

এ হলো চাঁদের অন্ধকার পিঠের ছবি। এবার আলোকিত পিঠটির দিকে অর্থাৎ প্রগতিশীল ছবিতে প্রেমের প্রতিকৃতিটা কী রকম সেদিকে তাকানো যাক।

আগেই যেহেতু বলা হয়ে গেছে ভারতীয় ছবিতে প্রেমের দু-প্রকার চরিত্রের কথা, সেহেতু উলঙ্গ-র উল্টোদিকটাই আলোচ্য। ভনিতা এড়িয়ে সোজা-সাপটা বলতে গেলে প্রগতিশীল ছবিতে প্রেম সত্যিই আড়ষ্ট, দীপ্তিহীন, এক লজ্জাবতী নারী। সে-নারী যদি প্রোজ্জ্বল এবং প্রগল্ভা হয়েও ওঠে কোনো ছবিতে তৎক্ষণাৎ তার মাথায় পরিয়ে দেওয়া হবে সমাজ চেতনার লম্বা ঘোমটা। কেননা ছবির বিষয় প্রেম, এমন ছেঁদো বাক্য উচ্চারণ তাদের পক্ষে অসম্ভব। এমনকি ঐ ঘোমটার ভিতরে খ্যামটা নাচ হলেও পরিচয় দেওয়ার সময় খ্যামটা-র কীর্তি-কলাপটা থেকে যাবে উহ্য, ঘোমটার বর্ণনাই হয়ে উঠবে ঘনঘটাময়।

দেশ-বিদেশে বাংলায় সমাজ-সচেতন এবং ইংরেজিতে 'কমিটেড' উপাধিতে ভূষিত এমন একজন পরিচালকে আমরা জানি মোটামুটি ভাবে যাঁর সব কটি প্রধান ছবির বিষয়ই হল নারীর প্রতি পুরুষের দুর্বার এবং অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ। সময়ের পটভূমিকা হিসেবে সেই কারণেই তিনি বেছে নেন—ফিউডাল যুগ। ছবির প্রধান চরিত্র গুলি কোনো না কোনো পরস্ত্রীর উপর বলাৎকারের বাসনায় উত্তেজিত বলীবর্দের মতো উন্মত্ত। তথাপি সে-সব ছবির সম্পর্কে প্রেম উচ্চারণ করা অপরাধ, সামাজিক অসাম্যের উদ্‌ঘাটনটাই শ্রেয় ব্যাখ্যা। এর সঙ্গে তৃতীয় বিশ্বের শোষণ জুড়ে দিতে পারলে সোনায় সোহাগা।

আমাদের দেশে হাল-আমলের হাওয়াটা এইরকমই। এখানে গল্পে, কবিতায়, উপন্যাসে, ছবিতে, এবং ভাস্কর্যে প্রেমের আসা-যাওয়ার জন্যে সদর দরজা সদাসর্বদাই অবারিত। কিন্তু সিনেমার ঢুকতে গেলে যেন খিড়কী-দরজা। এর কারণটাও অবশ্য বিচার্য। প্রধান কারণ

রাজনৈতিক চেতনা-সম্পন্ন পরিচালকদের উপর্যুপরি আবির্ভাব। উপরন্তু আমাদের দেশ দরিদ্র। অনগ্রসর। শীতকালের কুয়াশার মতো কলোনিয়ালিজমের হ্যাং-ওভার এখনো জড়িয়ে আছে এদেশের রক্তে-মাংসে বুদ্ধি-বিবেকে। সুতরাং, এই রকম আধা-সামন্ততান্ত্রিক, আধা-ধনতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোয় দারিদ্র এবং শোষনই যে শিল্প সংস্কৃতির স্বাভাবিক উপকরণ হয়ে উঠতে চাইবে, তাতো সন্দেহাতীতই। তবুও প্রশ্ন থেকে যায় কিছু।

দারিদ্র্য ইত্যাদির পক্ষে আসে স্টার্ক রিয়ালিটির যুক্তি। স্বীকার্য। কিন্তু প্রেমই বা স্টার্ক রিয়ালিটির অংশ হওয়ার পক্ষে অযোগ্য কেন? অপ্রেমে কেই বা বাঁচে এবং বেচে সুখী? দারিদ্র এবং সামাজিক শোষণের সঙ্গে প্রেমের অন্তর্লীন কোনো সম্পর্ক নেই বুঝি? প্রেম বুঝি সমাজ ছাড়া অন্য কোনো মহাকাশের পাখি? যারা প্রেম করে, প্রেমের সমস্যায় জ্বলে, তারা বুঝি এদেশের নাগরিক নয়, অন্য কোনো গ্রহ থেকে গড়িয়ে আসা উদ্বাস্তু?

প্রেমের সঙ্গে নারীর সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। সেই কারণে, স্বভাবতই, প্রেমের সমস্যার নারীর ভূমিকা বিরাট। আমরা কি করে ভুলে যাবো যে, শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের শৃঙ্খলমুক্তির সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে নারীর মুক্তি। আমরা জানি মার্কসবাদের ভাষায় অনুন্নত জীবন-যাপনে বাধ্য দরিদ্র শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ মানুষের আরেক নাম—সর্বহারা। যদি সর্বহারা-শ্রেণীর সম্পর্কে আমরা সহানুভূতিশীল হয়ে উঠতে চাই আমাদের শিল্পে, তাহলে নারীর সমস্যার দিকেও যে আমাদের ভিন্ন গভীর চোখে তাকাতেই হয়, তার কারণ এঙ্গেল্‌স এর ব্যাখ্যায়—পরিবার জীবনে পুরুষ বুর্জোয়া, নারী সর্বহারা।

"Today in great majority of cases the man has to be the earner, the breadwinner of the family, at least among the propertied classes, and this gives him a domestic position which requires no special legal privilage. In the family, he is the bourgeoies, the wife represents the proletariet."

এই মুহূর্তে আমাদের স্মৃতিতে যেন হঠাৎ-আলোয় ঝলসে ওঠে

ডলস্ হাউসের ছবি। মনে পড়ে যায় অভিজাত, সম্পন্ন, সর্বার্থে নোরার জীবন কত সহজে, উপার্জনক্ষম এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী পুরুষের একচেটিয়া কর্তৃত্বের ঘায়ে, এক পলকে যেন, ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গড়িয়ে যায় সর্বহারার শূন্যতায়। এই দৃষ্টান্তের জমিতে পা রেখেই আমরা অনুভব করে নিতে পারি নাকি যে প্রেমের সমস্যাও 'সোশ্যাল সারভে'-র কাজ করিয়ে নিতে পারে আমাদের দিয়ে ?

প্রেম, সামাজিক এবং দৈহিক, এর যে-কোনোটাকেই যদি অস্বীকার করি, তাহলে একই সঙ্গে সমাজের এবং ব্যক্তির অগ্রগতি যে ব্যাহত হতে বাধ্য, কডওয়েল তাঁর 'স্টাডিজ এ্যাণ্ড ফারদার স্টাডিজ ইন এ ডাইং কালচার'-এ জানিয়ে গেছেন অনেক আগেই। ঐ বইয়ের 'লাভ' নামের স্বতন্ত্র অধ্যায়টি এমনই যুক্তি পরম্পরার ঘনত্বে বোনা, কোনো একটা আলগা স্তবক সেখান থেকে উপড়ে আনা অসম্ভবই নয় শুধু, অসম্পূর্ণ মনে হয় যেন। তবুও, মোটামুটি একটা ধারণা সৃষ্টির গরজেই, তিনটি বিচ্ছিন্ন অংশ উদ্ধৃত করছি এখানে।

১। "But 'Love'—unless we are to restrict the word to a specialised behaviour pattern dependent on the particular institutions of matrimony and property of our period of history—is man's name for the emotional element in social relations.···If our definition of love is correct, it is true that love makes the world go round. But it would be rather truer to say that the society going round as it does, make love what it is."

২। "Both popular and philosophic thought has recognised these deep foundation of Love. Popular thought has given the same name to the affective tie that binds man and woman sexually, man and man, in friendship, and parents and child, in family relationship. A King's love for his people, a disciple's love for his teacher, an animal's love for its young and

its master, have all been included in one category in spite of obvious differences. It is no accident that all the great religious have moved men's mind have spoken so much of love."

৩। "Sexual love is not a luxury, existing only for itself, but it returns again into social relations from which it sprang, making them different to what they are.···The coming of sexuality breakes the state routine of habit. It is therefore the genesis of individuality within the ambit of society."

কডওয়েল এই প্রসঙ্গকে টেনে নিয়ে গেছেন আরও বৃহৎ ব্যাপ্তিতে। প্রেমের সঙ্গে মৃত্যু-চেতনার আত্মীয়তার প্রসঙ্গও উত্থাপন করতে ভোলেন নি তিনি, যার শিকড় ছড়িয়ে আছে পৃথিবীর সমস্ত প্রাচীন লোকগাথার অভ্যন্তরে, ত্রুবাদুর সঙ্গীতে, বৈষ্ণব গীতিকবিতায়। আর সে মৃত্যু-ইচ্ছার মূল এই নয় যে জীবনের অথবা প্রেমের ব্যর্থতাকে মেনে নিয়ে পরাজয়ের গিলোটিনে মাথা পেতে দেওয়া। বরং উল্টোটাই। দ্বিতীয়বার আরও পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বময় ভাবে নবজীবনলাভের ইচ্ছা। কডওয়েলের ভাষায়—

"The birth of a new personality demands the death of old."

পৃথিবীর প্রেমের কবিতায় সেই কারনেই আমরা বারবার শুনেছি এমন উক্তি যে, এক শরীরের অথবা এক জীবনের ভালোবাসা দিয়ে সম্ভব হচ্ছে না কাউকে ভালোবেসে সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত হওয়া। বৈষ্ণব কবিতায় তাই লাখো লাখো যুগ ধরে হিয়ে হিয়া রেখেও অতৃপ্তির ক্রন্দন।

শেকস্পীয়রের হ্যামলেট যখন আর্তনাদময় ভঙ্গীতে উচ্চারণ করে—

"Forty thousand brothers

Could not will all their quantity of love,

Make up my sum"

তখন বুঝে যাই এটা শুধুই নয় সংখ্যাতত্ত্বের হিসেব, এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন এক একক ব্যক্তিত্বেরই বহুবর্ণ বিচ্ছুরণের ইপ্সা, যেমন বহু কোন্ থেকে

; আলোর ঝিলিক তোলাতেই হীরের আসল সার্থকতা।

॥ ৫ ॥

মাত্র ক'মাস আগে কলকাতায় ঘটে গেল একটা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। কার্লো সাওরার 'ব্লাড ওয়েডিং' দিয়ে তার উদ্বোধন। একবাক্যে উৎসবের শ্রেষ্ঠ ছবি হিসেবে সম্মানিত হয়েছে সেটি। এবার প্রশ্ন করা যাক, কেন এমন সম্মানের পুষ্পবৃষ্টি? ছবির বিষয় কী দারিদ্র? না। সামাজিক শোষণ? না। রাজনৈতিক আন্দোলন? না। শ্রেণী সংগ্রাম? না। রূঢ় রুক্ষ কোনো বাস্তবতার, যাকে বলি স্টার্ক রিয়ালিটি, তেমন কিছুর আগ্নেয় প্রকাশ? না। তাহলে?

এ ছবির অবলম্বন লোরকার ঐ নামের নাটকটি। পরিচালক তাঁর ছবিতে আপাদমস্তক অনুসরণ করেননি নাটকটিকে। পরিবর্তে বেছে নিয়েছেন নির্ধারিত কিছু দৃশ্য আর সেটিকে দেখাচ্ছেন বিশেষ এক অপেরা-সংগঠনের নাচের মহড়ার মাধ্যমে। দৃশ্যপট নেই। সেট-সেটিং নেই। আলাদা করে আবহসঙ্গীতের আয়োজন নেই। বহির্দৃশ্য নেই। গ্রীনরুমে অংশগ্রহনকারী শিল্পীদের মেক-আপের নিজস্ব টেবিল, নিজস্ব খুঁটিনাটি আসবাব, কাঠের পাটাতনের রিহার্সাল-মঞ্চ যার একটা দেয়াল কাঁচের, এর বাইরে আর কোনো রকম 'প্রোপার্টি'-র প্রয়োজন হয়নি পরিচালকের; মহড়া দিতে দিতেই, আমাদের স্বাভাবিক প্রত্যাশার ধরা-বাঁধা রাস্তা এড়িয়ে ভীষণ নীরবে ঢুকে পড়েন গল্পের চূড়ান্ত মুহূর্তে, ঘটনার বিবর্তনের যৎসামান্য একটু আভাস দিয়ে। আর তার পরই শুরু হয় সেই উন্মোচন, যা এক রক্তাক্ত-সংঘর্ষের সঙ্গীতই বুঝিবা!

নাটকের মূল বিষয়? প্রেম। অথবা আর একটু বিস্তৃত বিশ্লেষণে, প্রেমজাত ঈর্ষা এবং অধিকারবোধে উদ্দীপ্ত দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর বোঝাপড়া, যার কেন্দ্রে রয়েছে দুজনেরই মনোনীত একটি নারী আর শেষ পরিণামে রয়েছে পারস্পারিক আক্রমণে উভয়ের রক্তস্নাত মৃত্যু। মাটি রক্তের স্বাদ পেতে বড় তৃষ্ণার্ত। যেন তার উর্বরাশক্তির অন্যতম নির্ভর এই রক্তবিন্দু। প্রাচীন লোকগাথা এবং মিউজিক্যাল ব্যালাড থেকেই লোরকা খুঁটে নিয়েছিলেন এর কাহিনী-সার। যেমন 'ইয়েরমা' তেমনি এই 'ব্লাড ওয়েডিং' দুয়ের বেলাতেই বাক্য-স্পন্দনের লিরিক,

আর নাটকীয়-স্পন্দনের ভাষার পিছনে রয়ে গেছে স্পানিশ-ঐতিহ্যের বিশাল পটভূমি, রয়ে গেছে উনামুনোর 'ট্রাজিক সেন্স অব লাইফ'। লোরকার নাটকে তাই সবচেয়ে তীব্র হয়ে দেখা দেয়—'Life's flashing mosaic face'-এর উপরে 'the essencial mask of death'.

কার্লো সাওরা তাঁর ছবিতে জোর দিয়েছেন মৃত্যুর ট্রাজিক মহিমার দিকেই, যা চেয়েছিলেন লোরকা। আর সেই বিপন্ন, অসহায়, অনুদ্ধারনীয় মৃত্যুর মহান শিল্পের ভিতর দিয়েই জীবনের গভীর মূলের আশা-আকাঙ্ক্ষার, সুখ-স্বপ্নের তীব্রতার স্বাদ পাইয়ে দেন আমাদের।

এ-ছবির, এমনকি যে-নাটককে কেন্দ্র করে এই ছবি, গঠন রিয়ালিটির নিয়ম মেনে নয়। নাটক নিয়ে প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর্বে 'সুররিয়ালিজম'-ই ছিল লোরকার প্রেরণা। পরের অধ্যায়েও নিছক বাস্তবতার প্রতি আনুগত্য দেখতে উৎসাহ পাননি তিনি। বরং বাস্তবতার নির্যাস নিয়েই গড়তে চেয়েছেন এক ভিন্ন বাস্তব। "he seems to reduce life to symbolic formula—"

কার্লো সাওরা-র এই অনন্যসাধারণ ছবি আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে গেল, স্টার্ক রিয়ালিটিই চলচ্চিত্রের পরমতম নির্ভর নয়। সে যেতে পারে বাহির-বাস্তবতাকে ভেদ করে ভিতর-বস্তাবতার আরও গূঢ় অভ্যন্তরে।

এইখানে পৌঁছে আমাদের হঠাৎ মনে পড়ে যায় আর এক রিয়ালিটির কথা। তাঁর 'টাইম এ্যাণ্ড কনসেন্স' নামের বইটিতে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ের নাম দিয়েছিলেন কোজিন্তসেভ—'উইঙ্গড রিয়ালিজম'। আলোচ্য বিষয় সেখানে অবশ্য সিনেমা নয়, এমনকি নয় নাটকও। কথাটা তুলেছেন শেক্‌সপীয়রের নাটকের দৃশ্যসজ্জা এবং চরিত্রদের রূপসজ্জা বিষয়ে। একজন শিল্পী তাঁর গভীরতর কল্পনার সাহায্যে কীভাবে নাটকের বাস্তবতাকে পৌঁছে দিতে পারেন কবিতার স্তরে, অথবা সঙ্গীতের মহিমায়, আলেকজাণ্ডার গ্রিগোরিয়েভিচ তাইসলার তাঁর নিজস্ব পেনটিং-এ এবং নাটকের দৃশ্যপট-রূপসজ্জা নির্মাণে শেকস্‌পীয়রের রচনার পিঠে কীভাবে জুড়ে দেন গভীর অর্থময়তার ডানা, কোজিন্তসেভের আলোচনা সেই রহস্যকে নিয়েই।

যে-আবেগ অথবা যে-সৃষ্টি-চাপ মানুষের নিজস্ব চিন্তা-পদ্ধতির মর্মমূল থেকে উৎসারিত নয়, তার প্রকাশে একটা ফাঁক বা ফাঁকি থেকে যেতে বাধ্য। আর নিজস্ব অভিজ্ঞতার চাপ থেকে নির্গত হলে একজন শিল্পীর যে কোনো সৃষ্টির পিঠেই আমরা দেখতে পাবো সেই ডানা, চল্‌তি-হাওয়া সাঁতরিয়ে যা উত্তীর্ণ হতে চায় অন্য কোনোখানে।

আমাদের দেশের আধুনিক চলচ্চিত্রের দিকে তাকালে, গোনা-গুন্‌তি কিছু ব্যতিক্রম বাদ দেওয়ার পর, যা গড়পড়তা সত্য হয়ে দাঁড়ায় সেটা হল সমাজ-বাস্তবতার প্রতি একটা কৃত্রিম আনুগত্য, যেহেতু এটাই এখন দেশে-বিদেশে সম্মান-অর্জনের সবচেয়ে সহজ পথ। অসম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা অথবা অল্প অভিজ্ঞতার সঙ্গে হয় অপরিমেয় কলাকৌশলের চাতুরী, নয়তো কাহিনী-অতিরিক্ত বক্তৃতাসুলভ সংলাপের ভেজাল দিয়ে এখন চলেছে প্রগতিশীল হওয়ার প্রতিযোগীতা। কিছুদিন এ রকম চলবে। এতে অবশ্য হতাশ হওয়ার কিছু নেই। কেননা এই মাৎসন্যায়ের ভিতর থেকেই দু'চারজন সত্যিকারের 'কমিটেড' চিত্রপরিচালকের আবির্ভাব ঘটবে। বাকীরা কিছুক্ষণের চরকি-নাচের পর কোনো এক সময়ের প্রবল ঝড়ে উড়ে যাবে শুকনো পাতার মতোই। উড়ে যে যাবেই, সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির পূর্ব-ইতিহাস থেকে তা জানা হয়ে গেছে আমাদের; কল্লোল-যুগের কথাশিল্পীদের দিকে তাকালেই জুটে যাবে নগদ প্রমাণ। তখন তো সকলেই কোমর বেঁধে মাটি, মানুষ এবং জীবনের রুক্ষ বাস্তবতার কাছাকাছি নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন সাহিত্যকে। কিন্তু তাঁদের কজন আজ স্মরণীয়? স্মরণীয় কেবল তাঁরাই যাঁরা সাময়িক হুজুগদের হাততালির মোহ কাটিয়ে, আপাত-সার্থকতার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে, নিজেদের নিয়ত স্বাস্থ্যবান রাখতে পেরেছিলেন জীবন ও সময়ের ভিতর শাঁস-জল সংগ্রহের শিকড় চালিয়ে।

॥ ৬ ॥

ছবির বিষয়-প্রেম, এমন সংবাদ শুনলে সমকালীন পরিচালক এবং উঠতি সমালোচকদের একটি বিশেষ শ্রেণীর চোখে কী ধরনের বিরক্তিকর ভ্রূকুটি দপদপিয়ে উঠবে তা সহজেই অনুমান করে নিতে পারি। এমনকি তাঁরা তৎক্ষণাৎ শিউরেও উঠতে পারেন প্রতিক্রিয়ার চক্রান্তে ও

প্রগতির পরাভবের আশঙ্কায়। কিন্তু সৌভাগ্যবশত তেমন ভয় ঝাপটা মারে না আমাদের পাঁজরে। কারন আমরা জানি যোগ্য শিল্পীর হাতে পড়লে প্রেমও হয়ে উঠত প্রয়োজনের ছবি। আবার অযোগ্যের হাতে পড়লে অপমৃত্যু ঘটতে পারে প্রগতীশীল বিষয়েরও। তাছাড়া রাজনীতি, দারিদ্র, সামাজিক শোষণ এবং প্রেম এগুলোকে গুচ্ছ থেকে ছিঁড়ে স্বতন্ত্র বিষয় করে তোলার ভাবনাটাই মারাত্মক ক্ষতিকর। মূলত এরা একই কমলালেবুর কোয়া, যদি কমলালেবুটাকে ধরে নিই আমাদের এই পৃথিবী, অথবা সময়। একজন শিল্পীর কাছে জীবনের সঙ্গে যুক্ত কোনো কিছুই আলিঙ্গনের অযোগ্য হওয়ার কথা নয়। একটু তলিয়ে দেখলেই ধরা পড়বে সাহিত্য-শিল্পের ইতিহাসে মহীরুহের চন্দনতিলক পড়েছে কেবল তাঁদের ললাটেই, আকাশের সূর্য থেকে ধুলোমাটির ঘাস, এই দুয়ের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত কিছুকেই নিজেদের সৃষ্টির অন্তর্গত করে নিতে পেরেছেন যাঁরা। বৃহৎ শিল্পীর ঘাড়ের দায়টাও বৃহৎ। তাঁকে শুনতে হবে সমস্ত কিছুই, বেঠোফেন যেভাবে শুনেছেন এবং শোনাতে চেয়েছেন, যুদ্ধের গর্জন থেকে একটা ফিনফিনে পাখির কুজন পর্যন্ত সবই, যা কিছুর যুগ্মতায় পৃথিবী স্পন্দিত।

"তোমার নিকট থেকে সর্বদাই বিদায়ের কথা ছিলো
সব চেয়ে আগে , জানি আমি।"

এই দুই পংক্তি দিয়ে শুরু হয়েছে জীবনানন্দের 'সূর্যনক্ষত্র নারী' নামের কবিতা। আধুনিক ভারতীয় চলচ্চিত্রের দিকে তাকিয়ে এই বিলাপের অন্য এক অর্থ খুঁজে পাই যেন। প্রেমের বিসর্জনের প্রসঙ্গে মনে ঢুকে পড়ে।

অথচ 'আজ এই ধ্বংসমত্ত অন্ধকার ভেদ করে বিদ্যুতের মতো/ তুমি যে শরীর নিয়ে রয়ে গেছ'-এই কথা সময়কে জানাবার কেউ কোথাও না থাকলেও প্রেমকে এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে তবুও, কেননা তার অস্তিত্ব ঘোষণার কাজে অবিরল সৃজনে মেতে থাকা অন্য সব শিল্প-মাধ্যমের অভিজ্ঞতা নিয়তই সমৃদ্ধ করে যায় আমাদের মন ও মনন।

কার্ল মার্কসের প্রিয় কবি হাইনের যে-কলমে বিপ্লবের বজ্রনাদ, সেই কলমেই বিষণ্ণ এবং প্রশ্ন-জর্জর প্রেমের কবিতা। বিদ্রোহ-বিপ্লবের

নিরবচ্ছিন্ন-রচনার এক ফাঁকে নিজের স্ত্রীর জন্য 'ওয়ান হানড্রেড সনেটস্ অফ লাভ' লিখতেই হয় নেরুদাকে। বিপ্লবী চেতনার পক্ষে সবচেয়ে বড় সুযোগ সম্ভবত এটাই যে, ব্যক্তিগত প্রেমের সমস্যাকে তাঁরা মিলিয়ে দিতে পারেন দেশকালের ঝড়ে-ঝঞ্ঝায়, আত্মার নিভৃত সংকটকে ব্যাপ্ত করে দিতে পারেন রক্তক্ষতময় পৃথিবীর জলে-স্থলে, যেমন পেরেছেন আয়াগঁ, এলুয়ার, লোরকা এবং মায়াকভস্কিরা।

"যেমন বলা হয়
'ঘটনার এইখানে ইতি।'
প্রেমের নৌকো
স্রোতময় জীবনে লেগে ভেঙে গেল…"

এই শিরা-ছেঁড়া আর্ত উচ্চারণে শেষ চিঠি লিখে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছিলেন যে মায়াকভস্কি ব্যক্তিগত প্রেমের অচরিতার্থতার যন্ত্রণায়, সেই তিনিই কিন্তু আমাদের হাতে তুলে দিয়ে গেছেন ভালোবাসার এমন সোনালী চশমা, যা পরলে জীবনের বিরুদ্ধাচারী সমস্ত প্রতিরোধকেই চুরমার করার শক্তি ফিরে পাই যেন শরীরে।

"আমি বলশালী
আমাকে ওদের দরকার হতে পারে।
ওরা যদি আমাকে হুকুম দেয়:
"যুদ্ধে মরো"
তাহলে তোমার নাম
শেষ পযন্ত
গোলায় ছিন্নভিন্ন ঠোঁটে জমাট বেঁধে থাকবে।"

আমি বিশ্বাস করি, মানুষের আবেগ-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্ন-কল্পনায় সীমাকে প্রসারিত করে তোলাই শিল্পের কাজ। আর সেই দায়িত্ব পালনের কাজে আমি যে সবসময় বিপ্লবের বিউগল বাজাবো এমন নয়, বাজাতে পারি প্রেমের একতারাটাও।

পূর্ণেন্দু পত্রীর সঙ্গে গোপনে

দেখা হয়ে গেল হঠাৎ। এক আলো-নেভানো ঘরে। পৃথিবীতে তখন অনেক রাত। আকাশে অনেক মেঘ। ঝড়-জলের সম্ভাবনাময়। ঘরে ঢুকেই চোখে পড়ল, কেন্দ্রস্থলে বসে আছেন তিনি একটা বেতের চেয়ারে। নতমুখে। পিছনে সাদা ক্যানভাসে আঁকা একটা ভৌতিক শহরের ছবি। শুধু বাড়ি ঘর। মানুষ নেই। পরে, অন্ধকার চোখে সয়ে গেলে, বুঝলাম কলকাতার। দূরে আঁকা ছিল হাওড়া ব্রীজের চুড়ো। আরও নানাবিধ অদ্ভুত, বিচিত্র আসবাব সারা ঘরে ছড়ানো। একালের এবং অতীত কালের। স্টাচু, সোনালী ফ্রেমের পেনটিং, ময়লা হ্যারিকেন, ঝালর দেওয়া তালপাতার পাখা ইত্যাদি। সম্ভবত কোনো আগামী ছবির দৃশ্যসজ্জায় লাগবে। সমগ্র পরিবেশের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল সদ্যসমাপ্ত অভিনয়ের পর কোনো রঙ্গমঞ্চ। প্রধান চরিত্রটি এখনো গ্রীনরুমে ফিরে না গিয়ে বসে আছেন নিজের চেয়ারে। শেষ দৃশ্যে চেকভের আঙ্কল ভ্যানিয়া যেমন বসে থাকতেন তাঁর নিশ্বাসের সামনে নিঃশব্দে ঘটে যাওয়া সুবৃহৎ সর্বনাশের পর। আসলে অন্ধকারে বসে থাকা একলা পুরুষ চিরকালই শোকাবহতার প্রতীক।

দূর-আকাশের একটি ম্লান নক্ষত্র তাঁর মুখের সামনে জ্বলছিল এবং নিভছিল। মুখোমুখি বসতে গিয়ে বুঝলাম, ওটা নক্ষত্র নয়, সিগারেট।

আমার চেয়ার টানার শব্দেও তিনি মুখ তুলে তাকালেন না। মনে হল, ভদ্রলোক কিছুটা দাম্ভিক এবং অহঙ্কারী। হতে পারে। অধিক সম্মান পেলে অমন হয়। আমি গলা খাঁকারি দিলাম। তিনি সামান্য ঘুরে তাকালেন। বসতে ইংগিত করলেন চোখে।

—আপনিই তো পূর্ণেন্দু পত্রী ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আপনার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার খুব ইচ্ছে ছিল। এখন কি খুব ব্যস্ত ?

—ছিলাম। এখন আর নেই। বার্গম্যানের সঙ্গে কথা বলতে বলতে অনেক রাত হয়ে গেল।

—বার্গম্যান ? তিনি এসেছিলেন নাকি ?

—তা আসেন মাঝে মাঝে। খুব নিঃসঙ্গ এবং ঝাঁঝরা ঠেকলে ডাকি। অবশ্য আজ ডেকেছিলাম বিপন্ন হয়ে। একটা প্রশ্নের উত্তর জানতে।

—প্রশ্নটা জানতে পারি ?

—লোকে আজকাল প্রায়ই নানা প্রশ্নে বিব্রত করে। আপনার কমিটমেণ্ট কি, কার জন্যে ফিল্ম ইত্যাদি সব ভারী ভারী প্রশ্ন। আরও একটা অদ্ভুত ব্যাপার। যারা এইসব প্রশ্ন করেন, তাঁদের বয়সের কোনো ভেদ নেই। একেবারে দুধের বাচ্চা, কবি-কবি যুবক, মফঃস্বলের লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদক, চোস্ত ইংরেজী বলিয়ে সাংবাদিক, রাজনৈতিক কর্মী, ফিল্ম-সোসাইটির সদস্য, দুর্ধর্ষ বুদ্ধিজীবী, উচ্চপদস্থ অফিসার, সাধারণ সাংবাদিক, বামপন্থী সমালোচক সকলেই এই উত্তর জানার জন্যে ভয়াবহ-রকম ব্যগ্র ও উন্মুখ। যেন এই প্রশ্নের একটা জরুরী উত্তর পাওয়ার উপরেই নির্ভর করছে তাঁদের বাকি জীবনের কর্মসূচী। আমার মনে হয় এটা একটা সাংস্কৃতিক ফ্যাশান। সুকান্তর 'বিদ্রোহ আজ বিদ্রোহ চারিদিকে' রেকর্ড বাজিয়ে পূজো প্যাণ্ডেলে বেল-বটস পরে পপ্ নৃত্যের মত। বিপ্লব করি বা না-করি মৃণাল সেনের ছবিতে বিপ্লব দেখতে ছুটে যাওয়ার মত সোশ্যাল এ্যাওয়ারনেসের রিচ্যুয়ালও বটে। যাই হোক, ঐ জাতীয় প্রশ্নের উত্তর আমার মাথায় আসে না। অথচ লোকে আমাকে নির্বোধ ভাববে, এতেও লজ্জা। তাই ডেকেছিলাম।

—তিনি কি বললেন ?

—বললেন, এরকম প্রশ্নে আমাকেও বিব্রত হতে হয় প্রায়ই। বড় দুরূহ ও বিপজ্জনক প্রশ্ন এগুলো। আমি সাধারণত আসল কথাটাকে কৌশলে এড়িয়ে গিয়ে বলি, মানুষের জীবনের যা সত্য এবং সেই সত্যকে আমি যতটুকু বুঝি, সেটাকে প্রাকাশ করাই আমার উদ্দেশ্য। উত্তর পেয়ে খুব খুশী হয় তারা। কিন্তু আমার আসল উত্তরটা অন্য। যখন যা করার তীব্র ইচ্ছে অনুভব করি, সেটা করে ওঠাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্যে।

—পূর্ণেন্দুবাবু, যদি কিছু মনে না করেন, তাহলে বলি। আমিও কিন্তু আপনাকে এইরকম একটা প্রশ্ন করবো ভাবছিলাম। কেন চিত্র পরিচালক হলেন?

তাঁর বন্ধ চোখ দুটো দপ্ করে জ্বলে উঠল। কপালের রেখার ঢেউ গুণে বুঝতে পারলাম তিনি বিরক্ত।

—এ প্রশ্নের উত্তরে আপনার কি লাভ? আপনি কি কখনো শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে প্রশ্ন করেছেন, কেন তিনি কবি? সুনীল গাঙ্গুলীকে, কেন তিনি ঔপন্যাসিক? গল্প লেখা ছেড়ে দিয়ে সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় কৃত্তিবাসের মিনি বিজ্ঞাপনে নিজের রক্ত ছিটোচ্ছেন কেন? আপনি কি কোনো মন্ত্রীকে প্রশ্ন করেছেন, কেন তিনি মন্ত্রী? কোনো পুলিশকে, কেন পুলিশ? কোনো টপ্-একসিকিউটিভকে, কেন চাকরি? কোন অধ্যাপককে, কেন পড়ান? কিংবা কোনো মানুষকে, কেন তিনি কানকোরা মানুষ? করেননি। পৃথিবীর এত বিচিত্ররকম জীবিকার মানুষদের ছেড়ে শুধুমাত্র কয়েকজন চিত্র পরিচালককে দেখলেই কিছু সংখ্যক মানুষের বিবেক হঠাৎ এক মহৎ মানবিকতাবোধে অল্প জলের কৈ মাছের মত ছটফটিয়ে ওঠে কেন, এটা আমার কাছে এক ভীষণ রহস্য।

—আজ্ঞে, সাধারণত এই প্রশ্ন করেই সব ইন্টারভিউ শুরু হয় বলেই করলাম। আমি বিলেতী বইয়েও দেখছি।

—তাহলে আরও একবার বিলেতী বর্জন করে দেশী হোন। আমি মশাই ইন্টারভিউ-টিউ একদম পছন্দ করি না। ইন্টারভিউ আর বক্তৃতা। আজকাল ইন্টারভিউ নেওয়াটারও ফ্যাশন শুরু হয়েছে। ফ্যাশনেবল্ ইন্টারভিউ। যার সবটাই মায়া এবং মতিভ্রম। যা মিথ্যের

বাণ্ডিল। অতি সম্প্রতি এক বিখ্যাত সিনেমা ম্যাগাজিনে ছাপা হয়েছে জনৈকা প্রতিভাময়ী অভিনেত্রীর সাক্ষাৎকার। ঘরোয়া কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন: আমার স্বামী এবং সন্তান আমার হাতের রান্না ছাড়া খান না। এইটুকু পড়ে লোকে কি জানবে? জানবে, আহা! কী মধুর দাম্পত্য জীবন। যেন সানফোরাইজড্ সুতোয় বোনা। এতটুকু কুঁচকে নেই কোনখানে। তাইতো? অথচ এই অভিনেত্রীর সঙ্গেই মাত্র কিছুদিন আগে এক সন্ধ্যায় আমার যে দীর্ঘ কথোপকথন হয়েছে, তার সবটাই ছিল তাঁর সর্বস্বান্ত হয়ে যাওয়া জীবনের দীর্ঘশ্বাস ও বেদনার এক করুণ কথাচিত্র। ইণ্টারভিউ-এর সময় তিনি সে সব দীর্ঘশ্বাস গোপন করেছেন। কারণ তিনি জানেন, সিনেমার কাগজের ইণ্টারভিউয়ের সময় কাককে পরতে হয় ময়ূরপুচ্ছ। অভিনেত্রীদের অন্তরঙ্গ জীবনের সংলাপের গা থেকে ইভনিং ইন প্যারিসের গন্ধ না বেরোলে জনগণ অখুশী হন। আপনি কি জানেন আমাদের দেশে হরিনাথ দে নামে একজন মানুষ জন্মেছিলেন? মোট কুড়িটা ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন তিনি। এই হরিনাথ দে সম্পর্কে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় যত কথা লেখা হয়েছে, তার চেয়ে কয়েক হাজার গুণ বেশী হয়েছে, হচ্ছে, এবং হবে যে-কোনো একজন অর্ধ-শিক্ষিত, অক্ষম, অপরিণত ষোলো-সতেরো-আঠারো বছরের নায়িকা এবং সদ্য গোঁফ গজানো নায়ক সম্পর্কে। এই চুষিকাঠি মুখে পুরেই আমাদের এই দেশ বড হচ্ছে।

—আপনি ভুল করছেন। জনগণ চায় বলেই এগুলো ছাপা হয়। জনগন যদি চাইতো তাহলে হরিনাথ দে, কিংবা যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, কিংবা ধরুন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়দের সম্পর্কেও ঐ রকম রগডদার লেখা বেরোত। আমরা জানতে পারতাম, তাঁরা কবার প্রেম করেছেন, কবার বিবাববিচ্ছেদ, কি খেতে ভালবাসেন, কোথায় বেড়াতেন এবং কার সঙ্গে ইত্যাদি। কিন্তু তাঁদের জীবন তো ঐরকম ঘটনাবহুল এবং রগরগে ধরণের রোমাঞ্চকর নয়। তাই জনগণ চায় না। আর জনগণ চায় না বলেই কাগজ ছাপে না। আপনি তো জানেন কাগজ মাত্রের জনগণের সেবক।

—জানি। সিনেমার কাগজ ছাড়াও ভারতবর্ষে জনগণের সোল এজেন্ট

আছে আরও একাধিক। পলিটিক্সের এজেন্সীটাই অবশ্য সবচেয়ে-বড়। তারপর ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রী। তারপর সাপ্তাহিক এবং দৈনিক পত্র-পত্রিকা। জনগণের হাঁড়ির খবর, নাড়ীর খবর সব এঁদেরই একচেটিয়া। অবশ্য এজেন্ট আছে আরো শাঁসালো কয়েকজন। যারা ভেজাল দেয় খাদ্যে এবং ওষুধে। জনগণের উপর তাদেরও অগাধ আস্থা। তারা জানে জনগণ নির্বিচারে বছরের পর বছর এই সব ভেজাল খেয়ে যাবেনই! চোরোকারবারীরাও জানে, জনগণই তাদের চোরাই মালের অনুগত ক্রেতা। অবশ্য কেবল শেষের দু'দল লোককেই সরকার মিসায় আটকান। বাকিরা বাদ। চব্বিশ পরগনার তাড়িতে ভেজাল মেশালে কাগজ হৈ-চৈ। পাছে এই মারাত্মক পানীয়ে জনগণ অবসন্ন ও অকর্মণ্য হয়ে পড়েন। অথচ চব্বিশ প্রহর ধরে আমাদের দেশের চলচ্চিত্র এবং সংস্কৃতিতে যে ভেজাল চলেছে রুচিহীনতার এবং অগভীরতার, সেটার গায়ে মনোরঞ্জন মার্কা লেবেল সেঁটে দিয়ে আমরা নাক ডাকাচ্ছি মহাসুখে। জানা নেই যে ক্যানসার এবং কুরুচির চিকিৎসায় গোড়াতেই মনোযোগ দেওয়ার দরকার। একবার রক্তে ঢুকে পড়লে বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

—পূর্ণেন্দুবাবু, আপনাকে একটা অন্য প্রশ্ন করবো। যদি জানতেনই যে আমাদের দেশের চলচ্চিত্র জগৎ ধাপার মাঠের মত আবর্জনাময়, তাহলে এই এলাকায় পা বাড়ালেন কেন?

—আপনি কি আমার উত্তর কোনো কাগজে ছাপবেন?

—আজ্ঞে না।

—তাহলেই সত্য কথাটা বলবো। কাগজে ছাপলে অন্য উত্তর দিতুম। আমার চলচ্চিত্রে আসার মূল কারণ প্রতিশোধ স্পৃহা।

—প্রতিশোধ স্পৃহা? বুঝতে পারলাম না ঠিক।

—বুঝিয়ে বলছি। প্রত্যেক বাড়িতে প্রতিদিন সকালে ঝাঁট পড়ে, ঝুল ঝাড়া হয়, জানেন তো?

—জানি।

—ঠিক তেমনি আমাদের সমাজ ব্যবস্থার ভিতরেও ঝাঁট পড়ে, ঝুল ঝাড়া হয় নিয়মিত। যারা ঝাঁট দেয় তারা সাধারণ ঠিকে-ঝি বা বাঁধা চাকর নয়। তাঁরা এলিটস অফ দা সোসাইটি। তাঁরা নানাবিধ এসট্যাবলিশ-মেন্টের হর্তা-কর্তা-বিধাতা। সমগ্র ফাইল এবং কাগজ পত্তর

তাঁদেরই করতলে। ঝাঁট দিতে দিতেই তাঁরা স্থির করে নেন কাকে কাকে ধুলোর সঙ্গে বাইরে বিদেয় করা হবে ঝেঁটিয়ে, ধুলো থেকে কুড়িয়ে কাকে আবার পেতে দেওয়া হবে চেয়ার টেবিল, পৃষ্ঠপোষকতা করা হবে পিঠের ধুলো ঝেড়ে কার কার, অপছন্দ হলেও আপাততঃ কার্যসিদ্ধির জন্যে কার সঙ্গে বজায় রাখতে হবে সখ্যতা অথবা আনুগত্য, প্রশংসার সোনালী তক্‌মা এখন কার বুকে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে সেফটিপিন সহ, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এ রকম ঝাঁটার ঝাপটা অনেকবার পিঠে পড়েছে আমার। ঠিকুজী কোষ্ঠীতে বৃহস্পতি না শুক্র বা শনি কি যেন একটা গ্রহ খুব সদাশয় ছিলেন বলেই হয়তো ধুলো ঝেড়ে আবার নতুন করে হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটতে শিখেছি। অনেক অট্টহাসি, চোরাহাসি, চতুর হাসি, কানে এসেছে ঈশান, অগ্নি, নৈঋত এবং বায়ু ছাড়াও আরও বহু কোণ ও কর্নার থেকে। ঈষৎ খোঁড়ালেও হেটে-চলে আমি দেখাতে চাই যে কারো পদতলে নেই। গত বছরের কৃত্তিবাসের শারদীয়ায় সন্দীপন আমার সম্বন্ধে সবচেয়ে এক সত্যটা কি করে যেন বলে ফেলেছিল: আমি সাঁতার জানি। আপনি সুনীল গাঙ্গুলীর 'আত্মপ্রকাশ' পড়েছেন?

—পড়েছি।

—তার নায়ককে মনে আছে? যে-কোন মুহূর্তে প্রতিপক্ষের আক্রমণ তাকে বিধ্বস্ত করতে পারে, এই আশঙ্কায় যে সর্বদা জামার আস্তিন গুটিয়ে রাখতো। মনে পড়ছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—লক্ষ করে দেখেছেন কি আমি সবসময় ফুল স্লিভ জামা পরি?

—দেখেছি।

—কেন পরি জানেন?

—আজ্ঞে না।

—ভিতরের গোটানো আস্তিনটা যাতে চট্ করে কেউ দেখতে না পায়। আর চলচ্চিত্রই আমার গোটানো আস্তিন। এর ফলও পেয়েছি হাতে হাতে।

—ফল পেয়েছেন মানে?

—মানে সাকসেসফুল হতে গেলে মানুষ যা যা চায়। তার প্রায়

সবই একটু একটু করে পেয়েছি। খ্যাতি, প্রতিপত্তি, পুরস্কার, সিম্মান, সমাদর, শত্রু, নিন্দা, ঈর্ষা, তোষামোদ, এবং ভালবাসা। এখন সপ্তাহে কম করে তিনটে আমন্ত্রণ পাচ্ছি বিভিন্ন সভা-সমিতি থেকে। যাই না। কিন্তু পাচ্ছি তো। এখন ঝাঁকে ঝাঁকে অটোগ্রাফের খাতা এগিয়ে আসে, চুড়ি এবং রিষ্টওয়াচ দু-প্রকারের হাত থেকেই। অনেকে আবার বলে, আমাদের ওখানকার লোকেরা আপনাকে দেখতে চায়। এইসব শুনলে কার হৃদয় ময়ূরের মত না-নেচে পারে বলুন তো? এখন যদি কোন কাজে বাড়ি ফিরতে রাত্রি হয়ে যায় পাড়ার ছেলেরা ভাবে এতক্ষণ বুঝি কোন অভিনেত্রীর বাড়িতে ফূর্তি করছিলাম। একদিন বাড়ি ফিরছি। রাস্তাঘাট অন্ধকার। লোড-শেডিং চলছে আরকি। আমার সামনে চারটে ছেলে আমার সম্পর্কে অশ্লীল খিস্তি করতে করতে ডান দিকে স্কুলের মাঠে ঢুকে গেল। এই অশ্লীল আচরণে আমার কানও রাঙা হল, মনও রাঙা হল। আহা! ওরা কত কষ্ট পাচ্ছে আমাকে সুখী এবং সৌভাগ্যবান ভেবে।

এবার বলুন, চলচ্চিত্র না করে, আমি যদি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের মত সারা জীবন মলাট আর কমার্শিয়াল আর্টের পুজো করতাম, এই মহাপ্রসাদ জুটতো কি কপালে? কেউ আসতো ইন্টারভিউ নিতে? কাগজে ছবি বা সংক্ষিপ্ত জীবনী বেরোতো কি? জানেন কি, একই ইনকাম গ্রুপে পড়ি না বলে যাঁরা আগে আমার স্ত্রীকে পাত্তা দিতেন না, এখন তাঁরা খাতির করে ডেকে ফ্রীজের রসগোল্লা খাওয়ান?

জোরে এক ঝলক বাতাস ঢুকলো ঘরে। কলকাতা শহরটা কেঁপে উঠল হাওড়া ব্রীজ সহ। মানে ঐ ক্যানভাসে আঁকা শহরটা। রাত্রি বেড়ে চলেছে। ঠিক করলাম জরুরী জিজ্ঞাসাগুলোই চটপট সেরে নি।

—আচ্ছা পূর্ণেন্দুবাবু, বাংলা চলচ্চিত্রের এই যে দুরবস্থা এর প্রতিকার সম্বন্ধে কিছু ভেবেছেন কি?

—তা ভেবেছি বৈকি। তবে শুনতে শুক্তোর মত লাগবে।

—বলুন না, শুনি।

—অর্ধ-শতাব্দীর জন্যে ভারতবর্ষে, না অতবড় ক্যানভাস সামলানো যাবে না, শুধুমাত্র বাংলা দেশে মানে পশ্চিমবঙ্গে চলচ্চিত্র নির্মাণ এবং তার প্রদর্শন সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া।

—সে কি? পঞ্চাশ বছরের জন্যে সব বন্ধ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বছরটা আমি কমিয়েই বলেছি। যে-জাতির স্বাধীন হতে দুশো বছর লেগেছে, তার আধুনিক হতে তো ঐরকম সময় লাগবেই। আর আধুনিক না হলে চলচ্চিত্র-নামক এই আধুনিক শিল্পটিকে বোঝা যাবে না। আপনি তো জানেন এই অদ্ভুত আর্ট-ফর্মটি প্রায় সর্বভুক। অন্যান্য শিল্পের যার যতটুকু ভাল, সব গিলে খাওয়াটাই এর স্বভাব। ইনি শিল্প-সমুদ্রের হাঙর। সেই কারণে একে হজম করা শক্ত।

—আপনার সঙ্গে আমি একমত হতে পারলুম না। আমরা যথেষ্টই আধুনিক হয়ে গেছি এর মধ্যে। শিল্পে, সংস্কৃতিতে, বিজ্ঞানে, গবেষণায়, ভারী শিল্পে, এগ্রিকালচারে…

—জামা কাড়ের ছাঁটে, ইংলিশ মিডিয়ামে, হ্যাপি বার্থডে এবং ম্যারেজ এ্যানিভারসরীতে, আঁকা ভুরুতে, হোটেলবাজিতে, মেয়েদের সঙ্গে অবাধ মাখামাখিতে, আরও নানাবিধ কেতায়। এই তো? আমি মশাই জুতোর ভোঁতা ডগার আধুনিকতার কথা বলছি না। পা থেকে মাথা পর্যন্ত সমগ্র অস্তিত্বের, চিন্তার, বুদ্ধির, আবেগের, আধুনিকতার কথা বলছি। অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তিকে কি আপনি অম্লান হেসে বলতে শোনেন নি যে, তাঁরা আধুনিক কবিতা বোঝেন না। তেমনি আরও অজস্র শিক্ষিত ব্যক্তি আছেন যাঁরা আধুনিক চিত্রকলা এবং চলচ্চিত্রও বোঝেন না। তার মানে অবশ্য এই নয় যে তারা কিছুই বোঝেন না। বাবা কেন বাপি থেকে ড্যাডি হয়ে গেল, বোঝেন। তিনি নিজে কেন শশাঙ্কশেখর বসু থেকে শুধুমাত্র মিঃ বাসু বা ভাসু বা ভোস হয়ে গেলেন, বোঝেন। বাপ-ঠাকুর্দার আমলের সূক্ষ্ম কারুকার্যময় খাট-পালঙ্ক-আলমারী-ড্রেসিং-টেবিল বদলে গিয়ে কেন এমন বৈচিত্র্যহীন সরল সহজ হয়ে উঠল, বোঝেন। তাঁর আধুনিক চেয়ারে কেন হাতল নেই. রিষ্টওয়াচে কেন মিনিটের দাগ উঠে গেল, বোঝেন। তাঁর সন্তান-সন্ততিরা কেন যৌন ভঙ্গিমায় কোমর বেঁকিয়ে নৃত্য শিখছে, বোঝেন। তাঁর নিজস্ব বিবাহিতা স্ত্রী, যাকে তিনি একদিন একমাথা ঘোমটা পরা অবস্থায় ঘরে এনেছিলেন, এখন কেন তাঁর স্তনমূল থেকে নাভিমূল পর্যন্ত বিস্তৃত থলথলে মাংসময় অংশটি সর্বদা অনাবৃত থাকে, বোঝেন। । বাড়ি ভর্তি ফ্রীজ, এয়ারকূলার

স্টিরিও, টেলিভিশন, কুকিং রেঞ্জ, কফি-পার্কুলেটার, ঘুমের ট্যাবলেট, হাউস ফিজিসিয়ান, ভ্যাট এবং হ্যাম এবং জ্যাম এবং জেলী এবং সেফ্‌টি ভল্টে যথেষ্ট পরিমাণ সোনা এবং বেনামী টাকার বাণ্ডিল থাকা সত্ত্বেও কেন তিনি মাঝে মাঝে মৃত্যুর অথবা আসন্ন কোনো সর্বনাশের আশঙ্কায় হলুদ হয়ে যান, বোঝেন। লেবার ট্রাবল এবং ব্যাঙ্কের ওভার ড্রাফটে বিচলিত হয়ে যেদিন তিনি বেশী মদ্যপান করে ফেলেন, নিজেকে কেন তাঁর অপরিচিত লাগে, কেন তাঁর একটা শরীর থেকে অনেকগুলো প্রতিবিম্ব উঠে এসে নানারকম ভেংচি কেটে তাঁকে ছিন্নভিন্ন করতে থাকে, বোঝেন। এত সব আধুনিকতা, এত সব ভাঙাচোরা, দুমড়ানো-মোচড়ানো, অদলবদল সবই বোঝেন। মাত্র ঐ গুটি তিনেক বস্তু ছাড়া। আধুনিক কবিতা, ছবি এবং চলচ্চিত্র।

—আপনার কথা অনেকটা সত্যি তবে সবটা নয়। আমরা আগের চেয়ে অনেক এগিয়েছি, তাতে সন্দেহ প্রকাশ করাটা অযৌক্তিক।

—এগিয়েছি তো বটেই। তবে সেটা সরল পাটিগণিতের বাঁদরের মত। বাঁশের ডগায় চার হাত লাফিয়ে, পাঁচ হাত হড়কে নীচে নেমে আসে যে। তাই এদেশে খাটা পায়খানাও বাড়ছে, কমোডও বাড়ছে। ঘোমটাও পাবেন, খেমটাও পাবেন। সিগনেটও পাবেন, বটতলাও পাবেন। সত্যজিৎ রায় পাবেন, আবার প্রাগৈতিহাসিক চলচ্চিত্রও পাবেন। এগোচ্ছি আবার পিছোচ্ছি। এক সঙ্গেই। দেখছেন না, যত বিপ্লবী চিন্তার বিকাশ ঘটছে, পুজোর ধেই ধেই নৃত্যও বেড়ে চলেছে তত। যিনি বিপ্লবে আছেন, তিনি ব্লাকমানিতেও আছেন। সায়েন্সে যিনি, শনি পূজোতেও তিনি।

শুধু সেক্‌স নিয়েই আমাদের দেশে কতরকম ভণ্ডামী চলেছে দেখেছেন? বাংলা ছবিতে সেক্‌স থাকলে মহাভারত গেল গেল। মহিলারা, যাঁরা দেখেন বলেই এদেশে চলচ্চিত্র এবং পড়েন বলেই এদেশে সাহিত্য অচল, তাঁরা ঐ সব দৃশ্যে বড় অসন্তুষ্ট। নাকে আঁশটে গন্ধ লাগে। আর গৃহকর্তারা বিরক্ত হন সপরিবারে দেখা যায় না বলে। সেন্সর বোর্ডও খাঁড়া উঁচিয়ে আছেন। সেক্‌স এবং ভায়োলেন্সের গন্ধ পেলেই 'এ' সার্টিফিকেট। অথচ 'ইউ' সার্টিফিকেটের শিরোপা মাথায় এঁটে হিন্দী ছবি ঐসবের শ্রাদ্ধ করে চলেছে। দেখছে কারা? এখন হিন্দী ছবির সেরা দর্শক বাঙালী

তরুণ, তরুণী, মহিলা এবং পুরুষ। এমন অনেক হিন্দী ছবি আছে যা বম্বে এবং দিল্লীতে চলেনি, কিন্তু কলকাতায় বাজীমাৎ। আমরা এতো এগিয়ে। আর ফিল্ম-সোসাইটি বা ফিল্ম ফেষ্টিভ্যালের যে কী কদর এবং চাহিদা বেড়েছে সে তো আপনি নিশ্চয় দেখেছেন। কারণ কি তাও নিশ্চয়ই জানেন। সেক্স। লাভ-সীন। বেডরুম সিকোয়েন্স। ঐ সব দৃশ্যের সময় হলের হল্লাও শুনেছেন নিশ্চয়। যেন নেকেড এ্যাণ্ড দা উল্ফ মুখোমুখি। ঐ সময় ভক্তি প্রসাদ মল্লিক উপস্থিত থাকলে, কয়েক ঘণ্টায় শিক্ষিত সমাজের খিস্তি-খেউড়ের একটা পূর্ণাঙ্গ অভিধান তৈরী করে ফেলতে পারতেন অনায়াসে।

কথা শেষ করে হাসলেন তিনি। জোরে নয়। অনেকটা সেভেনথ সীলের নাইটের মত।

—হাসলেন কেন ?

—ওঃ। একটা কথা মনে পড়ে গেল। পুরনো কথা !

—কি ?

—কলকাতা শহরের প্রচুর লেখক সি. আই. এ-র দালাল তা নিশ্চয়ই জানেন। একজন বড় দালাল মারা গেছেন। তিনি ছিলেন বুদ্ধদেব বসু। আমি জানতাম না। আমার কিছু ফিকে কম্যুনিষ্ট মনোভাবাপন্ন বন্ধু আছেন। তাঁদের কাছ থেকেই খবর পাই এ সবের। বুদ্ধদেব বসুর পর আরেকজন বসুও ঐ রকম দালাল হয়েছেন, কানে এল আমার। কে ? কে ? সমরেশ বসু। তখন সমরেশবাবু সম্ভ 'বিবর' লিখেছেন। তারপর যখন 'প্রজাপতি' বেরোল, তখন তো আর সন্দেহই রইল না কারো। আমার সেই সব বন্ধুরা অসম্ভব সৎ। ন্যায়নিষ্ঠ। বলিষ্ঠ। অবিরল সমাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। প্রতি মুহূর্তে একটা অবশ্যম্ভাবী রেভলিউশনের জন্যে প্রস্তুত। অথচ তাঁরাই এখন ঐ সব পর্নোগ্রাফী নিয়ে মঞ্চ মাতাচ্ছেন। তাই হাসলাম একটু।

বাইরে ঝড় উঠেছে। ঘরেও ছুটে এল খানিকটা। কলকাতা শহরটা দুলে উঠল। উনবিংশ শতাব্দীর তৈলচিত্রটা বোধহয় এখুনি দড়ি ছিঁড়ে পড়ে যাবে। আমার আর বিলম্ব না করে উঠে পড়া উচিত। মেঘ ডাকছে। বৃষ্টিও নামতে পারে।

আমি উঠতে যাচ্ছি। সেই মুহূর্তে তাঁর গলা থেকে বেরিয়ে এল

একটা অস্পষ্ট ধ্বনি।

—ডষ্টয়ভস্কি জানতেন।

—কি?

—আগামীকালের মানুষের চেহারাটা কেমন হবে।

—কেমন?

—ওঁর 'মাই আঙ্কল'স ড্রীম' পড়েছেন?

—না।

—পড়ে নেবেন। ঐ উপাখ্যানের যিনি নায়ক অর্থাৎ খুড়োমশাই বা কাউন্ট তিনি মাথায় পরতেন পরচুলা, টাক ঢাকবার জন্যে। তাঁর গোঁফ, গালপাট্টা এবং 'ইম্পিরিয়াল' নূর সবটাই ছিল নকল। পাঁজরটা ভাঙা। বাঁ দিকের পা নকল, কর্কের তৈরী। ডান চোখটা কাঁচের। দাঁত বাঁধানো। তিনি প্রসাধন করতেন দিনের অর্ধেকটা সময় ধরে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় নানান রকম পেটেণ্ট লোশনে ধুতেন গা। সর্বদাই তাঁর শরীরে দামী আতরের ভুরভুরে গন্ধ। এই কাউন্ট একটা গোটা মানুষ নন। অনেকগুলো টুকরোর জোড়াতালি। কাউন্টের নিজস্ব কৃতিত্ব হল এই যে, জোড়াগুলো কেউ ধরতে পারে না।

তিনি থামতেই আমি বললাম—

আচ্ছা পূর্ণেন্দুবাবু, এবার উঠি। অনেক বিরক্ত করলাম আপনাকে। আরও একটা প্রশ্ন ছিল। আজ থাক। বাইরে বড় আশংকাজনক আবহাওয়া।

—কি বলুন না।

—আচ্ছা, ঐ যে আপনি তখন বললেন, পঞ্চাশ বছরেরর জন্যে পশ্চিমবঙ্গে সমস্ত চিত্রনির্মাণ এবং প্রদর্শন বন্ধের কথা, তাহলে সিনেমা হাউসগুলো বেকার হয়ে যাবে না? তাদের কি অবস্থা দাঁড়াবে, সেটা ভেবেছেন কি?

—আপনার কি ধারণা? ভাবিনি? একটু বসুন। বলছি। এ-বিষয়ে আমার একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা আছে।

—একটু শোনাবেন? ডিটেলে।

—পুণার ফিল্ম ইনস্টিটিউট জানেন তো? ওখানে তৈরী করা হয় আগামী কালের পরিচালক, অভিনেতা, অভিনেত্রী, টেকনিশিয়ান। আমি তৈরী করতে চাই আগামী কালের দর্শক। বাংলা দেশের

সবকটা সিনেমা হাউস জুড়ে তৈরী হবে সেই ইনস্টিটিউট। সেখানে দর্শকদের ক্লাস করতে হবে। পাশ করলে ডিপ্লোমা এবং সার্টিফিকেট। প্রত্যেক ইণ্ডিভিজুয়াল দর্শকের জন্যে পাঁচ বছরের কোর্স।

—কোর্স? দর্শক তৈরীর জন্যে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। এক একটা সিনেমা হলে পড়ানো হবে এক একটা নির্দিষ্ট বিষয়। যেমন ধরুন রূপবাণীতে ম্যাটিনি, ইভনিং, নাইট প্রাচীন বাংলা সাহিত্য আর ক্লাসিকস। অরুণায় আধুনিক উপন্যাস। মিনারে বা রাধায় আধুনিক বাংলা কবিতা। মেট্রোয় হবে একটা বিশেষ ধরণের ক্লাস। সাহিত্যের এবং নাটকের এবং চলচ্চিত্রের সংলাপে কি প্রভেদ তা নিয়ে। গ্লোবে চলচ্চিত্রের ব্যাকরণ। লাইট হাউসে পেনটিং। নিউ এম্পায়ারে সঙ্গীত। কি রকম লাগছে পরিকল্পনাটা?

—খুবই ইন্টারেস্টিং। আচ্ছা, আপনি দর্শক তৈরীর কথা ভাবছেন, কিন্তু আরও একটা জিনিষও তো···

—আমি জানি, কি বলতে চাইছেন আপনি। সমালোচক তৈরীর বিষয়টা তো? না তার আর দরকার হবেনা। আমরা সমালোচককে, অবশ্যই অযোগ্য সমালোচক, যদিও দুর্ভাগ্যবশতঃ তাদের সংখ্যাই এদেশে বেশি, নিয়ে মাথা ঘামাই অর্থাৎ উত্তেজনা প্রকাশ করি কেন? যেহেতু জনসাধারণ অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত, এই জটিল মাধ্যমটি সম্বন্ধে তাদের ধ্যান ধারণা অল্প, খারাপ সমালোচনা তাদের বোধ-বুদ্ধিকে আরও ভোঁতা করে দিতে পারে, এই ভয়াবহ আশঙ্কা থেকেই করি। কিন্তু জনসাধারণ শিক্ষিত দর্শক হয়ে উঠলে অযোগ্য সমালোচকের আস্ফালনকে এঁদো নালা-নর্দমার ব্যাঙের ডাক হিসেবে তাচ্ছিল্য করতে শিখে যাবে তারা। দরকার পড়লে যে নালা-নর্দমা থেকে ডাকটা আসছে সেখানে একটু পেচ্ছাপ করে আসবে। অর্থাৎ একটা মৌলিক বা আমূল পরিবর্তন ঘটে যাবে এদেশে চলচ্চিত্রের ইতিহাসে।

—চমৎকার। তবে ভয় করছে একটা ব্যাপারে।

—বলুন। পরিকল্পনাটা বেশিদিন চালানো যাবে না, এই তো?

—না, তা নয়, আপনি ছবি করা ছেড়ে দিয়ে···

—আপনি ভুল করছেন। যে সময়টা আমি ছবি করিনা সেই সময়টাতেই

আমি সবচেয়ে বেশি ছবি করি। যখন ছবি করি, তখন শুধুমাত্র একটা বিশেষ কাহিনীই কেড়ে নেয় আমার সমস্ত মনযোগ। বস্তুতঃ তখন আমি আমার সমগ্র জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন, নির্বাসিত।

—সমগ্র জীবন থেকে মানে ?

—মানে যা কিছুর সংমিশ্রণে আমার জীবন। অর্থাৎ জীবন বলতে আমি যা কিছুর সঙ্গে যুক্ত। আমার ঘর-বাড়ি, আমার স্ত্রী-পুত্র, আমার কবিতা, ছবি আঁকা, লেখালেখি, গান শোনা, আড্ডা, আলস্য সব কিছু। তখন তো আমি ঐ ধনী দেবকন্যাটির হাতের ক্রীতদাস। অষ্টপ্রহর শুধু তারই আড়াই লক্ষ ফরমাস খাটায় উদয়াস্ত ব্যস্ত।

—ধনী দেবকন্যা কথাটার মানে বুঝতে পারলুম না কিন্তু।

আমার এই মন্তব্যে তিনি মৃদু হাসলেন। হেসে চুপ করে রইলেন। এই সময়ে তাঁর কপালের রেখায় হঠাৎ ঢেউ। যেন মনে হচ্ছে আমার প্রশ্নে ইষৎ বিরক্ত। যেন মনে হচ্ছে খুব একটা আক্রমণাত্মক কিছু বলার জন্যে জিভে শান দিচ্ছেন এখন। তিনি এদিক ওদিক তাকোলেন। তারপর উঠে গেলেন বইয়ের আলমারীর কাছে। আমিও তাকালাম সে-দিকে। আলমারীটা শুধুমাত্র ফিল্ম সংক্রান্ত বইয়ে ঠাসা। তিনি বেশ কিছুক্ষণ খোঁজাখুজি করে একটা পাতলা বই এনে নিজের চেয়ারে বসলেন। এবং বসার আগেই সুইচ বোর্ডের কাছে গিয়ে একটা সুইচ টিপলেন খুট করে। মাথার উপরে জলে উঠল একটা টিউব লাইট। তিনি বইটা হাতে নিয়ে কয়েকটি পাতা উল্টে, কিছু একটা দেখে নিয়ে, বইটা বন্ধ করে আমার দিকে এগিয়ে দিলেন।

—আপনি এই বইটার ১৩ নম্বর পাতাটা খুলুন।

আমি খুললাম।

—এবার আমার আণ্ডারলাইন-করা অংশটা পড়ুন।

আমি পড়লাম :

"It takes such a vast some of money to make a film that it is necessary to get that money back as soon as possible by massive taking. That is a terrible, almost insurmountable handicapt. I have just said that Muses should be represented in attitudes of waiting. All

arts can and must wait. They often have to wait for the death of their makers before they are able to live. Can, then the cinematograph rank as a Muse? Besides, Muses are poor. Their money is invested. But the cinema Muse is too rich, too easy to ruin at one go."

আমি লজ্জিত হেসে,

—স্যরি, ধনী দেবকন্যা বলতে আপনি যে সিনেমাকেই মিন করেছিলেন, সেটা বুঝতে পারিনি।

পূর্ণেন্দু পত্রী এই সময়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। হয়তো সেই অন্যমনস্কতার ফলেই আমার কথাটা শুনতে পাননি। বাইরে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বিদ্যুৎ-এর আলোয় বই এবং সিনেমার আসবাব-পত্রে ঠাসাই ঘরখানা মাঝে মাঝে ফুলস্কেপ কাগজের মত সাদা। বিদ্যুতের তীব্র ঝলকে তাঁর মুখখানাও ভয় পাওয়ার মত সাদা হয়ে উঠছিল থেকে থেকে। কোনও একটা ফিল্মে একবার মেফিস্টোর মুখ দেখেছিলুম। অনেকটা সেই রকমই। এই রকম মুখ দেখলে শয়তানের কথা মনে পড়ে যায়। আমার এক আত্মীয়ের বাগানে একবার দেখেছিলাম একটা অদ্ভুত সাদা কচু পাতা। শিউরে উঠেছিল বুক। ডেসডিমনার হারানো রুমালের মত সাদা। যেন ভীষণ সর্বনাশের একটা গভীর-গোপন ইশারা তার রক্তহীন অদৃশ্য শিরায় শিরায়।

এই সময়ে তাঁকে অস্ফুষ্ট স্বরে বলতে শুনলাম

—না, তা অবশ্য ঘটবে না।

আমার কৌতূহল,

—আমাকে কিছু বলছেন?

—বলতে পারেন।

—বলুন।

—ভাবছিলুম আপনাকে বলবো, যে-বইটা আপনার হাতে, ইচ্ছে করলে তার প্রায় প্রত্যেকটি পাতায় আমার দাগ-দেওয়া লাইনগুলো যদি আপনি পড়ে নেন বা পড়ে নিতে পারেন তাহলে হয়তো আলাদা করে বিভিন্ন পরিচালকের ইন্টারভিউ নেবার দায় থেকে অনেকটা অব্যহতি পেয়ে

যেতেন। পরে মনে পড়ল, না, তা অবশ্যই ঘটবে না। বাবা চিত্র-পরিচালকেরা যথেষ্ট বুদ্ধিজীবি। আজ যা বলবেন, কাল তারই পুনরাবৃত্তি করবেন, বুদ্ধির এমন দৈন্য ঘটেনি তাঁদের এখনো। তা ছাড়া এটা আপনার পেশা। আপনি যত যত বেশি বার ইন্টারভিউ নিতে পারবেন, আর্থিক দিক থেকে ততই আপনার সাফল্য।

আমি লজ্জিত হয়ে উঠলুম। তবুও সবিনয়ে

—যদি অনুমতি করেন তো আপনার দাগ-দেওয়া লাইনগুলো একটু পড়ে নিই।

—স্বচ্ছন্দে।

আমি পাতা উল্টে-পাল্টে পড়ে যেতে লাগলাম :

১। "The tragedy of the cinematograph lies in its having to be successful immediately."

২। "What is commonly called 'Cinema' has not been, up till now a pretext for thought. People walk in, look (a little), listen (a little), walkout and forget. Whereas the cinematograph, as I understand it, is a powerfull weapon for the projection of thought, even into a crowd unwilling to accept it."

৩। "It is commonly said that such and such a film is perhaps good but that is 'not cinema', or that a film lacks beauty but is 'cinema', and so on. This is forceing the cinematograph to be mere entertainment insted of a vehicle for thought. And that is what leads our judges to condemn in two hours and fifty lines a film epitomizing twenty years of work and experience."

৪। "A film worthy of the name encounters the same obstacles as does a canvas by Vermeer, Van Gogh or Ce´zanne, But whilst these paintings land in the public museum only after a long time, a film must begin with it. Thrown to the crowed, it gets classed,

and from then on can only count on being seen by a few individuals, similar to the few who saw the paintings when they first appeared, before the eye and mind had grown accustomed to them. In short, a painting that isn't worth a penny to begin with will be worth millions later on. Whereas a film that was worth millions at the start will survive, if at all, in dire poverty."

৫। "Famous does not mean well known. To be famous and unknown permits one to 'discovered'."

৬। "Nietzsche wrote (in The Joyous Wisdom, if I'm not mistaken) : 'Between glory and honours, you must choose ; if you want glory, give up honours.'"

বাইরে বজ্রের ডাক। বই থেকে মুখ তুলে বাইরে তাকালাম। তিনি বোধ হয় বুঝে গেলেন যে আমি বৃষ্টির আশঙ্কায় ঈষৎ চঞ্চল। হাত থেকে বইটি চেয়ে নিলেন।

—আপনার দেরী হয়ে যাচ্ছে—আটকে রাখার জন্যে দুঃখিত।

—না, না। আমার খুবই ভালো লাগছে। আপনার সঙ্গে আরো দীর্ঘসময় কাটাতে পারলে খুবই লাভবান হতাম বুঝতেই পারছি। আচ্ছা···আপনি এখন কোনো ছবি করছেন না কেন?

—যেহেতু আমার তিনটে কবিতার বই বেরোয় নি।

—তার মানে?

—তিনটে কবিতার বই লিখতে পারলে, তবেই একটা করে নতুন ফিল্মে হাত দেবো, এটাই আমার সিদ্ধান্ত।

—ব্যাপারটা ধাঁধার মত লাগছে।

—অথচ ব্যাপারটা খুবই সহজ। প্রত্যেকটা ফিল্ম পিছু আমার জীবনীশক্তির যে ক্ষয় হয়, আমি যে-ভাবে সংগ্রাম করতে করতে বিধ্বস্ত হয়ে যাই, আর ছবি মুক্তি পাওয়ার পর পাড়ার পাঁচজনের, অবশ্যই এর মধ্যে রয়েছেন এক গুচ্ছ বাঁধা-মাইনের কর্তা-ভজা সমালোচক, আছেন কিছু বাঘা পরিচালক, আছেন দিল্লীতে অবস্থিত ফেস্টিভ্যাল কমিটি,

মতামত বা সিদ্ধান্তে যে ভাবে নিজের সৃষ্টি-ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে উঠি, তাতে জীবিত কালেই মৃত্যুর স্বাদ এসে যায় যেন। তখনই আত্ম-পরীক্ষায় লিপ্ত হয়ে যাই আমি। তিনটি কবিতার বই লেখার পরই নিঃসন্দেহ হতে পারি ছুটো বিষয়ে। এক, আমি জীবিত। ছুই, ফিল্ম যদি আমাকে ডোবায়, কবিতা ভাসিয়ে রাখবে।

—আপনার প্রত্যেকটি কথাই বড় অদ্ভুত। আচ্ছা পূর্ণেন্দুবাবু, জানিনা অসতর্ক মুহূর্তের উচ্চারণ কিনা, বাঘা পরিচালকদের সম্বন্ধে মনে হচ্ছে, আপনার মনের মধ্যে এক ধরণের খেদ অথবা ক্ষোভ রয়ে গেছে ?

—খুবই স্বাভাবিক, সাহিত্যে এটা হয়না। কারণ সাহিত্যে এ ধরণের প্রতিযোগিতা নেই। সুনীল শক্তি শঙ্খ ঘোষ পুরস্কৃত হলে, আমি মনে করি আমারই জয়। জয় কবিতারও। কিন্তু সত্যজিৎ রায় বা মৃণাল সেন প্রমুখেরা পুরস্কৃত হলে আমি মুখে বলি জয় ভারতীয় চলচ্চিত্রের। কিন্তু মনে মনে অন্য উচ্চারণ। সেখানে ঈর্ষা, দ্বেষ, এবং বুক জ্বলে-যাওয়ার যন্ত্রনা। আপনি প্রশ্ন করবেন, কেন ? এর সহজ উত্তর ছুটো। এক, আমি একজন মানুষ। সুতরাং আমি ঈর্ষান্বিত হবো। ছুই, এরা আমার আত্মীয় নন। এঁরা এঁরাই। তবে আমি উদার এবং মহানও হয়ে যেতে পারি মাঝে মাঝে। যেমন যখন দেখি এই বাঘা পরিচালকদেরই কেউ কাদায় পড়ে ব্যাঙের লাথি খাচ্ছেন, তখন তাঁর সম্মান বাঁচানোর জন্যে নিজে কলম তুলে নিই তাঁর ছবিকে পাওনার চেয়ে বেশী সম্মানিত করতে। আমার সঙ্গে এতক্ষণ কথা বলে এটা বুঝতে পারেননি যে ফিল্মের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা লাভ-হেটের। একে ভালবাসি এবং ঘৃণা করি। বোদলেয়ার যেভাবে তার 'পিশাচী' কবিতায় বলেছিলেন—

পাতকিনী, আঁকড়ে আছি আমি
খুনে যেমন দড়ির আলিঙ্গনে

কখনো কখনো ঠিক এই রকমেই ঘৃণা বেরিয়ে আসে আমার হৃৎপিণ্ড নিংড়ে, আমার ফিল্ম-জীবন সম্পর্কে।

—অথচ আপনি চলচ্চিত্রকে যে ভীষণ ভাবে ভালোবাসেন···

—অবশ্যই। সেও ঐ বেদলেয়ায়ের বেড়ালকে আদরের মতই।

আমার কামুক বুকে উঠে আয়, বিড়াল সুন্দরী,
বক্র নখ ঢেকে নে থাবায় ;
জ্বেলে দে, মোহন চক্ষে, রত্ন আর ধাতুর মঞ্জরি—
ডুবে যাই অদ্ভুত আভায়।

—ছবি করাটা তাই বলে ছেড়ে দেবেন নাকি ?

—না। ছাড়বো কেন ? আমি ছাড়তে চাইলেই কি আমার অস্তিত্ব রাজী হবে ?

—কি ছবি করবেন ভেবেছেন কিছু !

—জনগণ যেমন চাইবে, তেমনিই। চলচ্চিত্র সৃষ্টির ব্যাপারে আমি কি বিশ্বাস করি জানেন তো ?

—না। সঠিক জানি না।

—যে জনগণ আমার ছবি দেখেন, আমার অন্নবস্ত্র জোগান, তাদের মনোরঞ্জন করাই আমার কর্তব্য। এবং এটা আমার কাছে তাদের দাবী। জনগণকে একটু আনন্দ, একটু শিহরণ, জীবনের একটুখানি বলিষ্ঠতা, এইসব অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির স্পর্শ পাইয়ে দেওয়াটা আমার দায়িত্বও বটে। এবং এই বোধটাই আমার সৃষ্টির স্বপক্ষে সবচেয়ে বড় যুক্তি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমি আমার প্রতিভা নিয়ে বেশ্যাবৃত্তিতে নামবো। কারণ আরও একটা দ্বিতীয় অনুশাসন আমাকে মানতেই হবে। যে অনুশাসন আমাকে চুরি করতে, মিথ্যে কথা বলতে, প্রতিভার বেশ্যাবৃত্তি করতে, হত্যা করতে, সত্যকে মিথ্যা প্রমাণ করতে বারণ করে।

—বাঃ খুব সুন্দর লাগল কথাটা।

—সুন্দর লাগল বুঝি ? তবে কথাটা আদৌ আমার নয়। একদিন কথাপ্রসঙ্গে বার্গম্যান বলেছিলেন। মুখস্থ করে রেখেছি। এমনভাবে বলি, লোকে ধরতে পারে না। আসলে আমিও তো ডষ্টয়ভস্কির কাউন্টের মতই একজন। অনেক রকম সত্যি মিথ্যে, বিশ্বাস অবিশ্বাসের জোড়াতালি। অপরিপূর্ণ এবং অচরিতার্থ।

কে যেন গুঙিয়ে কেঁদে উঠল কোনখানে। বুঝেছি, বাতাস। নমস্কার করে বাইরে বেরিয়ে এলাম। ঝিঁ ঝিঁ পোকা ছাড়া এখন আর পৃথিবীতে জেগে নেই কেউ। ঝোড়ো বাতাসের শব্দকে ছাপিয়ে

আমার মাথার মধ্যেও ঝিঁ ঝিঁ-র ডাকের মত একটা একটানা শব্দ। কিসের? হতাশার? না! অবিশ্বাসের? না। কান্নার? না। ঠাট্টার? না। করুণার? না। কোনো সংকল্পের? না।

সম্ভবত ভয়ের। কারণ এই ভয়াবহ অন্ধকার ঝড়-ঝাপটা ঠেলে একলা আমাকে অনেকটা পথ হেঁটে পৌঁছুতে হবে নিজের বাসস্থানে!

কৃত্তিবাস

স্রষ্টা

অনন্য, অন্য সত্যজিৎ

জিনিয়াস-এর আধুনিকতম সংজ্ঞা আমাদের জানিয়ে দিয়েছে যে, তাঁকে হতে হবে যে-কোনো একটি বা দুটি বিষয়ে প্রশ্নাতীতরূপে পারদর্শী এবং সেই সঙ্গে একাধিক বিষয়ে গবেষকের মতো কৌতূহলী। অর্থাৎ তাঁকে হতে হবে দা ভিঞ্চি, মাইকেলেঞ্জেলো, গ্যেটে, আইনস্টাইন, রবীন্দ্রনাথ, পিকাশো, কক্‌তো প্রমুখের বংশধর। সত্যজিৎ রায় নিঃসন্দেহে তাই।

প্রধানত চিত্র পরিচালক হিসেবেই তাঁর বিশ্ব-পরিচয়। কিন্তু চলচ্চিত্রের সীমানার বাইরে, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড জুড়ে তার উর্বর অবদান সংখ্যায় যেমন একাধিক, পরিমাণেও তেমনি অজস্র। চলচ্চিত্র ছাড়া, সঙ্গীত-শিশু সাহিত্য-চিত্রকলা-বিজ্ঞাপন শিল্প-ক্যালিগ্রাফি-শিশু সাহিত্যের পত্রিকা সম্পাদনা, বইয়ের চিত্রাঙ্কন ও প্রচ্ছদ, এতগুলো বিষয়ের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তিনি বিস্ময়কর রূপে সার্থক। এ-বছর নিজের 'হীরক-রাজার দেশে' ছবির জন্যে, তিনি অর্জন করেছেন শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-পরিচালকের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় তাঁর গান রচনার কৃতিত্বকেও। গীতিকার হিসেবে তাঁর প্রথম উজ্জ্বল আত্মপ্রকাশ 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'-এ। 'হীরক রাজার দেশে' পৌঁছে গানের সুরের পরীক্ষা-নিরীক্ষার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন অতিরিক্ত আর

এক মাত্রা, ছন্দোময় সংলাপ, যা গানেরই দোসর। এইভাবেই নিজেকে প্রতিদিন উন্মুক্ত করে চলেছেন তিনি। এক ধরনের ফুল আছে, যার পাপড়িগুলো ক্রমশ উন্মোচিত এবং আরক্ত হয়ে ওঠে রৌদ্রের ধারাবাহিক প্রখরতায়।

সত্যজিৎ রায়ের সৃষ্টি সম্পর্কে আমাদের ভাবনা-চিন্তা-আলোচনা বিদ্রোহে অথবা বিরুদ্ধ সমালোচনায় যখন কখনো কখনো অস্ত্রের মতো ধারালো হয়ে ওঠে, তখনো কিন্তু আমরা বিশ্বাস করতে ভুলিনা যে, আরও কোনো বৃহত্তর সৃষ্টির জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করে চলেছেন তিনি, যেহেতু তিনি রয়েছেন প্রতিভার প্রখর রৌদ্রের মধ্যেই। মানুষ হিসেবে তিনি দীর্ঘকায় এবং তাঁর সৃষ্টির জগত বিপুল বলেই হয়তো তাঁর কাছে আমাদের প্রত্যাশাগুলোও দীর্ঘবাহু।

তাঁর সৃষ্টির জগতকে প্রা[illegible]করতে চাই যদি, প্রথমেই আমাদের ঘুরে তাকাতে হবে তাঁর শিল্পকলার দিকে, প্রতিভার প্রথম রশ্মি বৃত্ত রচনা করেছিল সেখানে। যৌবনের প্রথম ধাপের সিঁড়িতে যখন আমাদের পা, তখন শিল্পে অথবা এ্যাপ্লায়েড আর্টিস্ট হিসেবে তিনি সম্রাট। তাঁর আঁকা প্রচ্ছদ, বিশেষ করে কবিতার, তখন মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছে আমাদের। তাঁকে চোখে দেখার আগেই, তাঁর 'পথের পাঁচালী' নির্মাণের সংবাদ কানে পৌঁছনো মাত্রই আমাদের গোটা যৌবনকালটা যে গোপনে শঙ্খধ্বনির মতো আলোড়িত হয়ে উঠেছিল অগ্রিম উচ্ছ্বাসে ও প্রত্যাশায়, তার উৎসের পিছনে ছিল এক নিশ্চিন্ত নির্ভরতাবোধ। আর সেই পরম এবং প্রশ্নহীন নির্ভরতার উৎস ছিল, তাঁর শিল্পকলার নিত্য-নবীনতার সম্পর্কে আমাদের স্তম্ভিত বিস্ময় এবং বিস্মিত শ্রদ্ধা।

সত্যজিৎ রায় যদি শিল্পী না হতেন, চিত্রপরিচালক হতে পারতেন কিনা, এ প্রশ্ন হঠাৎ চমকে দিতে পারে আমাদের। কিন্তু এ-কথায় অবিশ্বাস জানানোর বিন্দুমাত্র উপায় নেই যে, চিত্রপরিচালক সত্যজিৎ রায়ের সামগ্রিক সাফল্যের পিছনে শিল্পী সত্যজিৎ রায়ের অবদান অপরিমেয়। এমনকি এ-কথাও দ্বিধাহীনভাবে উচ্চারণ করা যেতে পারে যে শিল্পী সত্যজিৎ রায়ের কাছে চিত্রপরিচালক সত্যজিৎ রায় প্রতি পদক্ষেপে ঋণী। আর এ তথ্য তো আমাদের সকলেরই জানা যে, অবদান এবং

অভিজ্ঞতার বিচারে শিল্পী সত্যজিৎ রায় চিত্র-পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ। এই বক্তব্য উদাহরণ দিয়ে প্রমাণ করার জন্যে যদি কেউ বলেন যে, হ্যাঁ, সত্যিই তো, যেদিন থেকে তাঁর চিত্রনাট্যের শুরু, সেদিন থেকেই তো শিল্পকলা অর্থাৎ চিত্রিত স্কেচ অবিচ্ছেদ্যরূপে জুড়ে রয়েছে চিত্রনাট্যের সঙ্গে, তখন আমরা তাকে আরো মনে করিয়ে দিতে পারি যে, চলচ্চিত্র-নির্মাণের জন্য তিনি প্রথম নির্বাচিত করলেন যে-কাহিনী, রেখাচিত্রে সেই বইটিকে অলঙ্কৃত করার সূত্রেই সে-কাহিনীর সঙ্গে তাঁর প্রথম অন্তরঙ্গ পরিচয়। সিগনেট প্রেস থেকে বেরোনো 'আম-আঁটির ভেঁপু' নামের ছোট্ট বইটি ছিল বৃহৎ 'পথের পাঁচালি'-র সংক্ষিপ্তরূপ। যতদূর জানি, সিগনেট প্রেসের কর্ণধার দিলীপকুমার গুপ্ত নিজের সম্পাদনায় গড়েছিলেন ঐ ভেঁপুটি, বিভূতিভূষণ নয়। এবং সত্যজিৎ রায়ও চলচ্চিত্রায়নের মুহূর্তে প্রধানত নির্ভর করেছিলেন ঐ সংক্ষিপ্ত সংস্করণের উপরই। তাঁর নিজের স্বীকারোক্তিও তাই।

"সত্যি কথা বলতে কি, ডি. কে-কৃত 'পথের পাঁচালী'-র সংক্ষিপ্ত সংস্করণ 'আম আঁটির ভেঁপু' আমাকে চিত্রনাট্যের কাঠামো নির্ধারণ করতে অনেকটা সাহায্য করেছিলো।"

আর ঐ সিগনেট প্রেসেরই অন্যতম পরিচালিকা শ্রীমতী নীলিমা দেবীর লেখায় এই ঘটনা দৈবঘটনার সম্মান পেয়ে যায়।

"শুভক্ষণে পরিকল্পনা করা হয়েছিলো 'পথের পাঁচালী'-র শিশুপাঠ্য সংস্করণ: 'আম আঁটির ভেঁপু'-র। এই বইয়ের ছবি আঁকতে গিয়েই সত্যজিৎ রায়ের কল্পনা উদ্বেল ও সৃষ্টিশীল হয়ে উঠেছিলো—বাংলাদেশের বিধুর-মধুর-উজ্জ্বল-সচকিত যে-শৈশবকে তিনি পরে ফুটিয়ে তুলেছিলেন তাঁর চলচ্চিত্রে—'পথের পাঁচালী'তে। যে-চলচ্চিত্র ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। 'আম আঁটির ভেঁপু' আর সত্যজিৎ রায়ের ছবি—এই যোগাযোগের পিছনে দৈবের হাত ছিলো সন্দেহ নেই, কিন্তু সে-দৈব হয়তো সিগনেট প্রেসেরই উদ্ভাবনা।"

সত্যজিৎ রায়ের বিশদ জীবনী বলতে একটিই বই, যা ইংরেজী ভাষার মারী সিটনের লেখা। সে বইয়ে ডি. কে অর্থাৎ দিলীপকুমার গুপ্ত এবং সিগনেট প্রেস বলতে গেলে অনুপস্থিতই। বইটির 'ইনডেক্স'-এ ডি. কের নামোল্লেখ নেই। তবে ৭৩ পৃষ্ঠার রয়েছে তিনটি লাইন।

'ইন ডিউ কোর্স, গুপ্ত এ মেম্বার অফ দা স্টাফ হু বিকেম এ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, এ্যাণ্ড ল্যাটার দা ওনার অফ সিগনেট প্রেস ইনভাইটেড সত্যজিৎ রে টু ওয়ার্ক ফর বোথ অর্গানিজেসনস।"

এই অংশটুকু পড়লে আমাদের সামান্যতম ধারণাও ঘটে না যে, সত্যজিৎ রায়ের জীবনে ডি কে এবং সিগনেট প্রেস-এর সাফল্যের পিছনে সত্যজিৎ রায়ের অবদান কতখানি এবং কোন জাতের। শ্রীমতী সিটন সত্যজিৎ জীবনের গোড়াপত্তনের যুগ সম্বন্ধে আরো বিশদরূপে কৌতূহলী হলে, তিন লাইনের বদলে ডি কে এবং সিগনেট প্রেস অধ্যায়টি আরও সুদীর্ঘ আকার নিতে পারতো। ঠিক এই রকমভাবেই অনুপস্থিত বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, শান্তিনিকেতনের ছাত্র জীবনে যাঁর প্রভাব ছিলো তাঁর উপর সবচেয়ে বেশী। শিল্পশিক্ষার গুরু হিসাবে যাঁকে তিনি সম্মানিত করেছেন একাধিক প্রবন্ধে এবং একটি তথ্যচিত্রের মাধ্যমে। সত্যজিৎকে যাঁরা শুধুমাত্র ইংরেজি ভাষায় জানেন, তাঁরা যে কম-জানেন এবং ভুল জানেন, মারী সিটনের বইটি তার অন্যতম দৃষ্টান্ত। ডি কে-র মৃত্যুর পর-সত্যজিৎ রায় যে প্রবন্ধ লেখেন আমরা এখানে তার কিছুটা বিস্তৃত উদ্ধৃতি দেবো এই কারণে যে, ঐ দুটি মানুষের যৌথ-উদ্যোগে আমাদের দেশের গ্রন্থ-প্রকাশনার জগতে ঘটেছিল যে আমূল বিপ্লব, সেই ইতিহাসের সূত্রেই আমাদের জানা হয়ে যাবে শিল্পী সত্যজিৎ রায়ের একটা বিশেষ পর্বের মৌলিকতাময় উত্থান ও ক্রমবিকাশের ঘটনাবলীও। ১৯৩৪-এ ডি, জে, কীমার নামের বিজ্ঞাপন সংস্থায় তাঁর যোগদান। ১৯৫০ থেকে তাঁর চলচ্চিত্র-জীবনের শুরু। মাঝখানে এই সুদীর্ঘ সাতটা বছরে তাঁর আত্মপ্রকাশের হাতিয়ার ছিলো কাগজ, কলম, কালি এবং তুলি।

"১৯৪৩-এর গোড়ার দিক। কলকাতা শহরে তখন জাপানী বোমার হিড়িক। মাস দুয়েক হলো শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে চাকরির চিন্তা করছি। কলাভবনের তালিম সত্ত্বেও ফাইন আর্টসের দিকে মন ঝোঁকে নি। ইচ্ছা আছে বিজ্ঞাপন শিল্পী হবার, কিন্তু বিজ্ঞাপনের লাইনে কারুর সঙ্গে পরিচয় নেই।…আমাদের বাড়ি তখন প্রায়ই আসতেন 'ফ্যামিলি ফ্রেণ্ড' বৃদ্ধ ললিত মিত্তির। তিনি আমার সমস্যার কথা শুনে বললেন, 'কোনো চিন্তা নাই। কীমার কোম্পানীর এ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার

হইল আমাগো দিলীপ গুপ্ত। তারে আমি খুব চিনি। তমারে তার কাছে লইয়া যামু।' ললিতবাবুর প্ররোচনায় তাঁর সঙ্গে রসময় রোডে দিলীপ গুপ্তের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম। ভদ্রলোক মিনিট দশেক নানান প্রশ্ন করে আমাকে বাজিয়ে দেখার পর বললেন 'একটা কাল্পনিক প্রোডাক্ট নিয়ে ছবি ও ক্যাপসান সমেত গোটাচারেক বিজ্ঞাপনের খসড়া করে অমুক দিনে অমুক সময়ে পাঁচ নম্বর কাউনসিল হাউস স্ট্রীটে আমাদের আপিসে চলে এসো; ক্রম সাহেবের সঙ্গে তোমার মোলাকাত করিয়ে দেব।...' কীমার কোম্পানীতে জুনিয়র ভিজুয়ালাইজারের চাকরীতে যোগ দিই এর দুমাস পরে। তখন থেকেই দিলীপ গুপ্ত ওরফে ডি. কে-র সঙ্গে সত্যিকারের পরিচয়ের সূত্রপাত। বিজ্ঞাপনের জগতে কীমারের তখন বেশ নামডাক, এবং তাঁর অনেকটাই নাকি ডি. কে-র দৌলতে।...আমি কাজে যোগ দেবার বছর খানেকের মধ্যেই ডি. কে সিগনেট প্রেসের পত্তন করেন। উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার ও অবনীন্দ্রনাথের শিশু সাহিত্য নিয়েই কাজ শুরু। প্রচ্ছদ অঙ্কন এবং প্রয়োজনে ইলাসট্রেশনের ভার দিলেন আমাকে।...বাংলা বইয়ের অঙ্গসৌষ্ঠবে সিগনেট যে সম্পূর্ণ নতুন ধারার প্রবর্তন করেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এর মূলে ছিল ডি. কে-র গভীর জ্ঞান, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং একরোখা পারফেকশানিজম্।...তাঁর মতে বইয়ের বহিরাবরণ হবে এমন যাতে দোকানের কাউণ্টারে আর পাঁচটা বই থেকে পৃথক হয়ে ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ ছাড়া বইয়ের চরিত্র অনুযায়ী তার আকার আয়তন ও আভ্যন্তরীণ সজ্জার রদবদলেও তিনি বিশ্বাস করতেন। এই পন্থা অচিরেই সিগনেটের বইয়ে একটা বৈশিষ্ট্য আরোপ করে গ্রন্থপ্রকাশনার জগতে রীতিমতো আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো।"

সত্যজিৎ এবং ডি. কে-র যৌথ-প্রয়াসে বইয়ের জগতে বিপ্লব ঘটে যাওয়ার কথা বলেছি একটু আগে। কোন পথে অথবা কেমন করে ঘটলো সেই বৈপ্লবিক পরিবর্তন, তা বুঝতে গেলে দশ বারো বছর আগেকার সিগনেট প্রেস-এর যে কোনও একটা বই হাতে নিলেই স্বচ্ছ হয়ে উঠবে জলের মতো। ঐ-সময়কার চলতি দশটা কিংবা দুশোটা বইয়ের সঙ্গে তার তফাৎটা আপনিই ধরা পড়ে যাবে তৎক্ষণাৎ। সিগনেটের বই মানে শুধু সুদৃশ্য প্রচ্ছদ অথবা উৎকৃষ্ট ছাপা অথবা চমৎকার বাঁধাই

নয়। টাইটেল, ফল্‌স টাইটেল, লাইনো হরফের সাহায্যে হাতের হরফের এলোমেলো এবং নদী-নালাময় কম্পোজিং-এর বদলে শক্ত বাঁধুনির নিরেট ছাপাই, ছাপানো অংশের চারপাশে যথেষ্ট পরিমাণে সাদা অংশের ছাড়, যা মূলতঃ আলোকিত করে কালো অক্ষরের ভরাট জমিকে, বিষয়-অনুযায়ী প্রায় প্রতিটি বইকেই রেখাঙ্কন বা ইলাশট্রেশনে সাজানো, বইয়ের জন্যে বিজ্ঞাপন, বইয়ের পক্ষে মানানসই সাইজ, হরফ এবং ফরম্যাট, এমন একাধিক বিষয়ের দিকে চোখ পড়বে আমাদের, সিগনেট প্রেসের আগে, কিছুটা ব্যতিক্রম হিসেবে একমাত্র 'বিশ্বভারতী' কে বাদ দিলে, যা-নিয়ে তখনকার বাজারী প্রকাশকরা মাথা ঘামায়নি কখনো, সম্ভবত ঘামানোর মতো মাথার অভাবেই।

শান্তিনিকেতনে গিয়েও যিনি সহজপ্রাপ্য সান্নিধ্যের সুযোগ সত্ত্বেও বেছে নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের থেকে দূরত্ব, নন্দলাল এবং শান্তিনিকেতনি ঘরানার মধ্যে বাস করেও ঠিক তেমনি নিজের পক্ষপাতিত্ব ঘোষণা করেছিলেন তিনি ফাইন আর্টের চেয়ে কমারসিয়াল বা এ্যাপ্লায়েড আর্টের দিকেই। সিগনেট প্রকাশিত বইয়ের অলঙ্করণ প্রচ্ছদ, অক্ষর এবং বিজ্ঞাপন-রচনার স্বাধীন-সার্বভৌম সুযোগ হাতে আসার পর এই সত্যজিৎ রায় যে নিজের সমস্ত ক্ষমতা-দক্ষতা এবং প্রতিভাকে উজাড় করে দিয়েই যুগান্তকারী সৃজনে মাতবেন, সেটা অনুমান করা এমন কিছু কচ্ছি কঠিন নয়।

আর ঘটল ঠিক তাইই। সে-একটা সময় গেছে যখন সিগনেট-এর সদ্য বেরোনো একটা বইয়ের সৌরভে আমাদের দিন-দুপুর-সন্ধে-রাত্রি-সপ্তাহ-মাস খুশীতে বিহ্বল। সে একটা সময় ছিল যখন সত্যজিৎ রায়-এর একটা প্রচ্ছদের অভিনবত্ব থেকে আর এক প্রচ্ছদের অনির্বচনীয়তার দিকে অভিযানের নিরবচ্ছিন্ন দর্শক ছিলাম আমরা।

যখন সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'অর্কেষ্ট্রা'র মলাট আঁকলেন, দেখা গেল, কনডেনসড এবং একস্‌প্যানডেড মিলিয়ে পাশাপাশি বসিয়ে দিয়েছেন এমন তিনটি অক্ষর যা ভিন্ন পয়েণ্ট এবং ভিন্ন গ্রুপ-এর। অর্কেষ্ট্রার প্রাণ ধর্ম যে ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন সুরের বৈপরীত্যকে এক অর্থময় ঐকতানে মেলানো, এটা জানেন বলেই অক্ষর-বিন্যাসে ফুটিয়ে দিলেন তার আভাস। যেন তবলা, সেতার আর তানপুরা সাজানো রয়েছে পাশাপাশি।

আবার যখন জীবনানন্দ দাশের 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র প্রচ্ছদ আঁকলেন, অক্ষর বিন্যাস দেখে মনে হল যেন কবি স্বয়ং তাঁর দ্রুত আবেগময়তার টানে দোয়াতের নীল কালিতেই ঝটপট নামটা লিখে উঠে গেছেন বা চলে গেছেন কোথাও। এখানে আর ছাপার হরফের সাহায্য নিলেন না তিনি। ঘুরে তাকালেন ক্যালিগ্রাফীর দিকে।

জিম করবেট-এর 'কুমায়ুনের মানুষ খেকো বাঘ' এর প্রচ্ছদের দু-পিঠ জুড়ে বাঘের গায়ের লোমশ ডোরা। তারই একটা জায়গায় এক টুকরো ছিন্নভিন্ন সাদা অংশ। যেন বাঘের গায়ে গুলী বিঁধেছে ঠিক ঐখানে। আর ঐ গুলী বেঁধার সাদা অংশটাকেই তিনি কাজে লাগালেন বই ও লেখকের নাম বসিয়ে দিতে। কিন্তু এখানেই তাঁর বুদ্ধিদীপ্ততার শেষ নয়। প্রচ্ছদের উলটো পিঠে আমরা দেখতে পেলাম ছিন্নভিন্ন সাদা অংশের আকারটা সামনের প্রচ্ছদের চেয়ে বেশ বড়। যেন গুলীটা ও পিঠে লেগে এ পিঠ দিয়ে বেরিয়ে গেছে বিরাট ক্ষতচিহ্ন এঁকে। এবারে এই বড় মাপের সাদা অংশটাকে তিনি কাজে লাগালেন গ্রন্থ পরিচিতি বা ব্লার্ব-এর জন্য। 'দুরন্ত দুপুর'-এর মলাটে দেখতে পেলাম হুবহু গ্রীষ্মকালীন জলন্ত দুপুরের হলুদ রঙ, প্রচ্ছদের সমস্ত জমিটা জুড়ে। কবিতার বিষয় যেহেতু আধুনিক 'আরবান', তাই জমির উপরে নিবের সরু লাইনে শুয়ে থাকা রমণীর যে ড্রইং, তাতে মাতিসের ছায়া। আবার যেই আঁকলেন জীবনানন্দের 'রূপসী বাংলা'র প্রচ্ছদ, সমস্ত জমিটা ছেয়ে গেল বাংলার মুথো ঘাসের সবুজে। আর সেখানে যে নারীর মুখ আঁকা হল তুলীর তড়িৎ টানে তার পিছনে প্রেরণা হিসেবে রইল বাংলার লোকায়ত শিল্পের ছাপ।

'পরম পুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ'-র প্রচ্ছদ আঁকার সময় তিনি রামকৃষ্ণের মুখ আঁকলেন না। বইটি যে আধ্যাত্মিক চেতনায় সমৃদ্ধ এক অসাধারণ মানুষের জীবনকাহিনী, সেটা মনে রেখেই এর পরিবেশ-রচনায় বেছে নিলেন ভারতবর্ষের চিরপরিচিত নামাবলীর মোটিফ। এবং সে মোটিফ আঁকলেন তুলিতে নয়, কালিতে নয়, সরাসরি রাবার সলিউশনের টিউব দিয়ে। আর এই বিশেষ বিষয়ের সঙ্গে নিবিড় সম্বন্ধ গড়ে তোলার দায়িত্বেই বেছে নিলের পুঁথির প্রাচীন হরফ, নামাঙ্কনের জন্যে। 'পরমপুরুষ রামকৃষ্ণে' যিনি এমন সহজ স্বচ্ছন্দ এবং দেশজ জীবনানন্দের 'বনলতা

সেন' এর প্রচ্ছদে, কবিতার অন্তর্জগতকে মনে রেখেই, তিনি হয়ে উঠলেন জটিল এবং বিমূর্তবাদী। সম্পূর্ণ প্রচ্ছদটিকে ছেয়ে রইল যে নারী, তার বিমূর্ত গড়নে আমরা কখনো খুঁজে পেলাম রবীন্দ্রনাথ, কখনো পলক্লী-র সরু লাইনের স্বতস্ফূর্ত আঁকিবুকির রহস্যময় আদল।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'অমাবস্যা'য় আমরা এমন এক নারী-মূর্তির আদল দেখি, সে যেন সত্যিই অমাবস্যার কালো অন্ধকারে তৈরী, 'জোনাকী'-র প্রচ্ছদে তুলির আঁচড় যেন সত্যিকারের 'জোনাকী'-র ভঙ্গীতে উড়ে বেড়ায় প্রচ্ছদ জুড়ে, গহন নীলের জমিতে হালকা নীলের ব্যঞ্জনায়।

একটু মনোযোগ দিলেই আমরা দেখতে পাবো প্রচ্ছদ নির্মাণের এই বিপুল অভিজ্ঞতা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার দুঃসাহস কী আশ্চর্যভাবে সমৃদ্ধ করেছে তাঁর চলচ্চিত্রকে। 'পথের পাঁচালী'র আগে চলচ্চিত্রের টাইটেল বলতে আমরা বুঝতাম বৃহদাকৃতি এক ধরনের চরিত্রহীন হরফের যথেচ্ছাচার। চলচ্চিত্র হিসাবে যেমন, তেমনি টাইটেল হিসেবেই আমাদের প্রাচীন সমস্ত ধ্যান-ধারণার উপরে নতুন আলো ছড়ালো 'পথের পাঁচালী'। ঐ ছবির প্রধান চরিত্র হরিহর যেহেতু জীবিকার্জন করে পুঁথি লিখে এবং পুঁথি পড়ে, তাই সে ছবির টাইটেলে এবড়ো-খেবড়ো নেপালী তুলোট কাগজে ফুটে উঠল বাংলা পুঁথির হরফ। আবার পরের ছবি 'অপরাজিত'-য় এসে গেল ছাপার হরফ। যেহেতু অপুর কলকাতা-বাসের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল ছাপাখানা। 'দেবী' ছবির জন্যে তৈরী করলেন এমন 'লোগো' যার কাঠামো প্রাচীন মন্দিরের মতো আর যা দেখলেই আমাদের মনে পড়ে যায় অন্ধ ন্যায়-নীতি বিশ্বাসের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ানো এক সংস্কারাচ্ছন্ন যুগের স্মৃতি। খুব সঙ্গতভাবেই 'কাপুরুষ মহাপুরুষ' এর লেখাঙ্কন তাঁর হাতে পেয়ে গেল মাছের আকৃতি। ভারতীয় ধারনায় মাছ যৌনতার প্রতীক। গোলাকৃতিতে সাজানো দুটি মাছের অর্থ, নর-নারীর মিলন। আবার আমরা 'গভীর জলের মাছ' বলি সেই মানুষকে যার মুখোশটা অমায়িক কিন্তু আসল মুখটা চতুর শয়তানের। মাছের প্রতীক এখানে দুটি স্বতন্ত্র কাহিনীর ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে তাৎপর্যময়। বিষয় এবং বক্তব্যের বদল অনুযায়ী যিনি ইতিপূর্বে বদলে দিতে জেনে গেছেন প্রচ্ছদের

রেখা-রঙ এবং অক্ষরের বিন্যাস, সেই শিল্পীর নিজস্ব চলচ্চিত্রেও যে সেই অভিজ্ঞতার ছায়াপাত ঘটবে, এটা এমন কিছু অস্বাভাবিক বা অপ্রত্যাশিত নয় আদৌ।

সিগনেট প্রেসের যখন ভরা যৌবন, তখন সেখান থেকে বেরোতে লাগল বাংলাদেশের গ্রন্থ সংক্রান্ত একটি বুলেটিন। নাম 'টুকরো কথা'। এই 'টুকরো কথা'র জন্যে এক সময়ে তাঁকে আঁকতে হয়েছে অসংখ্য পোর্ট্রেট্। পোর্ট্রেট আঁকায় তাঁর দক্ষতার পরিধি যে কতখানি ব্যাপক তার নিদর্শন 'টুকরো কথা'র পাতায় পাতায় ছড়ানো।

যখন যামিনী রায় বা অবনীন্দ্রনাথ আঁকছেন কলমের সুনির্বাচিত কয়েকটি সরলটানে, তখন জীবনানন্দের বেলায় তাঁর গোলাকার মুখাবয়বের অলৌকিক চাউনির অজ্ঞাত রহস্যকে ফুটিয়ে তুলতে, অসংখ্য কুঁচো লাইনের সমাবেশ। স্বামী বিবেকানন্দের বেলায় শুকনো ব্রাশের মোটা-সরু বলিষ্ঠ টান। আবার নন্দলাল বসু আঁকার সময় হুবহু সেই রকম স্টাইল, যেভাবে নিজের স্কেচ আঁকতেন নন্দলাল। আবার যেই এল গত শতাব্দীর শিবনাথ শাস্ত্রী, অমনি চলে গেলেন উনবিংশ শতাব্দীর কাঠখোদাই-এর কাছাকাছি। 'টুকরো কথা'র বাইরেও বই বা পত্র-পত্রিকার জন্যে এঁকেছেন আরও অনেক প্রতিকৃতি যার মধ্যে রয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, চ্যাপলিন, গ্রিফিথ, বিনোদবিহারী আইজেনস্টাইন, সুকুমার রায় প্রমুখেরা।

প্রতিকৃতি আঁকার এই পারদর্শিতা সর্বতোভাবে সহায়ক হয়েছে তাঁর চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রেও। যখন 'অপুর সংসার'-এর নায়ক খুঁজে পাচ্ছেন না, কাগজে তাঁর নিজস্ব ধারানুযায়ী চরিত্রটির ফ্রন্ট ফেস এবং প্রোফাইল এঁকে তুলে দিয়েছিলেন সহযোগীদের হাতে। সহযোগীরা সেই আঁকা ছবির সঙ্গে মিলিয়েই আবিষ্কার করেছিলেন অপুর সংসারের নায়ককে।

তারও আগে, তাঁর প্রথম ছবি 'পথের পাঁচালী'র শুটিং করছেন যখন বোড়াল গ্রামে, পথ চলতি একটি গ্রাম্য-মানুষকে দেখেই মনে মনে ঠিক করে নিলেন ছবির মিঠাইওয়ালা চরিত্রটির জন্যে। যখন মিঠাইওয়ালার দৃশ্য গ্রহণের সময় আসন্ন, খোঁজ করলেন মানুষটির। কিন্তু নাম বলতে না পারায় গ্রামের মানুষ চিনতে পারল না কাউকে।

হঠাৎ একটুরো কাগজ নিয়ে এঁকে দিলেন মানুষটির পোর্ট্রেট। গ্রামের মানুষ তৎক্ষণাৎ চিনে ফেললে তাকে। তিনিও নিজের বাছাই-করা মানুষকে দিয়েই অভিনয় করিয়ে নিলেন মিঠাইওয়ালার চরিত্র।

পোর্ট্রেট আঁকার এই নৈপুণ্য তাঁর চলচ্চিত্রকে সাহয্য করেছে ভিন্ন ভাবেও। একটি সম্ভাব্য চরিত্রের নাক-মুখ-চোখ-চুল-চিবুক ও ঠোঁট মিলিয়ে সম্পূর্ণ মুখাবয়ব কেমন হওয়া উচিত তা আগাম ভেবে নিতে পারতেন তিনি। ফলে অভিনেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে শতকরা ৮০ ভাগ ক্ষেত্রেই তিনি সার্থক।

ইলাশট্রেটার হিসেবে সত্যজিৎ রায় আমাদের দেশে এখনো অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এই বিপুল কর্মব্যস্ততার মধ্যে প্রধানত নিজের সম্পাদিত শিশু সাহিত্যের পত্রিকা 'সন্দেশ' এর জন্যেই তাঁকে মাসে কম করে আঁকতে হয় ২০/২৫টি ইলাশট্রেশান। এ ছাড়া রয়েছে অন্যান্য চাহিদা। তাঁর ইলাশট্রেশানের প্রধান গুণ, ডিটেল। ডিটেলের প্রতি পুঙ্খানুপুঙ্খ মনোযোগ তাঁর যে কোনো একটি খাঁটি ইলাশট্রেশানের দিকে তাকালেই আমরা বুঝে যাই। অপরিহার্য ডিটেলের সন্নিবেশে গল্পের না-বলা বাস্তবতার গায়ে তিনি এঁটে দিয়েছেন বাস্তবতার এক নতুন মাত্রা। ইলাশট্রেশানের এই কৃতিত্ব তাঁর চলচ্চিত্রকেও সমৃদ্ধ করে আসছে আরম্ভের দিন থেকেই। আইজেনস্টাইন বলেছিলেন. ভালো-মন্দ যেমনই হোক, একজন চিত্রপরিচালকের পক্ষে বিচ্ছিন্ন শট্‌ গুলোর একটা খসড়া ছবি আঁকাটা একান্তভাবেই জরুরী। সত্যজিৎ চিত্রনাট্য লেখেন ছবি এঁকে। কিন্তু এইখানেই দায়িত্ব শেষ নয় তাঁর ; তিনি আঁকেন সেট-এর কাঠামো, আঁকেন চরিত্রদের পোশাক পরিচ্ছদ, আঁকেন বিশেষ বিশেষ মুহূর্তের মেক-আপ। আর নিজের প্রত্যেকটি ছবির প্রচারের জন্যে পোস্টার অথবা স্লাইড অথবা বিজ্ঞাপনের লে-আউট, যার সব কিছুর গায়েই জুড়ে থাকে তাঁর নিজের পরিকল্পনার ছাপ। বাংলা বইয়ের প্রচ্ছদে যেমন, বাংলা চলচ্চিত্রের পোস্টার এবং বিজ্ঞাপনের ধরণ-ধারণে আমূল বিপ্লব ঘটিয়েছেন তিনি একাই। পরবর্তী-কালের আমরা তাঁরই উত্তরসাধক।

সত্যজিৎ রায়ের মুখে প্রথম গান শুনি ১৯৬০-এ, যখন 'দেবী' ছবির শুটিং-এ তাঁর ইউনিটের সঙ্গে বেশ কয়েকটা দিন কাটিয়ে ছিলাম

মুর্শিদাবাদের নিমতিতায়। তখনো নিজের ছবিতে সঙ্গীত পরিচালকের ভূমিকায় আবির্ভাব ঘটেনি তাঁর। যখন 'তিনকন্যা' ছবিতে হাত দিয়েছেন, সেই সময় একদিন বিকেলে তাঁর লেক টেম্পল রোডের বাড়িতে গিয়ে হতবাক। ফাঁকা ঘরে মাত্র দুটি মানুষ। তিনি আর পরবর্তীকালে তাঁর সঙ্গীত পরিচালনায় সহযোগী অলোকনাথ দে। সত্যজিৎবাবু শিষ দিয়ে সুর শোনাচ্ছেন আর তা শুনে নোটেশন লিখছেন অলোকনাথ। তাঁর শিষ দিয়ে সুর তোলাও মুগ্ধ হয়ে শোনার মত। সেই 'তিনকন্যা' থেকেই নিজের ছবির সঙ্গীত পরিচালক তিনি। এখন আর নোটেশন লেখার জন্যে দ্বিতীয় ব্যক্তির সহযোগিতারও দরকার ঘটেনা। পিয়ানোয় তাঁর পাকা হাত। সুর গড়েন পিয়ানো বাজিয়ে। সেখান থেকেই নোটেশান। সেই প্রথম আত্মপ্রকাশের পর থেকে এ পর্যন্ত একটানা নিজের সবকটি ছবির গীতিকার ও সুরকার তিনি নিজেই। নিজের পূর্ণাঙ্গ আর স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবির সঙ্গে অন্যান্য পরিচালকের পূর্ণাঙ্গ ও স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি মিলিয়ে এ পর্যন্ত অবহসঙ্গীত রচনা করেছেন ৩০টির মতো ছবির। এ তথ্য আমাদের সকলেরই জানা যে, শৈশব থেকেই পাশ্চাত্য-সঙ্গীতের সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয়। পরবর্তীকালে ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধেও নিজের জ্ঞান বা ধারণাকে সমৃদ্ধ করেছেন তিনি। এখন কলকাতায় ভারতীয় বা পাশ্চাত্য সঙ্গীতের যে কোনো উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানে প্রথম সারির শ্রোতা হিসাবে তাঁকে দেখতে পাওয়া কোনো বিস্ময়ের ঘটনা নয়। তাঁর ছবির চিত্রনাট্যের গঠনের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায় ভারতীয় অথবা পাশ্চাত্য সঙ্গীতের কাঠামো। আর এ প্রসঙ্গে তিনি আমাদের পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন তাঁর অভিযোগ—"Indian directors tended to overlook the musical aspect of film's structure."

চলচ্চিত্রে আবহসঙ্গীতের ভূমিকা নিয়ে বাংলায় লেখা তাঁর প্রবন্ধটি পড়লে, আমরা সহজেই বুঝে যাই বিভিন্ন ছবির বিভিন্ন এবং বিপরীতধর্মী মুডকে উজ্জীবিত করতে কত বিভিন্ন ধরনের অবহসঙ্গীত রচনার পরিকল্পনা করতে হয়েছে তাঁকে। বলতে গেলে, প্রথম ছবি 'পথের পাঁচালী' থেকেই একই সঙ্গে চলেছে তাঁর দুই ভাষার অন্বেষণ, চলচ্চিত্রের ভাষা এবং আবহসঙ্গীতের ভাষা। আর প্রথম ছবিতেই তিনি ভাঙলেন

দীর্ঘকালের আবদ্ধ সংস্কার। আবহ, কণ্ঠ সঙ্গীত, ধ্বনি, ধ্বনির পারস্পেকটিভ, এমনকি সংলাপের ঘনবদ্ধ সংযম যেন বুড়িয়ে-যাওয়া বাংলা ছবির গায়ে পরিয়ে দিল নতুন যৌবনের সাজ। সবাক বাংলা চলচ্চিত্র মুক্তি পেল তার চক্-কাটা গণ্ডীর সীমাবদ্ধতা থেকে, শব্দের এক ভিন্ন ভূমণ্ডলে। এই প্রসঙ্গে আমাদের বিশেষ ভাবে মনে পড়বে তাঁর 'প্রতিদ্বন্দ্বী' ছবির স্মৃতি। সেখানে পরিবেশীয় ধ্বনি, যেমন ট্রাম্-বাসের গর্জন-মুখর প্রখর আওয়াজ, ময়দানের বিশাল মিটিং-এর অ্যাবষ্ট্রাক্ট শব্দরূপ, বেড়ালের ডাক, এবং অন্যান্য ধাতব ঝংকার মিলিয়ে, অবহসঙ্গীত হয়ে উঠেছিল সমকালীন কলকাতার এক স্মরণীয় সিম্ফনী। আর আবহসঙ্গীতের চরিত্র এবং প্রযোজনের যথার্থতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ বলেই একই ছবিতে তিনি ঘটাতে পারেন ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সহাবস্থান। আবহসঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁর বিভিন্ন রচনা এবং সাক্ষাৎকার থেকে আমরা বুঝতে পারি ভারতীয় রাগ-সঙ্গীতের চেয়ে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের কাছেই যেন সঙ্গীতের দীক্ষা তাঁর। তাই আমরা পড়ি—

"But one element of Western music-namely, modulation from one key to enother I find extremely useful in underlining emotional transitions. The same effect could be obtained by iudigenous means also by transition from one Raga to enother. I find Western iustruments almost iudispensable for creating effects-especially where a dark, sombre mood is aimed at.

১৯৬৯ র আগে আমাদের ভাবনায় উঁকি দেয়নি এমন সম্ভাবনা যে, ক্যামেরা ধরার হাতেই কখনো কলম ধরবেন তিনি। হঠাৎ ঘটে গেল আমাদের পক্ষে সেই সৌভাগ্যের অঘটন। ঠাকুরদা উপেন্দ্রকিশোরের হাতে গড়ে উঠা আর বাবা সুকুমার রায়ের হাতে বড়ো হওয়া 'সন্দেশ' নামে এককালের যে জনপ্রিয় শিশু পত্রিকাটি হারিয়ে গিয়েছিল বিস্মৃতির আড়ালে, নিজে সম্পাদক হয়ে ঘটালেন তার পুনঃপ্রকাশ। এই সুবাদেই তুলি এবং কলম দুটোর দিকেই গভীর মনঃসংযোগ করতে হল তাঁকে। নব কলেবর 'সন্দেশ' এ মাঝে মাঝেই বেরোতো লাগল তাঁর ছোট গল্প কখনো বা এডোয়ার্ড লিয়রের আজগুবী ছড়ার অবাক-

করা অনুবাদ। এসবের কিছুদিন পরেই ধারাবাহিক উপন্যাস 'বাদশাহী আংটি।' এই উপন্যাসেই জন্ম নিল বাংলা গোয়েন্দা উপন্যাসের এক তুলনাবিহীন চরিত্র ফেলুদা, যার ভালো নাম প্রদোষ মিত্র। পৃথিবীর নামকরা গোয়েন্দা সাহিত্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেও বোঝা যায়, ফেলুদা অদ্বিতীয়। উপন্যাসের রঙ্গমঞ্চে প্রথম আলোকোজ্জ্বল আবির্ভাবের আগে, ফেলুদাকে অবশ্য দু-বার উঁকি দিয়ে দেখে নিয়েছিলাম আমরা দুটো ছোট গল্পে। 'বাদশাহী আংটির' পর থেকে ফেলুদাকে নিয়ে বছরে কম করে একটা উপন্যাস এখন আমাদের জন্যে বাঁধা বরাদ্দ। ক্রাইম-থ্রিলার-এ যেমন ফেলুদা, অন্যদিকে তেমনি সায়েন্স ফিকশন-এ প্রফেসার শঙ্কু। শঙ্কু বিজ্ঞানী বুদ্ধিমান প্রতিভাবানও কিন্তু ফেলুদার প্রতিভা দিগ্বিজয়ী। ফেলুদা যেন জীবন্ত এনসাইক্লোপিডিয়া। সাহিত্য, শিল্প, ভাষাতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, আইকনোগ্রাফী, ইতিহাস, এ্যানটিকস্, এক কথায় পৃথিবীর যাবতীয় বিষয় নিয়েই এই ভ্রমণ বিলাসী চরিত্রটির অসাধারণ জ্ঞান এবং আরো জানার অদম্য কৌতূহল। মাঝে মাঝে মনে হয়, এ বুঝি ফেলুদার পোশাকে গা-ঢাকা দেওয়া সত্যজিৎ রায়েরই 'অলটার ইগো'। এমনও হতে পারে যে, কোনও এক দিন সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্র আলোচনাতেও অপরিহার্য হয়ে উঠবে তাঁর এই গোয়েন্দা কাহিনীগুলো। আর সেটা অহেতুক নয়। ১৩৭৬-এ 'বাদশাহী আংটি'তে ফেলুদা গুণগুণ করে গেয়েছিল ওয়াজেদ আলী শাহের গজল 'যব ছোড় চলে লক্ষ্ণৌ'। ১৩৮৫ তে সেই গান ফিরে এল 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ী' ছবিতে। এমন অনুমান নিতান্তই অমূলক নয় যে, ১৩৭৬ থেকে পুরনো লক্ষ্ণৌ নিয়ে শুরু হয়ে গেছে তাঁর উৎসাহ এবং গবেষণা। 'বাদশাহী আংটি'র জন্যে প্রথম রয়্যালটির টাকা পেয়েছিলেন যেদিন, চমকে উঠে প্রশ্ন করেছিলেন, 'লিখে আবার টাকা পাওরা যায় নাকি?' তখন তাঁর পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না যে, দশ বছরে ঐ একটি বইয়েরই হবে ২১টি সংস্করণ। এ পর্যন্ত মোট ১৭ খানার মতো গল্প উপন্যাস লিখেছেন তিনি, চলচ্চিত্র বিষয়ক বই পত্র বাদ দিয়ে। এখন পৃথিবীকে চমকে দিয়ে তিনি বলতে পারেন—

"আমার সংসার চলে লেখার টাকায়।"

তাঁর সাহিত্য কর্ম নিয়ে আলোচনা করতে গেলে লিখতে হয় দীর্ঘ

প্রবন্ধ। তেমনি তাঁর জীবনকে নিয়ে আলোচনা করতে গেল, লিখতে হয় দীর্ঘ উপন্যাস। যেহেতু তাঁর মনন আর দশ দিগন্ত-জোড়া অভিজ্ঞতার সঙ্গে উপমা হিসেবে সমুদ্রই সব চেয়ে স্বাভাবিক।

আমেরিকার এ্যাংরি বা হাংরি জেনারেশনের কবি এ্যালেন গীনস্‌বার্গ একদিন তাঁর কলকাতা বাসের সময় দেখা করতে গিয়েছিলেন সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে। গীনস্‌ কথা বললেন চলচ্চিত্র নিয়ে। আর সত্যজিৎ সারাক্ষণ আমেরিকার অধুনিক কবি ও কবিতার বিষয়ে।

এমনও ঘটে থাকে কখনো যে, হয়তো ঘণ্টা তিনেক সময় কোনো উৎসাহীর সঙ্গে কাটিয়ে দিলেন বাংলা বানান বা ব্যাকরণ নিয়ে। আবার কোনদিন বেশ কয়েক ঘণ্টার আলোচনার বিষয় হয়ে উঠল বাংলা-হরফের চরিত্র। গত বছরে কিছুদিনের জন্যে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন হঠাৎ। স্পণ্ডেলোসিস। এ্যালোপ্যাথির এক্স-রে, ট্রাকশন, ইত্যাদিতেও কাজ হল না যখন ঝুঁকলেন হোমিওপ্যাথির দিকে। অমনি শুরু হয়ে গেল হোমিওপ্যাথি নিয়ে পড়াশুনো। ঐ সূত্রেই আবার যোগ-ব্যায়ামও। আশ্চর্য হবো না এই মুহূর্তে যদি কোনো পাঠকের চোখে ভেসে ওঠে 'জয় বাবা ফেলুনাথ'-এর সেই বিশ্বশ্রী খেতাবওয়ালা ব্যায়ামবীরের ছবি। শুনেছি এক সময় 'প্যারা-সাইকলজি' নিয়েও চর্চা করেছেন গভীর। হয়তো তারই পরিণাম, 'সোনার কেল্লা'।

শুধুমাত্র চলচ্চিত্রের বিচার করতে গিয়ে হয়তো কখনো কখনো আমাদের ঠোঁটে ফুলঝুরির মতো ঠিকরে বেরোয় বিরূপ সমালোচনার ফুলকি। তখন হয়তো তাঁর দৈর্ঘ্যকে ছেঁটে ঈষৎ ছোটো করতে ছুটি আমরা। কিন্তু যখনই মুখোমুখি হই সমগ্র সত্যজিতের, চমকে উঠি নিজেদের খর্বতায়। বুঝতে দেরী হয় না, এখন এসে দাঁড়িয়েছি এক পর্বতের পাদদেশে।

গদারের ছবিতে কবিতা

প্লীজ ফাসেন ইয়োর সীট-বেলট।

যখন আকাশ পথে পাড়ি, বিমানের তাকিয়ায় হেলান দেওয়ার একটু পরেই শিয়রে জ্বলে ওঠে এই আলোকিত নির্দেশ। আর যথার্থ কারণেই 'প্লীজ ফাসেন ইয়োর সীট-বেল্‌ট'-এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে এক ধরনের চাপা আতঙ্ক। বুঝে যাই সামনে সর্বনাশ। শিরা-উপশিরার ভিতর দিয়ে ছিপ-এর মতো তরতরিয়ে ছুটে যায় অজ্ঞাতকুলশীল উদ্বেগ। অনুমান করে নিই এক আসন্ন দুর্বিপাককে, এই আরামদায়ক তাকিয়া থেকে যে আমাকে এখুনি ছিঁড়ে-খুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেবে ভীষণ অজানা কোনো গহ্বরের উদ্ধারহীন অন্ধকারে।

আমরা এখন গদার বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনায় ইচ্ছুক। বলা বাহুল্য, সেই কারণেই 'প্লীজ ফাসেন ইয়োর সীট বেলট'-এর অবতারণা। কারণ গদার বিষয়টি আকাশপথে পাড়ি দেওয়ার মতোই ভীতিপ্রদ, উদ্বেগসঙ্কুল, বিপজ্জনক এবং রহস্যময়। গদার জেট প্লেনের মতই গতিসম্পন্ন। সমপরিমাণ শব্দময় এবং ধ্বনিবহুল। দূরে চলে যাওয়ার পরও জেট যেমন আকাশ-মাটির উপরে আরো কিছুক্ষণের জন্যে রেখে যায় থরথরানো গর্জন-রেশ, আমাদের মস্তিষ্কে গদারের ছবির প্রতিক্রিয়াও তেমনি। ত্রিভুবন কাঁপিয়ে তাঁর চলা। নিয়ম-নীতি এবং প্রচলিত

প্রথার ডাঙাকে অনেক নীচে ফেলে রেখে তাঁর বেপরোয়া ভ্রমণ এমন এক অন্তরীক্ষে, যা আমাদের পক্ষে দুর্গম, দুর্ভেদ্য এবং হয়তো বা কোনো কোনো মুহূর্তে দুঃসহ। পৃথিবী এবং সভ্যতার অগ্রগতি নামক অহংকার সম্পর্কে বিরক্ত এই মানুষটি আমাদের সামনে উন্মোচন করতে চান এমন সব দৃশ্য যা তৃপ্তিদায়কতার ঠিক বিপরীত। সভ্যতা বিলাসী মানুষের আত্মিক বিপন্নতার প্রতি সহানুভূতিশীল এই শিল্পীটি আমাদের জন্যে রচনা করতে চান এমন সব ঘটনাক্রম, যা যুদ্ধকালীন সাইরেনের মতোই বিপদসূচক। গদার কখনোই তাঁর দর্শকের পিঠে হাত রেখে সস্নেহে বলতে চাননা—এসো, দেখো, তৃপ্ত হও। সরাসরি দর্শকের মস্তিষ্কের দিকে তাকিয়েই যেন তাঁর কটাক্ষময় সম্ভাষণ—এসো, দেখো, এবং দীর্ণ হও।

এই পর্যন্ত পৌঁছে যে-সব পাঠক সত্যিই কোমরে সীট-বেলটটাকে আঁটোসাঁটো বাঁধার জন্যে প্রস্তুত, তাদের আশ্বাস দিয়ে বলতে পারি এখুনি এতটা ব্যস্ত হয়ে সীট-বেলটটাকে না বাঁধলেও গড়িয়ে হাড়-গোড় ভাঙার মতো দুর্ঘটনা আপাততঃ সম্ভাবনাহীন। কারণ এ-রচনায় আমরা তাকাবো ভিন্ন এক গদারের দিকে অথবা গদার-চরিত্রের ভিন্ন এক মানচিত্রের দিকে, অর্থাৎ এখন আমরা হাজির হবো সেই গদারের সন্নিকটে, যিনি কবি, কবিতার প্রতি যাঁর কৃতজ্ঞতা আজীবন, যিনি প্রেমিক, পুরুষ ও রমণীর অন্তর্লীন সম্পর্কের আয়নাতেই যিনি প্রতিফলিত করতে চান আধুনিক বিশ্বের যাবতীয় সংকটের আলোছায়াময় দৃশ্যমালা, সোনালী ডানার চিলের মতো কেবলই হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসেন যিনি। আমাদের ভুল হবে যদি ভাবি তাঁর পর্যটনের সমস্ত পথটাই প্রেতচক্ষু অন্ধকার দিয়ে মোড়া অথবা মৃত সব উল্কাপিণ্ডের অট্টহাসি দিয়ে কাঁপানো। একটু মনস্ক হলেই আমাদের চোখে পড়বে তাঁর অনাবেগের ভুবনেও চাঁদ ওঠে, নক্ষত্রসভায় নাচে জ্যোৎস্না, বাঁশি বাজায় মেঘ, পরস্পরকে চুম্বনে এবং আলিঙ্গনে জড়ায় আকাশ এবং সমুদ্র। সেই কারণেই তাঁর সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে 'ফ্রিকোয়েন্টলি রিপালসিভ' এবং 'ডেলিবারেটলি সেলফ কনট্রাডিকটারী'-র আগে বসাতে হয় 'কমপেলিংলি টেণ্ডার'।

বিশ্বাস করা কঠিন হলেও এটা সত্যি যে গদার ভালোবাসাকে বড়

ভালোবাসেন। আর ভালোবাসাকে ভালোবাসার সূত্রেই ছবি, কবিতা এবং গানের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয়। তাঁর যে-কোনো একটা উৎকৃষ্ট ছবির দিকে মনোযোগ ছড়ালেই চোখে পড়বে একটা গোপন ঝরনা, যেখানে অবিরল উদ্গীর্ণ হয়ে চলেছে রূপোলীজলরেখা। এই বিচ্ছুরনের নামই ভালোবাসা।

ফিলমোৎসব ৮২ সূত্রে এবারে 'আলফাভিল' ছবিটি আমাদের দেখা হয়ে গেল। মূলত গোয়েন্দা কাহিনী। 'সাই-ফি' অর্থাৎ সায়ান্স ফিকশনও বলা যেতে পারে অনায়াসে। এ ছবির জন্যে তিনি বেছেছিলেন আরো ভিন্ন দুটো নাম। 'এ স্ট্রেঞ্জ এ্যাডভেঞ্চার অব লেমি কসন।' 'টার্জান ভার্সাস আই. বি. এম'। ফরাসী দেশের বিখ্যাত কমিক স্ট্রীপ থেকে নায়কের নামটি বেছে নেওয়া। কমিক স্ট্রীপের অবধারিত নিয়ম অনুযায়ীই 'আলফাভিল-এর রয়েছে অপরাজেয় গোয়েন্দা, রয়েছে সুন্দরী রমণীকে উদ্ধারের জন্যে তার মরণপণ, রয়েছে আকস্মিক আক্রমণ, হত্যা, রক্তপাত, মৃত্যু, রুদ্ধশ্বাস সাসপেন্স, রয়েছে দৃশ্যের গায়ে ভয়াবহতার সাজগোজ, এবং রকেট-সুলভ গতি। তথাপি কমিক স্ট্রীপের মনোরম তাৎক্ষণিকতাকে অতিক্রম করে আমাদের ভাবনা অথবা চৈতন্যকে যে-মন্ত্রে তিনি পৌঁছে দেন উপলব্ধির নক্ষত্রলোকে, তার নাম কবিতা। তাঁর শ্রেষ্ঠ সব চলচ্চিত্রের মর্মমূলে কবিতার যেন এক পাকা আসন, শান-বাঁধানো বেদী।

'দা সোলজারে' আমরা দেখেছি ফায়ারিং স্কোয়াডের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অবধারিত মৃত্যুর মুখে থুতু ছিটিয়ে একটি মেয়ে আবৃত্তি করে চলেছে মায়াকভস্কির কবিতা। 'দ্য কনটেমপ্ট'-এ ফীজ ল্যাং-এর মুখে দান্তে এবং হেল্ডারলিন। 'ব্যাণ্ড অব আউটসাইডারে' শেকস্পীয়রের রোমিও জুলিয়েট। 'মেড ইন ইউ. এস. এ-তে ডেভিড গুডিস নামক একজন লেখকের সঙ্গে নায়িকা পাওলার প্রথম সাক্ষাৎকারের পর এই জাতীয় কথোপকথন—

পাওলা—আটলান্টিক সিটি-তে কি করছো তুমি?

(ডেভিড তাকিয়ে থাকে টাইপরাইটারে লাগানো সাদা কাগজের দিকে)

ডেভিড—এই আয়নার ভিতরে আমার জীবন্ত আমিটা ভরা এবং

সত্যিই, দেবদূতদের সম্বন্ধে আমাদের ভাবনার মতো, প্রতিবিম্বদের মতো নয়।

পাওলা—কি লিখছো তুমি?

(ডেভিড পাওলার হাতে তুলে দেয় আগের টাইপ-করা কাগজটা।)

ডেভিড—একটা নভেল, যা কখনো শেষ হবে না। যাকে বলবো অসমাপ্ত উপন্যাস।

পাওলা পড়ে।

"কে সেই অভিনেত্রী যার চোখের মণি দুটো ভারী
এবং পুষ্পস্তবকের মতো কালো?
এই জাপানিটি হঠাৎ আমার দিকে তাকাল
যেন 'মানে'-র মতো।
আমার মতো, সন্দেহ নেই, তারও যাবতীয় 'ক্লীসে' কণ্ঠস্থ
যা শুনেছি সেই সব শব্দই সে বলে, তুমি আমাকে হারাবে মাধুকরী
কোনো একদিন, কোনো কোনো দিন।
তাহলে কে ব্যাখ্যা করবে দীর্ঘ যন্ত্রণার এই সব অনুভূতি?
এবং আমার জীবন এবং পৃথিবী,
কে বিশ্বাস করবে এই সবে?
সে ভালবাসতো যা চলে যায়,
এবং আমি ছিলাম সেই রঙ যা সময়ের
সে সব সময়েই বলে যেতো আর কী চাই,
আর কী চাই আমি স্বপ্নে দেখে নিতাম শুনতে শুনতে
একটি নারী হল সেই দরজা যা খুলে দেয় অজানা পথ
একটি নারী সব সময়েই নগ্ন দুটি পায়ের বিজয় উৎসব
তোমার কি মনে পড়ে তার কণ্ঠস্বরে সরু সুরে গাওয়া গান?"

পরে অন্যত্র, বারম্যান এবং ওয়র্কম্যানের সঙ্গে পাওলার কথোপকথন, শব্দের উপযোগিতা দিয়ে যার শুরু।

বারম্যান—মাদমোজেল, শব্দ নিয়ে একজন কী করে?

পাওলা—এটা কি খুব দরকারি?

বারম্যান—আমি তো তাই মনে করি।

ওয়র্কম্যান—তুমি চাইলে আমি একটা বাক্যরচনা করে দেখাতে পারি, কিন্তু সে-রকম ইচ্ছে নেই আমার।

বারম্যান—কেন, ইচ্ছেটা করছে না কেন ?

ওয়র্কম্যান—কারণ বাক্য হল শব্দের সেই গুচ্ছ, যা তৈরী করে 'ননসেন্স', ডিকসেনারীতে এইরকমই লেখা।

পাওলা—কিন্তু ডিকসেনারীতে এরকমও লেখা আছে যে বাক্য হল শব্দের সেই গুচ্ছ যা দিয়ে তৈরী হয় একটা কমপ্লিট সেন্স।

ওয়র্কম্যান—আমি তোমার ব্যাখ্যার সঙ্গে একমত নই আদৌ।

পাওলা—কেন ?

বারম্যান—কেন, একমত নও কেন ?

ওয়র্কম্যান—কারণ বাক্যের পক্ষে কখনোই একই সঙ্গে ননসেন্স এবং কমপ্লিট সেন্স হয়ে ওঠা আদৌ সম্ভব নয়।

বারম্যান—বুঝেছি, তুমি খুশীমতো ব্যাপারটাকে জটিল করছো। তুমি যদি ঠিকমতো বাক্যে কথা না বলো, আমার পক্ষে তোমাকে বোঝা মুশকিল। আর তোমাকে যদি বুঝতে না পারি তাহলে এর পর আর ড্রিঙ্ক সার্ভ করা সম্ভব নয়।

(বারম্যান ওয়র্কম্যানের গ্লাসে মদ ঢেলে দিল)

ওয়র্কম্যান—ঠিক আছে, চেষ্টা করে দেখি।

"এই গ্লাসটা আমার মদ নয়।

বারম্যান এখন তার পেনসিলের জ্যাকেটের পকেটের মধ্যে।

কাউন্টারটা মাদমোজেলকে মেরে চলেছে অবিরল লাথি।

মেঝেটাকে নেভানো হয়েছে সিগারেটে ঘসে।

গ্লাসের উপরে টেবিল।

সিলিং ঝুলছে ল্যাম্পের গা থেকে।

জানালারা মাদমোজেলের চোখের দিকে তাকিয়ে।

আমি তাদের খুলি, আর দরজা বসে পড়ে টুলে।

টেলিফোনের ভিতরে তিন-তিনটে শুঁড়িখানা।

ভদকা দিয়ে বানানো হচ্ছে কফি।···

'পিয়ের ল্য ফু'-এর নায়ক ফের্দিন, নায়িকা মারিয়েন। সভ্যতা এবং শহর থেকে তারা পালাতে চাইছে, পালিয়ে চলেছে, ক্রমাগত

এবং অনায়াস হত্যা, মৃত্যু, দুর্ঘটনা, এবং অত্যাচারের ভিতর দিয়ে, ঝড়ে-ওড়া শুকনো পাতার মতো। পালাতে পালাতে নির্জন প্রকৃতির মাঝখানে এসে তারা থামে। সামনে পাহাড়। পিছনে সমুদ্র। কাঁধের উপরে একটা বনের টিয়া লেখক ফের্দিন, এক পাথর-চূড়ার উপরে বসে হাতে তুলে নেয় ডায়েরী এবং কলম। লেখে—

ঠিক করেছি এখন থেকে ডায়েরী লিখবো। এইখানে, প্রকৃতির মুখোমুখি যখন, যাকে বিশ্বাস করা কঠিন, এইখানেই জীবনের সারাৎসার। ভাষা দিয়ে একে প্রকাশ করাটা এখন জরুরী। আমরা এখন বেঁচে আছি শিকার আর মাছ ধরে। বৃহস্পতিবার: কিচ্ছু না। শুক্রবার: একস্পেরিয়েন্স অব দা ফ্লেশ। দা আইস, হিউম্যান, কানট্রিসাইড। দা মাউথ, অনোম্যাটোপিয়াস হুইচ ডিস্যাপিয়ার বাই বিকামিং ল্যাংগুয়েজ। কবিতার ভাষা উন্মোচিত হয় ধ্বংসস্তূপ থেকে।"

অন্যত্র আরো একবার ডায়েরী লিখতে বসে ফের্দিন। সেখানেও আমরা যা শুনি তা কথার ছদ্মবেশে কবিতাই। এর পরে আত্মহত্যার জন্যে প্রস্তুত ফের্দিন। যখন হাটুমুড়ে বসে থাকে রেললাইনের উপর তখন তার স্বগতোক্তি হিসেবে আমরা যা শুনি, সে রক্ত-উচ্চারণ লোরকার একটা এলিজি থেকে ধার নেওয়া। অন্য কোথাও এক বালকের জন্যে উঁকি মারে রবার্ট ব্রাউনিং।

'পিয়েরে ল্য ফু'-র শরীর যদিও লিওনেল হোয়াইট-এ কাহিনী অবলম্বনে, কিন্তু এর আত্মার পিছনে রয়েছেন র‍্যাবো। 'পাতালে এক ঋতুর' কয়েকটি রক্তাক্ত স্তবকই গদারকে উদ্বোধিত করে এই ছবির নির্মাণে। আর ছবিটি শেষও র‍্যাবো-র চারটি পংক্তির উচ্চারণে।

"আবার খুঁজে পাওয়া গেল তাকে।

কাকে? অনন্ত।

এ হল সেই সমুদ্র

সূর্যের সঙ্গে যার যাত্রা।"

'ম্যাসক্যুলিন ফেমিনাইন'-এর আরম্ভেই কবিতা। কাফের টেবিলে বসে পল যা লিখতে চায়, তাইই আবৃত্তি করে চলেছে মুখে।

গদারের ভাবনা-পদ্ধতির সঙ্গে, চিঠি এবং অক্ষরের মতোই কবিতা ওতঃপ্রোত। তাঁর রচনাবলী পড়তে গিয়ে সেই কারণেই পাতায় পাতায়

বোদলেয়ার, আপোলিনেয়ার, পল ভালেরী, আরাগঁ, ককতো, এডগার এলেন পো, র‍্যাঁবোর প্রসঙ্গ নড়েচড়ে ওঠে অল্প হাওয়ায় ঝাউবনের উদ্‌গত কাকলির মতো। এই দীক্ষার ফলেই সম্ভবত তার যে কোনো ছবির আটপৌরে সংলাপের গায়েও জড়িয়ে যায় কবিতার পালক। তারা যেন উড়ে যেতে চায় এক অর্থ অন্য গভীরার্থের দিকে। আধুনিক কবিতার মতোই তারা তৈরী করে এক মুক্ত ছন্দ।

এখন আমরা ঢুকবো 'আলফাভিল'-এ। 'আলফাভিল' কমপিউটার-শাসিত এক যান্ত্রিক নগর। সিটি অব দা ফিউচার। এই ক্যাপিট্যাল অব কমপিউটারের যিনি প্রধান স্থপতি সেই প্রফেসর ভন বাউনকে হত্যা অথবা ফিরিয়ে আনার জন্যে পাঠানো হয়েছে ফিগারো-প্রাভদা-র সাংবাদিক নিউ ইয়র্ক-জাত লেমি-কশনকে। একটি দৃশ্যে ধরা পড়া লেমির জিজ্ঞাসাবাদ। প্রাথমিক স্তরের জিজ্ঞাসাবাদের পর আলফা ৬০ জানালো, এবার সেকিউরিটি মেজার হিসেবে জিজ্ঞেস করা হবে টেস্ট কোয়েশ্চেন গুলো। এই প্রশ্নোত্তর শুনতে গিয়ে আমাদের হঠাৎ মনে পড়ে যেতে পারে মহাভারতের সেই দৃশ্য যেখানে প্রায় মৃত্যুর কিনারায় দাঁড়িয়ে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির বক রাক্ষসরূপী ধর্মের সঙ্গে জিজ্ঞাসাবাদে রত।

আলফা ৬০—তুমি এসেছ আউটারল্যাণ্ড থেকে। গ্যালাকটিক স্পেস-এর মধ্যে দিয়ে এই আসা-যাওয়া কেমন লাগছে তোমার ?

লেমি—অসীমতার নৈঃশব্দ্য···নাড়া দিয়েছে আমাকে।

আলফা ৬০—মৃতের সুখ কিসে ?

লেমি—আর না-মরায়।

আলভা—রাত্রিকে দিনে রূপান্তর ঘটায় কি ?

লেমি—কবিতা।

. লেমির আগে ডিকসন নামের আর একজনকে পাঠানো হয়েছিল এই একই উদ্দেশ্যে। আলফাভিল-এর আবহাওয়ায় ডিকসন খুইয়ে ফেলেছিল নিজের দায়-দায়িত্বের বোধ। তাই লেমির আগমন, এবং কাহিনীর মাঝখানে লেমির সামনেই ডিকসনের আত্মহত্যা। মৃত্যুর মুহূর্তে ডিকসন লেমির হাতে তুলে দেয় একটা বই। পল এলুয়ারের 'ক্যাপিট্যাল অব পেন'। এদিকে প্রফেসর ভন ব্রাউনের মেয়ে নাতাশার উপর হোটেল কর্তৃপক্ষের নির্দেশ, লেমিকে সাহচর্য দেওয়া। আসলে নজরে

রাখা। একদিন লেমি নাতাশাকে পড়তে দেয় এলুয়ারের কবিতা। নাতাশা পড়ে।

"আমরা বাঁচি আমাদের রূপান্তরের শূন্যতার ভিতরে
কিন্তু সেই প্রতিধ্বনি যা সারাদিন ছুটে বেড়ায়
সেই প্রতিধ্বনি যা সময়ের বাইরে, হতাশা এবং
মমতার বাইরে···
আমরা কি খুব কাছে
নাকি আমাদের বিবেকের থেকে অনেক দূরে।"

নাতাশা বিবেক শব্দের মানে জানে না। সে মানে জানার জন্যে বাইবেল খোঁজে, বাইবেলের বদলে পায় ডিকশেনারী। এখানকার হোটেলের নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেক ঘরেই একটি করে বাইবেল অপরিহার্য, যা মূলত ডিকশেনারী। নাতাশা 'বিবেক'-এর মানে খুঁজে না পেয়ে, যেন দুঃসংবাদ, এমনি ভঙ্গীতে লেমিকে জানায়, এখানে প্রত্যেক দিন নতুন করে ছাপা হয় ডিকশেনারী, আর প্রত্যেকবারই কিছু কিছু শব্দকে বাতিল এবং অপ্রোয়জনীয় হিসেবে উপড়ে তার জায়গায় বসানো হয় অন্য শব্দ।

গত কয়েকমাসে এমনি অসংখ্য শব্দ উবে গেছে। লেমি জানতে চায়, কোন্ কোন্ শব্দ। নাতাশা যখন নামগুলো বলে, লেমি তার নিজের ডায়েরীতে সে সম্পর্কে মন্তব্য লেখে।

নাতাশা—লাল-বুক রবিন—কাঁদতো বলে
মন্তব্য—যারা কাঁদতে পারে তাদের বাঁচানো হোক।
নাতাশা—অটম লাইট···
মন্তব্য—টেণ্ডারনেস।

এই কথোপকথনের মধ্যেই নাতাশা লেমির মুখ থেকে 'ভালোবাসা' কথাটা শুনে প্রশ্ন করে, ভালোবাসা? কি সেটা? লেমি নাতাশাকে আলিঙ্গনে জড়িয়ে, আদরে ভাসিয়ে, শেখায় ভালবাসার বোধ। এর পরে নাতাশার মুখ থেকে আমরা শুনি তার স্বগত-সংলাপ, যাতে উন্মোচিত হয় শুধু কবিতা নয়, একই সঙ্গে ভালবাসারই এক মানচিত্র।

"তোমার কণ্ঠস্বর, তোমার চোখ,

আমাদের নৈশব্দ্য আমাদের সংলাপ, আলো যা চলে যায়, আলো যা ফিরে আসে,

আমাদের দুজনের মাঝখানে একটি হাসি,
জানার ইচ্ছেয় দেখে যাই রাত্রি রচনা করছে দিন,
আমাদের অবয়বে কোনো অদলবদল না ঘটিয়েই···
হে প্রিয়, সকলের প্রিয়, প্রিয়, শুধু একজনের
নীরবতায় তোমার মুখ প্রতিজ্ঞা করেছিল সুখী হওয়ার
ঘৃণা বলে, দূরে আরো দূরে
একটিমাত্র সোহাগে শৈশব থেকে আমাদের ছুটি
ক্রমাগত মানুষের দুর্ভাগ্যকে দেখি
যেন দুটি প্রণয়ীর সংলাপ।
হৃদয়ের আছে কেবল একটিই মুখ।
সবকিছুই অকস্মাৎ।
সব কিছু বলা হয় না ভেবেই।
ভাবালুতা খসে যায়।
মানুষ ঘোরে শহরে।
একটু চাউনি, একটা কথা
আর যেহেতু তোমাকে ভালবাসি, সব কিছু আন্দোলিত
দরকার বাঁচার জন্যে এগোনো, যাওয়া
সোজাসুজি সেই দিকে যা কিছু তুমি ভালবাসো
আমি চলেছি তোমার দিকে, আলোর দিকে অনন্তযাত্রায়
'তুমি যদি হাসো, সেটা এই জন্যে যে
আমাকে ভেদ করে যেতে পারো তুমি
তোমার বাহুর ঊষা যেন কুয়াশাকে বিদীর্ণ করা মণিমুক্তো।"

গদারের চলচ্চিত্র সম্পর্কেও আমাদের এই মুহূর্তের আবছা-ধারণাটাও এইরকমই। নিজের চলচ্চিত্রে, নিজের রচিত কুয়াশাকে তিনি বারবার বিদীর্ণ করে দেন যে মণি-মুক্তোর বিস্তারে এবং বপনে তা আর কিছুই নয়, কবিতা ছাড়া।

ডে সিকা
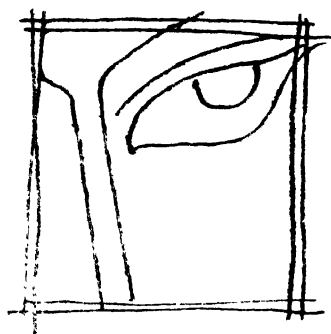
মনে পড়ে ১৯৫২. কলকাতায় সেই প্রথম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। কলকাতা সেই প্রথম ভোর চারটেয় উঠে সিনেমার লাইনে। কলকাতার সেই প্রথম অভিজ্ঞতা, চলচ্চিত্র কতখানি কাছে যেতে পারে মানুষের, সেলুলয়েড নিজের গায়ে মাখতে পারে বাস্তবের কতখানি কালি-ঝুলি। অনেক ছবি দেখেছিল কলকাতা। অনেক ছবির স্মৃতি ধীরে ধীরে মুছে গেছে মন থেকে। বর্ণ, বিবর্ণ। ভোলেনি মাত্র একটি। সে ছবির নাম, 'বাইসিকেল থীভস্'। পরিচালক, ভিত্তোরিয়া ডে সিকা। সেই থেকে ডে সিকা কলকাতার আপনজন।

ডে সিকাকে ভালোবেসেই একবার ভুল করেছিল কলকাতা। ঐ উৎসবের তিন বছর পরে যখন পথের পাঁচালী, কেউ কেউ তাকে সম্মান জানাতে গিয়ে উল্লেখ করেছিল, নিও-রিয়ালিষ্ট। তা কিন্তু নয়। পথের পাঁচালী অন্য ঘরানার। তবু যে কথাটা মনে এসেছিল, তার কারণ বাংলা চলচ্চিত্রে সেই প্রথম কালি-ঝুলি মাখা কর্কশ বস্তুবের আবির্ভাব।

নিও-রিয়ালিজম জিনিষটা একদিনে হয় নি। একজনে গড়ে নি। নানা জনের শ্রম এবং স্বপ্নের ফসল। ইতালীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাস হাতড়ালে দেখতে পাই, তার দাবীদারের সংখ্যা চার। ১। ব্লাসেত্তি ২। ভিসকন্তি ৩। ডে সিকা ৪। রসোলিনি। শেষোক্ত তিনজন

আমাদের চেনা মানুষ। চলচ্চিত্রে এবং প্রবন্ধে। প্রথমজন কিছুটা অচেনা। কিন্তু নিও-রিয়ালিজমের তিনিই অগ্রদূত। তাঁর হাতেই শুরু। শুভ উদ্বোধন। ইতালীতে তখন যে-জাতীয় প্রবল বাজার দর, খ্যাতি এবং খাতির, তার দুটো ভাগ। প্রথম ভাগের নাম, সাদা টেলিফোন। দ্বিতীয়টির নাম, ক্যালিগ্রাফী। সাদা টেলিফোন নামটা দেওয়া হয়েছিল সেই জাতীয় ছবিকে বিদ্রূপে বিঁধে, যেখানে নায়িকার শয্যাগৃহে এবং নায়িকার হাতে সাদা টেলিফোনই আসল আকর্ষণ। আর ক্যালিগ্রাফী হল সেই জাতের ছবি, যেখানে বাস্তব আছে কিন্তু বাছাইকরা। অর্থাৎ বাস্তবের যে অংশটুকু মন ভোলায়, চোখ মজায়, সেইটুকুই খুঁটে খুঁটে জড়ো করা।

এই কৃত্রিম পরিবেশে ব্লাসেত্তি আনলেন ভিন্ন স্বাদ। স্টুডিও-র কৃত্রিম পরিবেশ ছেড়ে খোলামেলা আউটডোরে ক্যামেরা নিয়ে হাজির হলেন তিনি। রং মাখানো অভিনেতা অভিনেত্রীর বদলে বেছে নিলেন সাধারণ চাষীভূষি মানুষ। হালকা হাসির ছবি। তবু যাঁরা বুঝবার বুঝলেন, আসছে দিন বদলের পালা। তার মধ্যে নিও-রিয়ালিজমের লক্ষণ যে পরিমাণে কতখানি ছিল, তার প্রমাণ আর্থার নাইটের নীচের উক্তি।

"Indeed, when Four Steps was first shown in New York, undated, critics assumed it had been made after the war, as part of the movement touched off by Open City."

ছবির পুরো নাম, 'ফোর স্টেপ্‌স্‌ ইন দা ক্লাউড'। ১৯৪২-এ তৈরী। চিত্রনাট্যে সহযোগী, জাভাত্তিনি।

ভিসকন্তির অথবা তাঁর প্রথম ছবি 'ওসেসিওনে'র আবির্ভাব ঐ একই বছরে। ১৯৩৬-এ সহকারী ছিলেন জঁা রেনোয়ার। তিনিই বাৎলে দিয়েছিলেন গল্প। আমেরিকান জেমস ক্রেন-এর 'দি পোষ্টম্যান অলওয়েজ রিং টোয়াইস।' চিত্রনাট্যে সহযোগিতা করেছিলেন তখনকার বিখ্যাত 'সিনেমা' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সমস্ত সদস্য। ইতালী জুড়ে তখন ফ্যাসিষ্ট দাপট। ভিসকন্তির ছবির উপরে ঝুঁকে পড়েছিল তাদের লাল চোখ আর কালো থাবা। মুসোলিনী শেষ পর্যন্ত পুড়িয়ে

ফেলেছিলেন এই ছবির নেগেটিভ। তবু যে সে ছবি বেঁচে রইল, তার কারণ, ফ্যাসিষ্ট সরকারের নির্দেশ অমান্য করে একটা গোপন প্রিণ্ট তিনি দেখিয়ে বেড়াতেন তরুণ বুদ্ধিজীবী মহলে। সেটা বেঁচে গেল। তখনকার বুদ্ধিজীবীদের পক্ষ থেকে সমালোচক পিয়েত্রাঞ্জেলী ঘোষণা করলেন—

"With OSSESSIONE our Cinema was invaded by brutal reality."

ডে সিকা ছিলেন। ডে সিকা এই মুহূর্তে দেখা দিলেন নতুন চেহারায়।

মঞ্চের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা দীর্ঘদিনের। সেখানে তিনি সার্থক কমেডিয়ান। তারপর চলচ্চিত্রে। সেখানে তিনি মহিলা সমাজের প্রিয় তারকা। ম্যাটিনি আইডল। পরিচালনায় প্রথম হাতেখড়ি ১৯৪০-এ। বছর দেড়েক পরে জাভাত্তিনির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। জাভাত্তিনির বন্ধুত্বই বদলে দিল ডে সিকাকে। জাভাত্তিনি বহুদিন থেকে বহু চিত্রনাট্যের রচয়িতা। মন ভরেনি তবুও। তিনি চাইছিলেন আকাড়া জীবন। চাইছিলেন এমন ছবি, যা মানবতায় মণ্ডিত। 'Utile a´ L´homme.' অর্থাৎ 'films of value to humanity'. তাঁর এই মন্ত্রই ইতালীয় চলচ্চিত্রকে দিয়েছিল নতুন জীবন। 'he set the Standard'.

ডে সিকার জীবনেও জাভাত্তিনির প্রভাব কাজ করল অলৌকিকভাবে। জাভাত্তিনির সান্নিধ্য ডে সিকার হালকা সৃষ্টিতে ছুঁইয়ে দিল মানবতার এবং রাজনৈতিক চেতনার গভীর স্পন্দন। ডে সিকা মুখ ফিরিয়ে নিলেন সস্তা সেন্টিমেন্টের ভেজাল দিয়ে বানানো গল্প এবং বস্তাপচা বাস্তব থেকে। তাঁর জন্যে জাভাত্তিনি লিখতে বসলেন চিত্রনাট্য। ছবির নাম 'দি চিলড্রেন আর ওয়াচিং আস'। এক অবহেলিত শিশুর চোখ দিয়ে দেখালেন তার মা-বাবার দাম্পত্য জীবনের ফাটল-এবং ধ্বংস। আসলে দেখালেন বুর্জোয়া সমাজের আপাতঃ ঝলমলে পর্দার আড়ালে লুকিয়ে থাকে কতখানি দুর্বল ক্ষত এবং সবল পাপ। চলচ্চিত্রে এল নতুন আঙ্গিক। এল বাস্তবের, জীবন যেমন, তারই প্রতিচ্ছবি। শোনা গেল ভিন্ন এক আগামীকালের আগমনী।

কিন্তু সমালোচকদের উষ্ণ সম্বর্ধনা সত্ত্বেও, পয়সা পেল না ছবি।

জনতা দেখতে চাইছেন না তাঁদের দেখা-জীবন। মন দমে গেল ডে সিকার। তবু ঘাডটাকে রাখলেন সিধে করে। আবার মিললেন দুই বন্ধু। আবার নতুন ছবির চিত্রনাট্য। ছবির জন্যে আবার ধার দেনা। ছবির জন্যেই এদিক-সেদিক এলোমেলো অভিনয় করে টাকা রোজগার। ছবি হল। কিন্তু মুক্তি পেল না। আপত্তি জানাল ভার্টিকানরা। ১৯৪৪-এ তোলা। মুক্তি পেয়েছিল চার বছর পরে ১৯৪৮-এ। তাও স্বদেশে নয়। প্যারিসেই প্রথম।

১৯৪৫। রসোলিনীর হাতে জন্ম নিল, রোম, ওপেন সিটি। এক ছবিতেই সাড়া তুললেন পৃথিবীর। ওপেন সিটি হয়ে উঠল নিও-রিয়ালিজমের আদর্শ। 'The Key film'. ফিল্ম নেই। আলো নেই। অর্থ নেই। স্বাধীনতা নেই। তারই মধ্যে ছবি। লুকিয়ে-চুরিয়ে, নাৎসী নেকড়েদের নজর এড়িয়ে। ক্যামেরা কখনো বাড়ির ছাদে। কখনো গাড়ির ভিতরে, আড়ালে। যে ছবি তৈরী হল, তার মধ্যে পারিপাট্যের অভাব। অপরিষ্কার। অগোছালো। কখনো কখনো অসহ্য হয়ে ওঠে দেখা। তবু, সব মিলিয়ে, সে অন্য, অনন্য। তার পরতে পরতে বিদীর্ণ জীবনের নিশ্বাস-প্রশ্বাস, মায়া-মমতা, উদ্বেগ-আতংক এবং আশা-আকাঙ্খা। 'it's roughness, it's lack of finish became a virtue.' নিজের ছবি সম্পর্কে রসোলিনী বললেন, এই হল জীবন অথবা বাস্তব। 'This is the way things are' এবং তাঁর এই সহজ উচ্চারণটুকুই হয়ে উঠল 'The credo of the entire Neo-Realist movement'.

ওপেন সিটির সাহস এবং সাফল্য থেকে ডে সিকা শুষে নিলেন নিজের জন্যে অনেকখানি প্রাণশক্তি। হাত দিলেন নতুন ছবিতে। সু-সাইন। নজর নামালেন সমাজের নীচের তলার অবক্ষয়ের, পোকা পড়া ঘায়ের দিকে। 'সু-সাইন' এবং 'ওপেন সিটি' একসঙ্গে দেখানো হল আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে। বিশ্বের সম্মান মাথায় নিয়ে এঁরা দুজনেই হয়ে উঠলেন ইতালীয় চলচ্চিত্রের নেতা। তারপর ১৯৪৮।

তারপর 'বাইসিকল্ থীভস্'। ডে সিকার জীবনের অদ্বিতীয় সৃষ্টি। কোনো ইতালীয়ান প্রযোজকই পয়সা জোগাতে রাজী হননি এ ছবিতে। তার পিছনে নিয়তি অথবা ইতিহাসের নির্মম পরিহাস। নিও-রিয়ালিজম

নিয়ে সারা পৃথিবী যখন আলোচনায় মুখর, খোদ ইতালীতে সে তখন সতীনের ছেলে। প্রযোজকরা যে এগিয়ে আসতে গররাজী, তার পিছনে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের হুমকী-মেশানো নির্দেশ। মুসোলিনী, জাভাত্তিনি এবং ডে সিকার উপর সরকারী নজর তখন বড্ড কড়া। কারণ এই লোকগুলো যে জাতের ছবি বানাচ্ছে, তা ইম্‌মরাল। এই ইমমরালিটির অপরাধেই 'সু-সাইন' ১৯৪৬-এ পঠোনো হলো না কান ফেস্টিভ্যালে। ইতালীতে তখন আমেরিকান প্রযোজকদের আনাগোনা খুবই। ডে সিকাকে টাকা জোগাতে রাজী হলেন ডেভিড ও সেলজেনিক। তাঁর শর্ত কেবল একটাই। প্রধান চরিত্রে চাই একজন নামডাকওয়ালা অভিনেতা। তিনি নাম করলেন ক্যারী গ্রাণ্টের। ডি সিকা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন সেই মনোরম প্রস্তাব।

যেমন করে এসেছেন চিরকাল, তেমনি করেই, অর্থাৎ মঞ্চ এবং চলচ্চিত্রে অভিনয় করে জোগাড় করলেন ছবি তোলার রসদ। 'বাইসিক্‌ল্ থীভস্' তৈরী হল। চিত্রতারকাহীন। প্রধান চরিত্রে কারখানার একজন মজুর। তার শিশু সন্তানের ভূমিকায় ফুটপাতে কাগজ বিক্রী করা একটি ছেলে। কান-এ পুরস্কৃত হল এ ছবি। কিন্তু স্বদেশের জনতা ভুলে গেল মালা গাঁথতে। কারণ, "What the Italians wanted was the glitter, the glamour, the romance of the Hollywood movies after their years of misary and privation." 'বাইসিক্‌ল্ থীভস্'-এর পর 'মিরাকল ইন মিলান।' বাস্তব এবং কল্পনা, রূঢ় গদ্য এবং রম্য পদ্য দুটো মিশিয়ে। ১৯৫১-র। ১৯৫২-য় 'উমবার্তো ডি'। ১৯৫৩-য় 'ইনডিসক্রিশন অফ এ আমেরিকান ওয়াইফ'। প্রযোজক সেই একদা-প্রত্যাখ্যাত সেলজোনিক প্রধান চরিত্রে প্রখ্যাত দুই চিত্রতারকা: জেনিফার জোন্‌স এবং মণ্টেগোমেরী ক্লিফট। আমেরিকান সংস্করণে ডে সিকাকে না জানিয়েই প্রচুর কাঁটা-ছাঁটা বলতে গেলে নতুন করে সম্পাদনা করা। ১৯৫৬-য় Il Teito, সামাজিক সমস্যার সঙ্গে কিছুটা হালকা রসের ভিয়েন। ১৯৬০-এ অসকার জয়, 'টু-উওম্যান'-এর জন্যে। নিও-রিয়ালিষ্ট ধারার শেষ ছবি তাঁর হাতে।

তার পরেও তিনি থেমে থাকেননি। কিন্তু কিছুটা যেন ম্লান।

যেন ক্লান্ত। যেন মৃত আগ্নেয়গিরি। উত্তাপ আছে হয়তো বা ভিতরে, বাইরে উদ্‌গীরন নেই। হয়তো চান পুনরায় ঝাঁপ দিতে সেই মানুষের জীবনে, যাদের সর্বাঙ্গে কাঁটা এবং কাদা। কিন্তু পারেন না।

পর্বতকে ঘুরে বেড়াতে হয় নিরুদ্দেশ মেঘের মতন। কিন্তু এই পরিণাম কি শুধু একা ডে সিকার? না নিও রিয়ালিষ্ট আন্দোলনের সকল নায়কেরই? এবং তাই যদি হয়, তাহলে খোঁজা যাক পতন-অভ্যুদয়ের কারণগুলো।

পয়লা নম্বর কারণটা সম্ভবত, যুদ্ধোত্তর অর্থনীতি। ইতালীয় চলচ্চিত্রের বাজারকে ইউরোপে ছড়িয়ে বিদেশী মুদ্রা রোজগারের তাগিদে সরকার গ্রহণ করলেন অনেক রকম পরিকল্পনা। হলিউডকে দেওয়া হল ইতালীকে ছবি করার সুযোগ। নিও-রিয়ালিষ্ট আন্দোলনের চূড়ান্ত সার্থকতা এবং গৌরবের মুহূর্তেই ইতালীতে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল হলিউড। তার পরে ফ্রান্স। প্রভাব এবং প্রতাপটা অবশ্য হলিউডেরই বেশী। শুরু হয়ে গেল জমজমাট কো-প্রোডাকসন। ১৯৪৯-এ যেখানে ১০টা ছবি, ১৯৫৩-য় সেখানে ২৫। কিন্তু নিও-রিয়ালিষ্ট ছবির পিছনে দাঁড়াবার লোক নেই। ইতালীর যে-সব প্রযোজক তখন চলচ্চিত্রের কর্ণধার তাদের পক্ষ থেকে কার্লো পণ্টি ১৯৫৩-য় ঘোষণা করলেন—"if a producer is brave enough, he can take a risk, but only once. The second time, he prefers to invest his money in films of pure entertainment, from which he is sure to get a return…" বামপন্থী সমালোচকরা স্বীকার করলেন, নতুন রাজধানী, নতুন সেন্সারশিপ্‌ ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটদের প্রাধান্য ইত্যাদিই হল নিও-রিয়ালিষ্ট আন্দোলনের পতনের কারণ।

'In Italy in 1947 a government was formed of a coalition of centre parties. In 1949 the conventional majority of the film Industry demanded governed control and aid to promore production, and Ginlio Andreotti, head of the state department of 'Spectacle', was put in charge. The Andreotti law included powers of censorship. political and otherwise, to

discourage the making of films derogatory of Italian society. In 1946 woman's suffrage had been introduced and the Church's influence gradually built up the female vote to outnumber the male so that in the election of 1953-4 a Christian Democrat government was elected, right of centre. By 1955 neo-realism is dead'.—Thorold Dickinson.

নিও-রিয়ালিজম-এর মৃত্যুর কারণ ছিল আরও। ডে সিকা জানতেন সেটা। এবং স্বীকারও করেছেন।

"The crisis of neo-realism is due precisely to the fact that we have exhausted in particular reality which characterized the German occupation and the postwar period···is totally inadequate to represent the new reality."

সামাজিক দারিদ্র এবং বঞ্চনা, সেই সঙ্গে ব্যক্তিগত দারিদ্র এবং বঞ্চনা, ক্রমাগত এই দুয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে ডে সিকা যে একদিন নিজেকে নিঃশেষিত বোধ করবেন, সেটাও খুব অস্বাভাবিক নয়। এবং এই রকম দুর্বল মুহূর্তে, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের আকাঙ্ক্ষা যে তাঁকে চিরাচরিত অথবা তার চেয়েও বেশী রোমাঞ্চকরতার কাছে আত্মসমর্পনে বাধ্য করবে, সেটাও অস্বাভাবিক নয় খুব। তাই হয়েছিলেন তিনি।

"Because of political condition and because Hollywood's capitalization upon Italian film industry sapped even De Sica's strength of purpose."

বাস্তবতার প্রতি, জীবনের গভীরতর অসুখ-বিসুখের প্রতি পুনরায় এবং বারবার মনোযোগ দিতে গেছেন তিনি। কিন্তু সে-ছবির সর্বাঙ্গে কি করে যেন কেবলই ফুটে উঠেছে, elegant glossiness and a growth in the sentimentalaty.

এমনটা যে ঘটবে এটা যেন আগে ভাগেই টের পেয়েছিলেন পরবর্তীকালের পরিচালকরা। তাঁরা জানতেন বাস্তবের অথবা জীবনের

উপরকার শুকনো চামড়াকে মূলধন করে দীর্ঘজীবী করা যাবে না চলচ্চিত্রকে। এটা আগাম অনুভব করেছিলেন বলেই ডে-সিকাদের দুই প্রতিভাধর উত্তরাধিকারী, ফেলেনি এবং আন্তোনিয়নী, তাকিয়েছিলেন চামড়া ভেদ করে মানুষের গভীর মর্মমূলের দিকে।

"it is no longer enough for a film to describe a sunday's search for a bicycle stolen from an unemployd billposter who needs it for his new job. One wants to know the man. Neo-realism meticulously explored surfaces : it never probed beneath the skin."

যুদ্ধোত্তর য়ুরোপের জটিল মানসিকতা, অন্তরের ভিতরে অন্তর্ঘাতী অবক্ষয় এবং ধ্বংসের কাছাকাছি থেকেও ডে-সিকার পক্ষে সম্ভব হলনা, তাকে চেনা। এবং নিজের এই অক্ষমতাকে তিনি প্রকাশ করেন নির্দ্বিধায়।

'After the terrible war, myself and my colleagues try to change a little this horrible distance between human being, the pictures hope communicate solidarity is more remote, distance far more great, there is violence, cruetly. I hate this period, I don't understand this period. Criminality is too much for my soul, I can't describe the violence like Kubrick. Kubrick is very clever, I admire him, but my artistic possibility, for this horrible life, this horrible relationship between human being, I can't…I like poetry, I like woman, I am not a moralist but I don't like to see women in pornographic picture, like animals…my goal in pictures is poetry and humanity, humanity and poetry.'

ডে সিকা চরিত্রবান। তাই তাকেই সাজে এমন অকপট স্বীকারোক্তি। ডে সিকা হৃদয়বান। তাই তাঁকে বিচলিত করে একালের রক্তাক্ত ক্ষত। ডে সিকা মানবিক। তাই মানুষের ভিতরকার অস্থিমজ্জার

ভাঙচোরের চেয়ে তাঁকে বেশী কাঁদিয়েছে মানুষের ওপরকার বেদনা এবং বিপন্নতা। তাঁকে বিচার করবো ঠিকই, কিন্তু যেন না ভুলি সুস্থ এবং সৎ চলচ্চিত্র, সুস্থ এবং সৎ পৃথিবী নির্মাণের জন্য স্বচ্ছল এবং খ্যাতিমাখানো মঞ্চ থেকে কিভাবে একদিন তিনি নেমে এসেছিলেন এক বর্বর যুগের নখদন্তময় অন্ধকারে। কিভাবে পুড়েছিলেন সৃষ্টির সুখে এবং সর্বনাশে।
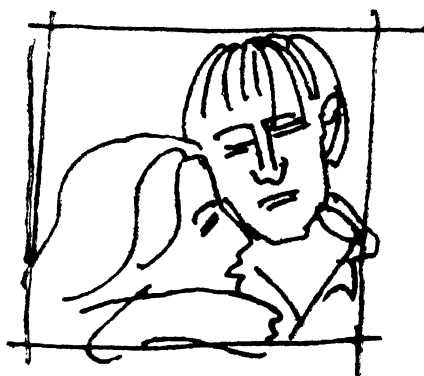
কবি পাসোলিনী

"So to make films is to be a poet."

কলকাতার বাতাসে এখনো খুব পুরনো হয়নি পাসোলিনীর নাম। যে দ্রুতগতিতে ডে-সিকা, ফেলিনি, এ্যান্তোনিয়নি দিগ্বিজয় করেছেন এদেশে, পাসোলিনীর আবির্ভাব অথবা আত্মপ্রকাশ সে তুলনায় অনেক মন্থর। এ পর্যন্ত কলকাতার সীমাবদ্ধ কিছু দর্শক তাঁর মাত্র দুটি ছবির সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয়ে অভিজ্ঞ। প্রথম, 'গসপেল অ্যাকর্ডিং টু সেণ্ট ম্যাথু'। দ্বিতীয়, 'ইডিপাস রেক্স'। প্রথমটি শাদাকালো। দ্বিতীয়টি রঙীন। দুটি ছবির প্রদর্শনীর মধ্যে অন্তর্বর্তী ব্যবধান দীর্ঘ চার পাঁচ বছরের।

পাসোলিনী প্রথমে কবি। তারপর ঔপন্যাসিক। তারপর চলচ্চিত্রকার। না, ভুল বলা হল। প্রথমে, অল্প কিছুদিন চিত্রকর। কলা-সমালোচক। তারপর কবি। তারপর ঔপন্যাসিক। সাংবাদিক। সমালোচক। 'নাউ থিয়েটারে'র উদ্ভাবক ও সংগঠক। এরপর সবকিছু ছাড়িয়ে, সবকিছুর ঊর্ধ্বে, চিত্রপরিচালক। অন্তর্গত অস্থিরতাবোধ তাঁকে বারবার টেনে নিয়ে গেছে সৃষ্টির এ-ঘর থেকে ও-ঘরে, এক প্রাসাদ থেকে আরেক প্রাসাদের অন্দরমহলে। বারবার আলোড়িত হয়েছেন ক্যাথলিক গোঁড়ামি বনাম মার্কসীয় বিশ্বাসের সংঘর্ষে। সমাজের নানান স্তরের পলেস্তারা-

খসা ফাটলকে জোড়া লাগাবার সবল সিমেন্ট খুঁজেছেন নিজের সৃষ্টিতে। কখনো পেরেছেন, কখনো পারেননি। সমাজের সঙ্গে তাঁর এই বিরোধ এবং দূরত্ব এক সময়ে এমন প্রবলতর হয়ে উঠল যে, স্থির করলেন পাল্টে ফেলবেন ন্যাশানালিটি। এবং প্রতিবাদে বন্ধ করে দিলেন উপন্যাস এবং কবিতা। আর ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁকে বাঁচাল যে উজ্জ্বল আগুন, তার নাম চলচ্চিত্র।

"ক্রমাগত, যত ভিতরে ঢুকতে লাগলাম, বুঝলাম চলচ্চিত্র সাহিত্যের আঙ্গিক বা কলাকৌশল নয়। এর আঙ্গিক-এর নিজের। ইটালী এবং ইটালীয়ান সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে আমি প্রথমে উপন্যাসে এবং পরে কবিতাকে ত্যাগ করে ছিলাম স্বেচ্ছায়। আগে বহুবার আমি বলেছি, আমি আমার ন্যাশানালিটি পাল্টে নিতে ইচ্ছুক। ইটালীয়ান ছেড়ে অন্য ভাষায় কথা বলবো। এবং সেই সময়েই বুঝতে পারলাম, চলচ্চিত্রের ভাষা কোন বিশেষ দেশের ভাষা নয়। আমার মতে, এটা হল, ট্রান্সন্যাশনাল। ইণ্টারন্যাশনাল নয়। কারণ ঐ শব্দটার নানা অর্থ। বরং বলতে পারি, ট্রান্সক্লাস। কারণ একজন শ্রমিক, একজন বুর্জোয়া, একজন ঘানার বাসিন্দে অথবা একজন আমেরিকান যখন চলচ্চিত্রের ভাষায় কথা বলে, তখন সকলেই ব্যবহার করে একটা 'common system of sign,' তাই প্রথম দিকে মনে হয়েছিল এটাই হচ্ছে সমাজের বিরুদ্ধে আমার প্রতিবাদের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার।"

বুর্জোয়া সমাজের প্রতি তাঁর ঘৃণা কর্ণের কবচকুণ্ডলের মত সহজাত। প্রথম যৌবনে ছিলেন মার্কসিস্ট। অবশ্যই মাথা-মুড়োনো নন। পার্টির কাগজে লিখেছেন। আবার অন্য কাগজে পার্টির মতবাদের বিরুদ্ধেও ধরেছেন কলম। পরিণত বয়সে, নন্‌কনফরমিস্ট। পার্টির সদস্যপদের প্রাথমিক মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ার পর দ্বিতীয়বার সেটাকে 'রিনিউ' করে নেবার তাগিদ অনুভব করেননি কোনদিন। এর মূল কারণ অন্যত্র। শহুরে রাজনীতি, কাগজ-কলম-শ্লোগানের পলিটিক্‌স, বুর্জোয়া, পেটি-বুর্জোয়া সমাজের ন্যায়-নীতির উপর আজীবনই তাঁর ছিল আস্থার অভাব। তাঁর চলচ্চিত্রে সেই কারণে সর্বপ্রধান বিষয়, মানুষের পবিত্রতা। 'গসপেল' তৈরির পর কোন এক সময়ে তাঁর নিষ্ঠুর মন্তব্য—

"My film is a reaction against the conformity of

Marxism. The mystery of life and death and suffering—is something which marxist do not want to consider."

বুর্জোয়া সমাজ সম্বন্ধেও বহুবার উচ্চারিত হয়েছে বহু মর্মান্তিক উক্তি—

"সমাজতন্ত্রের দিক থেকে, আমার অবস্থান 'টিপিক্যাল'। এর ব্যাখ্যা করা যায় না। পিছনে রয়েছে ছেলেবেলা থেকে গড়ে ওঠা আবেগের স্তর। বাবার সঙ্গে সংঘর্ষ। সংঘাত চারপাশের পেটি-বুর্জোয়া পরিমণ্ডলের সঙ্গে। বুর্জোয়া সমাজের প্রতি আমার ঘৃণা ডকুমেন্ট দিয়ে প্রমাণ অথবা যুক্তি-তর্ক দিয়ে প্রমাণ খাড়া করা অসম্ভব। সেটা আছে, এইটেই সত্যি।"

"বুর্জোয়া-বুদ্ধিজীবীদের আমি কখনো ভালবাসতে পারিনি, বরং ঘৃণাই করেছি। অন্য একটা অনুভূতি জাগত মনে। যেন বাইরে থেকে জুড়ে আছি আমি এদের সঙ্গে। সেটা আরো স্পষ্ট এবং খাঁটি হয়ে দেখা দিল তখন, যখন শ্রমিক, বিশেষ করে কৃষক সমাজের প্রতি সত্যিকারের আত্মীয়তা অনুভব করলাম মনে-প্রাণে।"

"জন্মেছিলাম ফ্যাসিস্ট যুগে। ফ্যাসিস্ট পৃথিবীতে। কিন্তু আমি, হয়তো সেই জন্যেই, গোড়ায় গোড়ায়, ফ্যাসিজমকে দেখতে পাইনি। ঠিক যেমন মাছ দেখতে পায় না, সে রয়েছে জলে। এটা বলছি ছেলেবেলার কথা। যখন বয়স ১৪/১৫, ছেড়েছিলাম অ্যাডভেঞ্চারের বই পড়া। ছেড়েছিলাম 'হেল মেরী' বলার অভ্যেসটাও। হয়ে উঠলাম 'এ্যাগনসটিক'। ঘাড়ে চেপে বসল সাহিত্যিক হওয়ার বাসনা। পড়তে লাগলাম শেক্‌স্পীয়র, ডস্টয়ভস্কি। আর ঠিক সেই সময়ে আমার এবং সমাজের মাঝখানে ক্রমশ বেড়ে উঠতে লাগল ব্যবধান, বৈষম্য। কিন্তু তখনো আমার 'অ্যান্টি-ফ্যাসিস্ট' মনোভাবটা ছিল 'absolutely cultural.' কিন্তু শেক্‌সপীয়র এবং ডস্টয়ভস্কি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে, সেই সঙ্গে রয়েছে র‍্যাবো এবং অন্যান্য 'হারমেটিক' কবি, যাদের সৃষ্টিকে ফ্যাসিবাদ গ্রহণ করেনি কখনো, বাতিল করে দিয়েছে সদম্ভে, সেগুলোই একদিন আমাকে বুঝিয়ে দিল যে আমি রয়েছি সমাজের বাইরে। অথবা সমাজ আমাকে ডাকছে একটা মুখোমুখি

চ্যালেঞ্জে। এটা বোধ হয় কবিতা-পাঠের দান।"

"মানুষ প্রথম যে কবিতা পড়ে তার ছাপ রয়ে যায় চিরকাল। ম্যাকবেথ আর ডস্টয়ভস্কির 'ইডিয়ট' এখনো তার সমস্ত আবেগ দিয়ে আমার চেতনায় উপস্থিত। আমার জীবনে তাদের মূল্য অপরিসীম। আমি যা বলতে চাইছি তা নিছক সংস্কৃতির ব্যাপার নয়। সংস্কৃতি কখনো কখনো মানুষের চেতনার স্তরে, অনুভূতির জগতে এমন তীব্র আলোড়ন তোলে যেন মনে হয়, কোনো প্রাকৃতিক ঘটনা। ঘটাচ্ছে প্রকৃতিই। তারপর ওই অনুভূতির আদলেই গড়ে ওঠে একজনের মানস-প্রকৃতি। সেটা একবার গড়ে উঠলে, বদলানো শক্ত। সেখানে বিবর্তন ঘটতে পারে। কিন্তু মূল শিকড়টা রয়ে যায় অনড়।"

নিজের সৃষ্টিতে শুদ্ধতা, এবং সিদ্ধির প্রয়োজনে তিনি সমকাল ছেড়ে ক্রমশ এগিয়ে চলেছিলেন প্রাচীন উপকথা নীতিকথা অথবা ধর্মীয় কাহিনী অথবা গ্রীক নাটকের অগ্নিবর্ণ ট্রেজেডির দিকে। তিনি মানুষকে দেখতে অথবা দেখাতে চেয়েছিলেন তার আদিম, সরল পবিত্র এবং দীর্ণ বিদীর্ণ চেহারায়। বুর্জোয়া সমাজ কুরে কুরে খেয়ে নিয়েছে মানুষের জীবন থেকে পবিত্রতার সমস্ত স্বাদ গন্ধ। প্রাচীন উপাখ্যানকে তাঁর সেই কারণেই প্রয়োজন।

"The motivation of all my films is to give back to reality its original significance."

তাঁর চলচ্চিত্র কখনো ক্ষেপিয়ে তুলেছে শাসন কর্তাদের। কখনো ক্যাথলিক পুরোহিতদের। কখনো বামপন্থীদের। যখন বামপন্থা ছেড়েছেন, তখনো ছাড়েননি সেই সব মানুষকে, সমাজ-বিজ্ঞানের ভাষায় যারা 'sub-proleteriet.' যেহেতু ওরাই হল বুর্জোয়া সমার্জের সবচেয়ে নিকৃষ্ট ফসল এবং উৎকৃষ্ট প্রতিবাদ। রোমের উপকণ্ঠে পন্টি মামোলা। নগ্ন, নষ্ট, বস্তী এলাকা। ছিঁচকে চোর, বেশ্যা আর বেশ্যার দালাল অধ্যুষিত সেই নরকের ধুলোর ভিতরেই ছিল তাঁর প্রিয় বসবাস। তাদের জীবনযাপন, আচার-আচরণ, ভাষা ও ভঙ্গীর সঙ্গে আত্মীয়তা। যখন নিজে পরিচালক হননি, চিত্রনাট্যে সহযোগিতা করেছেন [illegible] জনকে। তার মধ্যে প্রথম নাম বোলগনিনি। বোলগনিনি ছবি করেছেন পাসোলিনীর একাধিক উপন্যাস অবলম্বনে। চিত্রনাট্য পাসোলিনীর।

আর একবার ডাক এল ফেলিনির কাছ থেকে। তাঁর 'Le Notti di Cabiria' ছবির নীচুতলার চরিত্রদের সংলাপ লিখে দেওয়ার জন্যে। পাসোলিনী লিখেছিলেন।

প্রশ্ন করা হয়েছিল, যেসব পরিচালকদের সঙ্গে তাঁর মানসিক ব্যবধান দীর্ঘ, তাঁদের সঙ্গে তিনি কাজ করেছেন কেন? যেমন বোলগনিনি এবং ফেলিনি। অথচ কাজ করেননি তাঁদের সঙ্গে যাঁদের মত এবং মনের সঙ্গে অনেকখানি মিলবার জায়গা। যেমন রসোলিনি। পাসোলিনীর উত্তর, কারণটা নিছক বাস্তব। যখন রোমে এসেছিলেন, আপাদমস্তক বেকার। দারিদ্র্য কুরে খাচ্ছে দিনরাত। চুল-দাড়ি কামাবার পয়সা নেই। স্কুল খুলেছিলেন ছেলে পড়ানোর, রোমের উপকণ্ঠে, পন্টি মামোলোয়। রোজগার হতো মাসে ২৭,০০০ লিরা। তাতেও চলেনা। তার কিছুদিন পরে যখন বেরোল প্রথম উপন্যাস, অল্প-সল্প টাকা আসতো রয়্যালটি বাবদ। সেটাও সচ্ছলতার পক্ষে যৎকিঞ্চিৎ। আরো কাজ চাই। যে-কোনো কাজ। তখনই হঠাৎ বনে গেলেন চিত্র-নাট্যকার। কার কাজ করছেন সে প্রশ্ন মাথায় আসেনি একবারও। কাজ পাওয়ায় আনন্দেই মশগুল। তবে যাদের সঙ্গে কাজ করেছেন, অভিযোগ নেই কোনো। বরং খুশি। কারণ মানুষগুলো ভাল। স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ মিলেছে সকলের কাছেই।

ছ' বছরের ঔপন্যাসিক জীবন শেষ করে যখন নিজে পরিচালক হলেন, তখন তাঁর ছবিতে ঐ নীচু তলার চরিত্রেরাই নায়ক। ঐ নরকই তাঁর চলচ্চিত্রের চালচিত্র।

প্রথম ছবি 'এক্যাটোনে'। প্রথম ছবি থেকে তিনি নিজেও হয়ে হয়ে উঠলেন নায়ক, ইতালীর 'মুয়েলভাগ' বা 'আভাঁ গার্দ' আন্দোলনের।

প্রথম ছবিতেই চমকে উঠলো ইতালী। ইতালীর ক্যাথলিক এবং মার্কসিস্ট, দুই পক্ষই। দুই পক্ষই আক্রমণ করল ছবিকে। তারপরের ছবি 'মাম্মা রোমা'। সেখানেও ছবির বিষয় সমাজের নীচুতলার নরক। পরের ছবি 'রো-গো-পাগ'-এর একটা অংশ। এ ছবির চারটে পর্ব, চারজন পরিচালকের। চারে মিলে একটা ছবি। পাসোলিনী ছাড়া বাকি তিনজন হলেন রসোলিনি, গদার আর গ্রেগোরেত্তি। পাসোলিনীর অংশের নাম ছিল 'লা রিকোত্তা'। এক

বিশেষ চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন, অরসন ওয়েলস। তাঁর মুখে ছিল পাসোলিনীর একটা কবিতা। 'লা রিকোত্তা' তাঁকে পুরস্কার দিয়েছিলো চারমাসের সশ্রম কারাদণ্ড। এবং মাসের পর মাস নিন্দা এবং ধিক্কার। কারণ, 'পাবলিক ডিফামেশন'।

সমাজ-জীবনের যে নরককে নিয়ে তাঁর এত মমতাময় সৃষ্টি, জীবনের শেষ আঘাত এল সেইখান থেকেই। 'ইন দি এণ্ড হি ওয়াজ দা ভিকটিম অফ হিজ ওন্ ক্যারাকটার্স', এই মর্মান্তিক উক্তি এ্যান্তোনিয়নির। একটু কান পাতলেই শুনতে পাবো এর ভিতরের অট্টহাসি। সে অট্টহাসি নিয়তির। 'নাউ অল ইজ ক্লিয়ার, উইল্ড্, ইট ইজ নট ডেস্‌টিনি,' সফোক্লিসের এই মূল সংলাপকে তিনি ব্যবহার করেছিলেন সামান্য বদলে। কিন্তু তিনি জানতেন না, এই অপূর্ব বচনটির যথার্থ মর্মার্থ।

"এটা পুরোপুরি একটা দুর্বোধ্য উক্তি। আমি কখনো এর মানে বুঝতে পারিনি। কিন্তু এটা সোফোক্লিসে ছিল। মানে বুঝতে পারিনি কারণ এর অর্থ বোধাতীত এবং প্রহেলিকাময়। এর গভীর তলায় রয়েছে এমন এক সূক্ষ্ম উপলব্ধি, যার ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। কখনো কখনো মনে হয়েছে, এর অর্থ জলের মত সহজ। কিন্তু অর্থটা বুঝতে পারিনি।"

তাঁর কদর্য, ভয়াবহ, রক্তপাতময় মৃত্যুর স্মৃতি মনে এলে, আমাদের কাছে 'ডেসটিনি'-র সমস্ত দুর্বোধ্যতা যেন সূর্যের আলোর মত স্বচ্ছ হয়ে যায়। বিশ্বাসের মৃত্যু নেই, জানি। কিন্তু বিশ্বাসীরাও মরেন। কেউ আত্মহত্যায়। যেমন মায়াকভস্কি। কেউ অপঘাতে। যেমন পাসোলিনী।

॥ ২ ॥

কবি পাসোলিনীর সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা অথবা আলাপ ঘটেনি কোনদিন। বাংলা সাহিত্যে ছায়া পড়েনি তাঁর প্রতিভার। আমরা প্রবন্ধ পড়ে জেনেছি তিনি কবি। কবিতা পড়ে নয়। এ পর্যন্ত তাঁর মাত্র একটি কবিতা অনুবাদ হয়েছে বাংলায়। অনুবাদ করেছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, তাঁর 'অন্য দেশের কবিতা' বইটির জন্যে। ঐ বইয়ে সুনীলের অনুবাদের শিরোভাগে আছে একটি সংক্ষিপ্ত কবি-পরিচিতি। সেটির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি তাঁদের কথা ভেবে, যাঁরা

ঐ বইটি এখনো পড়েননি।

"ভিড়ের রেস্তোরাঁর মধ্যে হঠাৎ টেবিলে লাফ দিয়ে উঠে পাসোলিনী চিৎকার করে বলবেন, অনর্থক মানুষ, তোমরা অনর্থক সময় নষ্ট করছো। শোনো আমার কবিতা, এই কবিতাই তোমাদের বেঁচে থাকতে শেখাবে। এই রকম স্বভাবের কবি। ইতালির তরুণ কবিদের মধ্যে পাসোলিনীই সবচেয়ে প্রবল এবং দুর্দান্ত এবং সবচেয়ে বিতর্কমূলক। এক দিকে তাঁর প্রবল জনপ্রিয়তা, অপর দিকে একদল তাঁকে কবি বলেই মানতে চান না। পাসোলিনীর জন্ম ১৯২২-এ। কিছুদিন শিক্ষকতা করেছিলেন। পরে বিরক্ত হয়ে ছেড়ে দেন। তাঁর ধারণা লেখকদের লেখা ছাড়া আর কোন জীবিকা থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু, বলাই বাহুল্য পৃথিবীর যে কোনো তরুণ লেখক, বিশেষত কবি, শুধুমাত্র সাহিত্য রচনা করেই গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করতে পারে না। ফলে পাসোলিনীকে ফিল্মের স্ক্রিপ্‌ট লিখতে হয়, কখনো কখনো নিজে অভিনয়ও করেছেন। ইদানীং পাসোলিনী চলচ্চিত্র পরিচালনাতেই মুখ্যত আত্মনিয়োগ করেছেন। ইতালির আধুনিক চলচ্চিত্রকারদের মধ্যে তিনি উল্লেখযোগ্য অন্যতম। তাঁর তোলা যীশুর জীবনী একটি বিতর্কমূলক ছায়াছবি। রবীন্দ্রজন্ম-শতবার্ষিকীতে তিনি ভারতবর্ষে এসেছিলেন।"

এর পরে আরও পাঁচটি লাইন আছে সুনীলের ঐ লেখায়। পাসোলিনী সেখানে 'নিওরিয়ালিস্ট' গোষ্ঠীর কবি। হয়তো ঠিকই। কিন্তু পরিচালক হিশেবে তিনি কখনো নিজেকে ঐ গোষ্ঠীর লোক বলে স্বীকার করেননি। একবার এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন—

"হ্যা, আমি সব সময়েই ছোট ছোট শট্ নিয়ে থাকি। আমার সঙ্গে নিওরিয়ালিস্টদের এইখানেই পার্থক্য। নিওরিয়ালিজম-এর প্রধান লক্ষণ, দীর্ঘস্থায়ী দৃশ্য। ক্যামেরা থাকবে একটা জায়গায় স্থির। চরিত্ররা আসবে, যাবে, কথা বলবে, হাসবে, তাকাবে, ঠিক বাস্তব জীবনে যেমনটা ঘটে। আমি ঐরকম দৃশ্য, কখনোই নিইনি। আমি ন্যাচুরালনেসকে ঘৃণা করি। আমি সব কিছু গড়ে নিই।"

চলচ্চিত্রের আলোচনা থেকে আমরা ফিরে যেতে চাই কবিতায়। না, আসলে কবিতায় নয়। চলচ্চিত্রের সঙ্গে তার কবিসত্তা যতটুকু জড়িয়ে আছে, নিজের চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি যেভাবে

বারে-বারে কবিতার কাছে ফিরে এসেছেন, সেইটুকুই আমাদের আলোচনার পুঁজি। সেইসব হাতড়েই একজন কবিকে খোঁজা।

যুদ্ধের সময়ে, যখন থাকতেন ফ্রিউলিতে, তখন থেকেই কৃষক জীবনের সঙ্গে তার আঁতের যোগ। সেই সময়েই ধনী জমিদারদের সঙ্গে কৃষকদের লড়াই। পাসোলিনী জড়িয়ে পড়লেন .লড়ায়ে। মার্কসিজমও সেই প্রথম স্পর্শ করল তাঁর ফুটন্ত আবেগকে। প্রথম কবিতা লিখতে বসে সেই সময়ে তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বেছে নিলেন 'ফ্রিউলান'। তাঁর নিজের ভাষা নয়। ভাষাটা আঞ্চলিক, স্থানীয় চাষীদের।

"ফ্রিউলান ভাষায় যখন প্রথম কবিতা লিখি, তখন আমার বয়স সতেরো। তার কারণটা ছিল অদ্ভুত। তখন ইতালীতে 'হারমেটিসিজমের' আধিপত্য। এর মূল লক্ষ্য ছিল সিম্বলিজম। এই আন্দোলনের মূলে প্রবল প্রভাব ছিল মালার্মের। কিছুটা রিলকেরও। প্রথম প্রভাবিত হয়েছিলেন উনগারেত্তি। সারা ইতালীতে ছড়িয়ে পড়েছিল এই আন্দোলনের প্রভাব। মনতেল-ই একমাত্র কবি যিনি একে ছাড়িয়ে ইউরোপের অন্যান্য কবি, যেমন এলিয়ট এবং পাউণ্ডকে অনুসরণ করে, হারমেটিসিজমকে চেহারা দিয়েছিলেন খানিকটা সহজ সরল। হারমেটিক কবিতার মূল লক্ষ্য ছিল কবিতার ভাষা হবে শুধুমাত্র কবিতারই ভাষা। এবং এটাকে নিয়ে তাঁরা যাত্রা করেছিলেন দুর্বোধ্যতার একেবারে প্রান্তসীমায়। যেখানে সব কিছুই অনুভবের বাইরে। সবটাই যেখানে সাড়াহীন। 'an absence of communication'. সেই সময়ে ফ্রিউলান-কে আমি মাথায় তুলে নিলাম কবিতার একটা বিশেষ ভাষা হিসেবে। বাস্তবতার প্রতি যত রকম ঝোঁক বা প্রবণতা তার একেবারে বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গী হিসেবে, 'It was the maximum of hermetic obscurity.'

এই আঞ্চলিক ভাষার সান্নিধ্যে পৌঁছেই, যদিও প্রথম দিকে শুধু মাত্র সাহিত্যের জন্যেই হাত পেতেছিলাম এর কাছে, ক্রমশ বুঝতে পারলাম, আমি ছুঁয়ে ফেলেছি এমন একটা জিনিশ যা অত্যন্ত জ্যান্ত এবং ভীষণ বাস্তব। আমি ক্রমশ চিনতে এবং বুঝতে পারলাম কৃষক জীবনের বাস্তবতাকে। তারপর আমার লেখায় এই ভাষা আর শুধুমাত্র হারমেটিক

এস্থেটিক্‌সের কলা-কৌশল হিসেবে ব্যবহার হওয়ার বদলে হয়ে উঠল বাস্তবকে প্রকাশকরার বস্তুনিষ্ঠ অবলম্বন বা উপকরন। আমার উপন্যাসে সেটা পেল পরিপূর্ণ রূপ। যেখানে আমি রোমান ডায়ালেক্‌টকে ব্যবহার করেছি এমন ভাবে, যা প্রথম দিকের সম্পূর্ণ বিপরীত।"

বাবা অভিজাত সম্প্রদায়ের বংশধর। মা ফ্রিউলানের কৃষক পরিবারের মেয়ে। বাবা ধার্মিক ছিলেন না। বিশ্বাস করতেন না ঈশ্বরে। কিন্তু যেহেতু ন্যাশনালিস্ট এবং ফ্যাসিস্ট, প্রতি রবিবারে চার্চে যাওয়ার অভ্যাসটা ছিল নিয়মিত। সেটা শুধুমাত্র সামাজিক কারণে। মা যেহেতু চাষী পরিবারের মেয়ে, ধর্ম তাঁর শরীরের রক্তমাংসে। কিন্তু চার্চে যেতেন না কোনদিন। ধর্ম ছিল তাঁর ভিতরের জিনিশ। কাব্যময় এবং স্বাভাবিক। লোক-দেখানো ছল নয়। এইভাবে ধর্মহীনতার প্রভাব পাসোলিনীর অস্তিত্বে শৈশব থেকে সংক্রামিত। নিজে বলেছেন এইভাবে, 'আই থিংক, আই এ্যাম দা লিস্‌ট ক্যাথলিক অফ অল দা ইটালীয়ানস আই নো।' এমন কি যে স্কুলে পুরোহিতরা শিক্ষক, সে স্কুলে পড়তে যেতেন না তিনি। শৈশব থেকে আরও একটা জিনিশ ছায়া ফেলেছিল অস্তিত্বে। মায়ের প্রতি ভালবাসা। সুগভীর টান।

"বাবা এবং মায়ের সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক, সেটা সম্বন্ধে কিছু বলা খুব কঠিন। যেহেতু সাইকো-এ্যানালিসিস সম্বন্ধে কিছু আমি জানি। সেই কারণেই আমার পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন, কি ভাবে কথাগুলো বলবো। কবিতার ছাঁদে অর্থাৎ ঘটনাময় স্মৃতিচারণ দিয়ে। না সাইকো-এ্যানালিসিসের ধরনে। সেটাও খুব একটা সহজ কাজ নয়। কারণ, কাউকে সম্পূর্ণ জেনে ওঠা কারুর পক্ষেই সম্ভব নয় কখনো। আমি শুধু বলতে পারি মায়ের প্রতিই ছিল আমার প্রবল ভালবাসা। প্রমাণ পেতে চাইলে ঘাঁটতে পারেন আমার কবিতা, ১৯৪০ থেকে যার শুরু। আর শেষ, কবিতার বইয়ে। অনেক কাল ধরে আমার মনের মধ্যে একটা ধারণা ছিল, আমার জীবনের আবেগময় এবং যৌনপ্রধান গড়নটা বুঝি মায়ের প্রতি অত্যধিক, বলতে গেলে ভয়াবহও, ভালবাসা। কিন্তু সম্প্রতি বুঝেছি, বাবার সঙ্গে সম্পর্কটাও আমার জীবনে ছিল গুরুত্বপূর্ণ। আমি সব সময়ে ভাবতাম বাবাকে বুঝি ঘৃণা করেছি কেবল। না। আমি যুক্ত

ছিলাম এক স্থায়ী সংঘর্ষে, তাঁর সঙ্গে। তার কারণ ছিল অনেক; সবচেয়ে বড় কারণটা হল, তিনি ছিলেন 'ওভার বীয়ারিং ইগোইস্টিক, ইগোসেন্ট্রিক, টিরানিক্যাল এ্যাণ্ড অথরেটেরিয়ান'। আবার সেই সঙ্গে 'একস্ট্রাঅর্ডিনারিলি নাইভ'। এ ছাড়া তিনি ছিলেন আর্মি অফিসার। জাতীয়তাবাদী। এবং ফ্যাসিজিমের সমর্থক। আমার সঙ্গে সংঘর্ষের এগুলোও ছিল কারণ। তার উপরে মায়ের সঙ্গে বাবার সম্পর্কটা ছিল বড় জটিল। সেটা এখন বুঝতে পারি। বাবা সম্ভবত মাকে ভালবাসতেন যথেষ্টই। কিন্তু সম্ভবত মায়ের দিক থেকে বিনিময়ে পেয়েছেন কম। সেই না-পাওয়াই বাবাকে সব সময় তীব্র ক্ষিপ্ত উত্তেজনায় টান টান করে রাখতো। সব শিশুদের মতো, আমিও তখন থাকতাম মায়ের পক্ষেই। আমি সব সময়ে ভাবতাম, বাবাকে বুঝি ঘৃণাই করেছি কেবল সারা জীবন। তা নয়। সম্প্রতি, আমার শেষ কাব্য-নাটকটি লিখবার সময়, যার বিষয় পিতা বনাম পুত্রের সম্পর্ক, বুঝলাম আমার আবেগময় এবং যৌনপ্রধান মানসিক গড়নটার মূলে বাবার প্রতি ঘৃণা নয়, ভালবাসা বোধটাও অনেকখানি কার্যকরী। এই ভালবাসার জন্ম তখন, যখন আমার বয়স দেড় বছর। অথবা হতে পারে দুই কিংবা তিন। সঠিক জানি না। তবে আমি এই ভাবেই জিনিশটাকে খাড়া করেছি। ১৯৫৯-এ বাবা মারা গেলেন। কেনিয়া-র বন্দী শিবির থেকে ফিরে। ১৯৪২-এ লেখা কবিতার বইটা উৎসর্গ করেছিলাম তাঁকে। সে কবিতা ফ্রিউলান ভাষায় লেখা। আমার মায়ের ভাষা। বাবা ছিলেন এই ভাষার বিরুদ্ধে। তার অনেক কারণ। প্রথমত মধ্য ইটালীর মানুষ হিশেবে তিনি ছিলেন জাতি-বিদ্বেষী। তাঁদের ধারণা যা কিছু শহরের প্রান্তবর্তী, তা সে ভাষাই হোক আর যাই হোক, নিকৃষ্ট। তার উপরে একজন ফ্যাসিস্ট হিসেবে আঞ্চলিক ভাষার উপর তাঁর ঘৃণা তো ছিলই। সুতরাং বাবাকে সেই কবিতাগুচ্ছ উৎসর্গ করা যথেষ্ট সাহসিকতার লক্ষণ।"

সম্ভবত, 'ইডিপাস রেক্স' গড়ার উৎস রয়ে গেছে এইখানে। ইডিপাস এর প্রোলোগ-এ। যেখানে দেড় বছরের একটি শিশুর প্রতি তার পিতা ঈর্ষান্বিত। শিশুটিও পিতার মানসিকতার নির্মম অথবা উদাসীন পর্যবেক্ষক।

পাসোলিনী, বলতে গেলে জন্ম থেকেই কবি। যখন থেকে লিখতে শিখেছেন, তখন থেকেই কবিতা লেখা। অবশ্য লিখতে এবং পড়তে শেখার আগে এসেছিল ছবি। তখন বয়েস ছিল চার। কবিতা লেখা সাত বছর বয়েস থেকে। ছোট্ট একটা নোট বইয়ে। শৈশবের যেসব রচনা হারিয়ে গেছে যুদ্ধের সময়। সে কবিতাকে অলঙ্কৃতও করেছিলেন ছবি এঁকে। ছবি আঁকাটাও চলেছিল অনেকদিন। বয়স বেড়েছে। উপন্যাস, প্রবন্ধ, চিত্রনাট্য, চলচ্চিত্র, সংবাদপত্রে বিতর্কমূলক রচনা, এমনি নানা দিকে দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়েছে তাঁর প্রতিভা। কিন্তু কবিতা রয়ে গেছে রক্তস্রোতে, অস্তিত্বের মর্মমূলে।

চলচ্চিত্রের আলোচনা প্রসঙ্গেই জনৈক প্রশ্নকর্তা একবার তুলেছিলেন 'স্যুর-রিয়্যালিজম'-এর কথা। পাসোলিনীর উত্তর—

"স্যুর-রিয়্যালিজম জিনিশটা যে খুব পরিষ্কার ভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে, তা আমার মনে হয় না। আমরা যখন ঐ শব্দটা ব্যবহার করি তখন একই সঙ্গে দুটো দিকের কথা বলি। এর এক দিকে রয়েছে, 'স্যুর-রিয়্যালিস্ট ম্যানিফেস্টো'। মনে পড়ে যায় ব্রেতোঁ আর আরাগঁকে। মনে পড়ে যায় গোটা ফরাসি পরিমণ্ডল। মনে পড়ে যায় দালি-র ছবি। এই শতাব্দীর গোড়ায় যাঁরা যাঁরা স্যুর-রিয়্যালিস্ট ছিলেন তাঁদের সবাইকে।

এর পরের ধাপে আসে কাফ্‌কা। কাফ্‌কা সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু। আরাগঁ এবং এলুয়ার-এর মধ্যে যেমন তুলনা হয় না, তেমনি হয় না তাঁদের উত্তরাধিকারী লুত্রেয়ঁ-র সঙ্গে কাফ্‌কার। স্যুর-রিয়্যালিস্ট পেনটিং আর গোড়ার যুগের স্যুর-রিয়্যালিস্ট সিনেমার তুলনা চলে না।

আজকের যুগের যাবতীয় জীবন্ত কবিতা, এমনকি সোসালিস্ট বা কমিটেড কবিরাও যা লিখেছেন, সবারই মূল উৎস ঐ স্যুর-রিয়্যালিজম।

আমার ফিল্মে যে স্যুর-রিয়্যালিজম, তার অনেকখানি কাফ্‌কা থেকে নেওয়া। আর খানিকটা নেওয়া স্যুর-রিয়্যালিস্ট পেন্টিং থেকে। অর্থাৎ ঐতিহাসিক স্যুর-রিয়্যালিজমের সঙ্গে আমার চলচ্চিত্রের সম্পর্ক কম। এটা হল 'ফেবল্‌'-এর স্যুর-রিয়্যালিজম। যার শিকড় লোক-সাহিত্যের গভীরে। বরং বলা যেতে পারে আমার ছবির মূল নীতিকথাটা ভারতীয় দর্শনের থেকে নেওয়া। 'টু বি ডেড অর এ্যালাইভ ইজ

দা সেম থিং', এবং এটা কোন আকস্মিক ঘটনা নয়।"

চলচ্চিত্র এবং কবিতা পাসোলিনীর কাছে এক। তিনি শুধু কবিতার দৃষ্টিভঙ্গীতে চলচ্চিত্র গড়েন না, মাপেনও। কোনও একটা ছবি দেখার পর তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে, এ ছবিটা কোন্ ভাষায় তোলা? গদ্যের ভাষায়, না পদ্যের ভাষায়। তিনি বিশ্বাসী 'সিনেমা অব পোয়েট্রি'তে। কেন?

"আমার মতে সিনেমা মূলতঃ এবং স্বাভাবিক কারণে কাব্যময়। যেহেতু সিনেমা স্বপ্নের মতো। সে স্বপ্নের সবচেয়ে কাছাকাছি। যেহেতু চলচ্চিত্রের একটি দৃশ্য, অথবা স্মৃতির খানিকটা অংশ অথবা স্বপ্নের, তারা সকলেই, গভীর ভাবে কাব্যময়। ছবিতে তোলা একটা গাছও কাব্যময়। একটা মানুষের মুখের ছবি তুললে, সেটাও কাব্যিক। যেহেতু 'ফিজিসিটি' জিনিশটাই কাব্যিক। যেহেতু এর ভিতরে রয়েছে অলৌকিকত্ব। রয়েছে রহস্য। রয়েছে বহু রকমের অর্থ। যেহেতু দ্ব্যর্থকে মোড়া। এমনকি একটা গাছও ভাষাবিদ্যার প্রতীক। কিন্তু গাছের ভিতর দিয়ে কে কথা বলে? বলেন ঈশ্বর। অথবা বাস্তব জগৎ নিজেই। এইভাবে গাছের মাধ্যমে তার অলৌকিক বক্তার সঙ্গে ভাষার আদান প্রদান চলে আমাদের।

সিনেমা কবিতা হতে বাধ্য, কারণ এটা কবিতারই মত। আমি আবার বলছি, কবিতারই মত। যে কবিতা প্রাগৈতিহাসিক, নির্দিষ্ট আকারহীন এবং অস্বাভাবিক। কেউ যদি আদ্যিকালের একটা শাঁসহীন ফাঁপা, ওয়েস্টার্ন ছবি অথবা কোনো প্রাচীন জনপ্রিয় ছবিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করে, তার ভিতরেও কোথাও না কোথাও চোখে পড়বে, স্বপ্নের গড়ন এবং কবিতার স্বভাব। যদিও সে ছবি 'সিনেমা অব পোইট্রি' নয়।

চলচ্চিত্রকার হতে গেলে কবি হতে হবে আগে।"

॥ ৩ ॥

বার্নার্দো বার্তুলুচ্চি, ইতালীর একজন খ্যাতনামা কবি। আতিলো বার্তুলুচ্চির ছেলে। হঠাৎ এক দিন কবিতা ছেড়ে চলে এলেন চলচ্চিত্রে। হঠাৎ মনে হয়েছে, 'সিনেমা ইজ দা ট্রু পোয়েটিক ল্যাঙ্গুয়েজ'।

২১ বছর বয়সে প্রথম ছবি, 'দি গ্রীম রীপার'। গুরু পাসোলিনীর গল্প। শিষ্য বানিয়েছিলেন নিজের মত সাজিয়ে গুজিয়ে। সেটা ১৯৬২-র ঘটনা। তারপর আরও বদলেছেন। আরো ছবি। বন্ধুত্ব হয়েছে গদারের সঙ্গে। ছবিতে পড়েছে তার ছাপ। লিরিসিজমের সঙ্গে মিশেছে গদারীয়ান পলেমিক। পরে বন্ধুত্ব ভেঙে গেছে। কারণটা রাজনৈতিক মতামতের বৈপরীত্য। তারপরেও ছবি করেছেন। এখন বিশ্ব চলচ্চিত্রে এক উজ্জ্বল নাম। কিন্তু এখনো গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে অকুণ্ঠ। বয়স যখন কুড়ি, তখনই এসেছিল এই দুর্লভ সুযোগ। পাসোলিনীর প্রথম ছবি 'এ্যাকাটোনে'র সহকারী পরিচালকের কাজ। প্রশ্ন করা হয়েছিল, কি ভাবে পেলেন এই কাজ? উত্তরে জানিয়েছিলেন—

—আমি তাঁকে জানতাম। আমি ছিলাম তাঁর কবিতার পাঠক। তিনিও পড়েছিলেন আমার কিছু কবিতা। যখন বারো বছর বয়েস, প্রথম দেখি তাঁকে। আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন বাবা পাসোলিনীর সঙ্গে কাজ করা সত্যিই এক মূল্যবান অভিজ্ঞতা। যখন প্রথম ছবি করছেন তখন সিনেমার ব্যাপারে তিনি ছিলেন আমারই মত 'ভার্জিন' অর্থাৎ অপাপবিদ্ধ। তার ফলে অভিজ্ঞতা দিয়ে যা প্রত্যক্ষ করলাম, সেটা একজন পরিচালকের কাজ নয়। আমি প্রত্যক্ষ করলাম একজন পরিচালকের জন্ম।

—এ্যাকাটোনে করতে করতে কি শিখলেন?

—টেকনিক-ফেকনিকের কিছুই না। শিখেছিলাম মানবিক সম্পর্কের ব্যাপারটা। স্টাইলের কথা যদি বলতে হয় বলবো অপূর্ব। পাসোলিনী যখন একটা ট্রাকিং শট নেন, মনে হোতো যেন পৃথিবীতে এই প্রথম ট্রাকিং শটের জন্ম হল। তেমনি একটা ক্লোজ-আপ। মনে হতো এর আগে পৃথিবীতে ক্লোজ-আপ ছিল না। যেন এই প্রথম জন্ম হচ্ছে একটা ভাষার। আমার কাছে ব্যাপারটা ছিল যেন হাত লাগিয়েছি সিনেমাকে জন্ম দেওয়ার কাজে। এ্যাকাটোনে-য় কাজ করে আমার চোখ খুলে গেল সিনেমার বিষয়ে। বুঝলাম, এটাই হল আসল কাব্যময় ভাষা। বুঝলাম, সিনেমা থিয়েটারের চেয়ে কবিতার অনেক কাছের।

পাসোলিনীর সব ছবির চিত্রনাট্যই নিজের কলমে লেখা। সাধারণত চিত্রনাট্যকে আমরা জানি এক ধরনের শুকনো গদ্য। প্যারেডের মাঠের

ডাইনে ঘোরো বাঁয়ে তাকাও এবার হাঁটো গোছের নির্দেশনামার নির্ঘোষে কর্কশ। সাহিত্য থেকে সাধারণত সাত মাইল দূরে দাঁড়িয়ে থাকে এর ভাষা। কথা বেশি। কবিতা কম। চরিত্র থাকে। কিন্তু থাকে না তাদের মন, তাদের ভিতর মহল, জটিল অলিগলি, অন্ধকার ঘর, ঘরের ভিতরের করাঘাত। চিত্রনাট্যে নায়কের প্রবেশ এবং প্রস্থানের মাঝখানে কেবল সংলাপ। থাকে না সংলাপের উৎস। ফলে চিত্রনাট্য পড়ে আমরা কখনো ছুঁতে পারি না সেই রকম একটা জ্যান্ত চরিত্রকে যার পাঁচটা ইন্দ্রিয়, ছটা রিপু এবং একটুকরো বুকে চোদ্দটা ভুবন। তাই চিত্রনাট্য আমরা পড়ি না।

পাসোলিনীর চিত্রনাট্য সাহিত্য নয়, কবিতা। শুধু ভাষা নয়, ভাষ্যও। তিনি মানুষকে দেখান শুধু আপাদমস্তক নয়, আমূল। শিকড়-বাকড়শুদ্ধ। প্রকৃতিকেও দেখান মানুষের আদলে।

'ইডিপাস রেক্স' ছবিতে আমরা দেখেছি ক্যামেরা ক্রমাগত ঘুরে চলেছে সবুজ বনের উপর দিয়ে। যেন একটি শিশু চোখভর্তি বিস্ময় নিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখছে প্রকৃতিকে। চিত্রনাট্যে সেখানকার বর্ণনা—

Perhaps trees will come spining into view : ashes, sorghum, and willows—willows above all. Drooping with their long, weeping leaves over a terrible void, a darkness, something unearthly. And the willows, drenched in that glorious afternoon sun deep in the provinces : a mysterious corner of the world, no north, no south. Just an immense hole where a new life is stirring.

সৈনিকের পোশাক পরা পিতা তাকিয়ে আছে আপন শিশুর দিকে। শিশুটি একটি প্রাম-এর ভিতরে শুয়ে। সেও দেখছে তার পিতাকে। কিভাবে ?

The child looks at him, his limpid little eyes devoid of expression, perhaps he is already pretending indifference. The father looks at him, standing out in his petitbourgeous soldiers unifoam against the

sky and the song of the swallows. He is listening to his own inner voice. It is loud, and solemn, as in a tragic drama.

কোনও একটি যুবকের বর্ণনায় তাঁর কলম শুধু 'হ্যাণ্ডসাম' বলেই থেমে যায় না। তিনি জানান, এ হচ্ছে সেই যৌবন যা দাসত্ব কি এখনো বুঝতে শেখেনি। অথবা তাকে স্পর্শ করেনি দাসত্বের বোধ। অথবা ক্ষেপিয়ে তোলেনি।

কোনও একটি বাঁশির সুরের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি জানান, এ হল সেই সুর যা চিরকালের, পৃথিবীর যাবতীয় পুরাণের প্রাণের জিনিশ। আবার অন্য জায়গায় এই বাঁশীর সুরকে বলেছেন, নিয়তির চেয়ে বয়সে কিছু ছোট অথবা বড।

কোনও একটি পথ প্রসঙ্গে, এই পথ যার শেষ নেই। চলে গেছে সেই গভীরতার দিকে, যার সবটাই ভরাবহ শূন্যতায় ভরাট।

আবার এইরকম পথেই যখন ভেসে আসে দূরাগত কোন অস্পষ্ট সঙ্গীত তিনি সতর্ক করে দেন আমাদের। ঐ গান এগিয়ে আসছে অলৌকিক ভঙ্গিতে, এখুনি দখল করে নেবে এই ভুবনজোড়া দিগন্তকে। ঐ গান প্রাণে প্রথমে জাগায় আনন্দ, পরে আতঙ্ক। এই গান পথকে বাঁকিয়ে নিয়ে যায় মরুভূমির ভিতর দিয়ে এমন দিকে, যেখানে দাঁড়ালে মনে হয় সবটাই সুস্পষ্ট অথচ বিপুল দূর, সবটাই পরিচিত অথচ অমানবিক।

থেবস যাত্রার পথে ইডিপাস যখন হত্যা করেন নিজের পিতাকে এবং আক্রান্ত হন তাঁর রক্ষীদের হাতে, ইডিপাস একে একে হত্যা করেন তাদেরও। পাসোলিনী একবারও বলেন না মৃতদেহগুলি শুয়ে রইল ধুলোর উপরে। মৃত্যুর বদলে তিনি ব্যবহার করেন 'সরলতা'। 'দেয়ার ইনোসেন্স লাইস দেয়ার ইন দি ডাস্ট, সোক্‌ড ইন ব্লাড।' আবার কখনো, 'ইনোসেন্স অ্যাণ্ড ইয়ুথ লাই স্কোয়ারমিং ইন দি ডাস্ট।' কবির উপস্থিতি এখানে প্রবলতর। নিজের অজ্ঞাতসারে ইডিপাস নিহত করেছেন তার পিতাকে। তার জীবনে পাপের শুভারম্ভ এই মুহূর্তটি থেকে। ইডিপাসের পাপকে চিনিয়ে দেবার জন্যেই বারবার প্রতিরোধকারী যোদ্ধাদের ক্ষেত্রে পাপহীন সরলতার উচ্চারণ।

থেবস্-এ অভিষিক্ত হওয়ার পর নিজের জননীর সামনে এসে বসেছে ইডিপাস। এখন জননী নয়, স্ত্রী।

"দুটি নববিবাহিত এখন তাদের শয্যাগৃহের নিজস্ব শান্তির ভিতরে। জানলার বাইরে থেবস-এর অট্টালিকামালা, শহরাঞ্চল এবং চাঁদ। প্রথম দেখা গেল ইয়োকাস্তকে। এখনো উৎসবের পোশাকে। পিছনে ইডিপাস। পরিধানে রাজার পোশাক। মাথায় মুকুট। তাঁরা কাছাকাছি এসে দাঁড়ালেন। প্রত্যেকের চোখ অপরের চোখে গাঁথা। তাঁদের বিবাহ ঘটেছে জনগণের ইচ্ছানুসারে। কিন্তু এও ঠিক যে তাঁদের নিজস্ব ইচ্ছাটাও ছিল পিছনে, স্বতস্ফূর্ত এক লজ্জাহীন আকাঙ্ক্ষা।

সেই আকাঙ্ক্ষার নগ্ন প্রতিবিম্ব এখন তাঁদের চোখে। চরিতার্থতারও প্রতিবিম্ব। তাঁদের ভালবাসা এখন মাংসময়। আত্মার উৎকর্ষতা।

তাঁরা যখন পরস্পর নগ্ন হচ্ছেন, তখন তাঁদের চোখ পরস্পরের চোখে গাঁথা। এই প্রথম, তাঁরা আবিষ্কার করছেন পরস্পরের নগ্নতা। তাঁদের অন্তরঙ্গতার প্রথম মুহূর্ত। বাইরে, ঝিমধরা গ্রীষ্মের কিছু শব্দাবলী। বাইরে, জলজ্বলে চাঁদ।

ইডিপাস এখন নগ্ন। একই সঙ্গে রাজা এবং স্বামীর অধিকারবোধে তাঁর ব্যক্তিত্ব এখন উজ্জ্বল। তিনি দেখছেন নিজের স্ত্রীকে। স্ত্রীর মাথা এখন অলঙ্কারহীন। চুল বিস্রস্ত। পা দুটি নগ্ন। কিন্তু কাঁধ থেকে তখনো ঝুলছে পোশাক, যা কোমরের কাছে একটি সোনার আংটায় দৃঢ় আঁটা। আংটাটি যেন প্রকাণ্ড এবং ধারালো কাঁটার মতো। এইভাবে তিনি বসে আছেন বিছানার প্রান্তে। সলজ্জ। কিন্তু এই লজ্জা শিহরিত কুমারীদের মতো নয়। কারণ, কিভাবে শিশুরা জন্ম নেয়, ইতিপূর্বেই তা জানা হয়ে গেছে তাঁর। তিনি তো জননী। তবুও যে লজ্জার নম্র ভঙ্গি, সেটা সম্ভবত কৃত্রিম, প্রণয়ের ছলাকলা। অথবা হতে পারে এই দৃঢ় অথচ কোমল অভিব্যক্তি তাঁর নারীত্বেরই স্বাভাবিক সংযম। ইডিপাসের চোখে যেন খানিকটা ব্যঙ্গ, কিছু ঈর্ষা, ইডিপাস ভালবাসার জন্যে প্রস্তুত। ধৈর্যহীন তিনি এগিয়ে গেলেন ইয়োকাস্তর কাছে। খুলে দিলেন কোমর বন্ধনীর সোনার আংটাটি। বুকের বসন লুটিয়ে পড়ল পায়ের নিচে।

অস্থির ইডিপাস দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন ইয়োকাস্তা-র শরীর, প্রায়

বন্যের ভঙ্গিতে। বিছানায় শুইয়ে দিলেন তাঁকে। আর ঠিক সেই সময়ে তাঁকে নিবৃত্ত করল, পেছনে টেনে আনল একটা কিছু।

তিনি উঠে বসে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন তার স্ত্রীকে, মনে পড়তে লাগল জননীকে।

রাত্রির গভীরে, দূরে কোথাও বেজে উঠল বাঁশী। বেজে মিলিয়ে গেল! এ সেই টাইরেসিয়াসের বাঁশীর রহস্যময় সুর। এই সুর যেন নিয়তির আঁকা ছকের মধ্যে-কার জিনিশ। নিয়তি—রহস্য—তাকে ছাড়িয়ে—একটি মা।

ধীরে, অতি সন্তর্পণে, আর সেই প্রভুত্বের বন্যতায় নয়, যথার্থ প্রেমিকের মত কাঁপা আবেগে, ইডিপাস কাছে টেনে নিলেন তাঁর জননীকে। জননীর শরীরকে তিনি আচ্ছাদিত করলেন নিজের শরীর ঢেলে।"

কবিতার গভীর ভাষায় লেখা হয়েছে এমন চিত্রনাট্যের সংখ্যা খুবই কম। যাঁরা লিখেছেন তাঁরা কবি। পাসোলিনী তাঁদের মধ্যে একজন। হয়তো তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রধান। এবং সম্ভবত সর্বশেষ।

ফ্রাঁসোয়া ত্রুফো
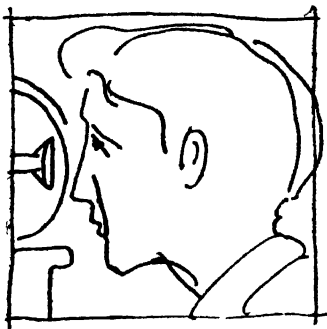
ফরাসী নিউ ওয়েভ-এর আদি জনকদের একজন হওয়ার আগে ত্রুফোর প্রধানতম পরিচয় ছিল, চিত্রসমালোচক। ছেলেবেলা থেকেই সিনেমার পোকা। ভালো-লাগা ছবি একাধিকবার দেখেও ক্লান্তি নেই। কখনো কখনো একটা প্রিয় ছবির পিছনেই বছরের বারোটা মাস। দেখতে দেখতে গোটা ছবির সংলাপটাই হয়তো মুখস্থ। ছবি দেখার পয়সা নেই। তাতে কি? বিনা টিকিটেই, এমার্জেন্সী একসিট, অথবা ওয়াসরুমের জানলা গলে হলে ঢুকে পড়ার কায়দা-কৌশল তখন আয়ত্তে। সিনেমাকে এমন একান্তরূপে ভালোবাসা যে, বসবার আসনটা হওয়া চাই পর্দার একেবারে কাছাকাছি, যাতে ভর্তি হলের অস্তিত্বটা মুছে যায় চোখের সামনে থেকে। তখন ত্রুফো আর সিনেমা ছাড়া জগতে কেহ যেন নাহি আর। একটু বয়স বাড়লে, সিনেমা হল থেকে বেরিয়েই খাতায় পরিচালকের নামটা লিখে রাখা। পরের ধাপে ছবির ভালো-মন্দ বাছাই। তারও পরের ধাপে মনে মনে ভাবতে বসা, নিজে এই ছবিটা করলে কী করতাম আমি। মারাত্মক নেশার মতই তাঁর অস্থি-মজ্জার ভিতরে ঢুকে পড়েছে সিনেমা। "এ্যাট দ্যাট পিরিয়ড অফ মাই লাইফ, মুভীস এ্যাকটেড অন মি লাইক এ ড্রাগ।" ১৯৪৭-এ যখন তৈরী করলেন ফিল্ম ক্লাব, নিজের মানসিকতাকে মনে রেখেই তার নামকরন 'মুভী-ম্যানিয়া'।

সিনেমাকে রমণীর মতো নিবিড় ভালোবাসার সূত্রেই আলাপ এক

প্রবল পুরুষের সঙ্গে। তিনি আঁদ্রে বাঁজা। বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম চিত্রসমালোচকদের একজন। তিনি তখন বিখ্যাত 'কহিয়ের দ্যু সিনেমা'-র সহকারী সম্পাদক। বাজাঁ-র সৌজন্যেই ত্রুফোরও ঐখানে লেখাজোখায় হাতে খড়ি। বাজাঁর সান্নিধ্যেই সিনেমার নাড়ী-নক্ষত্রকে জানাজানি, বোঝাবুঝি। ১৯৫৫-য় প্রথম ক্যামেরার হাতলে হাত। বেশ ক-বছর টুকরো-টাকরা ছোট মাপের ছবি। প্রথম পূর্ণাঙ্গ ছবি পাঁচ বছর পরেই। 'ফোর হানড্রেড ব্লোজ'। সঙ্গে সঙ্গেই আন্তর্জাতিক সম্মান। এরপর যা ঘটা উচিত ছিল, তা কিন্তু ঘটলনা। যাঁরা ভেবেছিলেন চিত্র-পরিচালক হয়ে ত্রুফো এবার নিজের গা থেকে খুলে ফেলবেন চিত্রসমালোচকদের উর্দি, নিরাশ হতে হলো তাদের। ক্যামেরা ধরেছি বলে কলম ছাড়তে হবে, এমন সর্তে গররাজী তিনি। "সিন্স আই হ্যাভ বিন এ ডাইরেকটর আই হ্যাভ মেড ইট এ পয়েণ্ট নট টু গো ট্যু লং উইদাউট রাইটিং এ্যাবাউট ফিল্মস।"

ফরাসী ত্রুফো বাঙালী দর্শকদের আপনজন। এই তো গত বছরেই কলকাতা হুমড়ী খেয়ে দেখেছে তাঁর 'ডে ফর নাইট'। স্বয়ং ত্রুফোকেও দেখা হয়ে গেছে সেই সঙ্গে, ছবির পরিচালক চরিত্রটির ভূমিকায়। কলকাতার চলচ্চিত্র-বুদ্ধিজীবিদের পাড়ায় তিনি প্রধানত আলোচ্য হয়ে ওঠেন ত্বটো কারণে। নিজের প্রথম ছবির উপসংহারে 'ফ্রিজ' শটের প্রথম অসমান্য ব্যবহারে। আর ঐ ছবিরই একটা জায়গায় 'সিনেমা ভেরিতে' রীতির যথার্থ প্রয়োগে। বাঘের গায়ে যেমন ডোরা, দেওয়ালের গায়ে যেমন পোষ্টার, মাছের গায়ে তেমন আঁশ, ঠিক সেইভাবেই, একটা সময় গেছে, যখন ভারতীয় চলচ্চিত্রের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে অবিচ্ছেদ্য, অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল ফ্রীজ শট।

এমনকী চলচ্চিত্রের গণ্ডী ছাড়িয়ে ফ্রীজ শট ঢুকে পড়েছিল পরীক্ষা-নীরিক্ষার মঞ্চেও। সিনেমা এবং থিয়েটার ত্বই জগতেই এক সময় প্রকট হয়ে উঠেছিল ফ্রীজের যথেচ্ছাচার। এখনও ঘোর কাটেনি। সে-সব অহেতুক, অবান্তর এবং অশৈল্পিক ব্যবহারের কথা ভুলে গেলেও আমাদের মনে পড়বে এমন ত্বটি জাত-চলচ্চিত্রের কথা, যাদের উপসংহারে অর্থাৎ শেষ শটে 'ফোর হানড্রেড ব্লোজ'-এর মতই হাজির হয়েছে ফ্রীজ শট। তার প্রথমটি সত্যজিৎ রায়ের 'চারুলতা'। দ্বিতীয়টি

গোবিন্দ নিহালনীর 'আক্রোশ'। চারুলতার ফ্রীজ শটের ব্যবহারটি অভ্রান্ত এবং পরিচালকের চূড়ান্ত মন্তব্য হিসেবে সার্থক। আক্রোশে অযৌক্তিক। অনেকটা গোঁজামিলের মতো জুড়ে দেওয়া। যে-ছবির শেষে নায়কোপম চরিত্র বলিষ্ঠ ভাষায় ঘোষণা করছে নিজের অপরাজেয় জেহাদ সামাজিক অব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে, তার চলা হঠাৎ থেমে যাবে কেন, থামলে ছবির টোট্যাল থীমের সঙ্গে সঙ্গতিটা ভেঙে পড়ে কিনা, অথবা একালের সময়-সচেতনার সম্পর্কে কোনো দ্বিধা-কাতর বক্তব্যই কী তাহলে ছিল পরিচালকের আসল উদ্দিষ্ট, এজাতীয় নানা প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে আমরা যেন জড়িয়ে যাই এক হেঁয়ালীর জালে।

কিছুদিন হল আমাদের হাতে এসেছে ত্রুফোর চলচ্চিত্র-সংক্রান্ত রচনার একটি সংকলন, 'ফিল্মস ইন মাই লাইফ'। ছোট বড় সব মিলিয়ে একশোরও বেশী রচনার একটা তোড়া। জীবিত এবং মৃত, প্রাচীন এবং সমসাময়িক, দেশী অথবা বিদেশী পরিচালক এবং তাঁদের ছবি সম্পর্কে ত্রুফোর অকৃপণ, এবং উদার চিন্তাদীপ্ত আলোচনা। পাতায় পাতায় আশ্চর্য সব উপলব্ধির ঝিলিক। পড়তে পড়তে মনে হয় যেন ঠিকরে বেরোচ্ছে এক সুগন্ধী বাতাস। অদূরে কোথাও যুঁই-এর লতানো ঝাড় ফুল্ল কুসুমিত হয়ে উঠলে যেমন হয়, তেমনি উগ্র অথচ শীতল এক উৎকৃষ্ট জাতের সুবাসে আমোদিত হয়ে ওঠে আমাদের ভাবনার স্তরগুলো। পড়তে পড়তে কখনোই মনে হয়না পড়ছি কোনো চিত্র-সমালোচনা। যেন শুনছি ত্রুফোর আপন মনের স্বগতোক্তি। এক জাতের বই আছে যা পড়ার পর আমরা অনুভূতিতে হয়ে যাই স্পন্দ্যমান যুবক, আর বোধে বয়স্ক, ত্রুফোর বইটি সেই বিরল জাতের।

এ-বইয়ের প্রথম প্রবন্ধটি চিত্রসমালোচক ত্রুফোর নিজের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার সালতামামি। আর ঐ সুবাদেই এখনকার সমালোচনার রীতি-নীতি প্রসঙ্গে নিজের ধ্যান-ধারণার অকপট উল্লেখ। তিনি স্বীকার করেছেন যে তাঁর সময়ের চেয়ে চলচ্চিত্র সমালোচনা এখন হয়ে উঠেছে অনেক জটিল। তাঁর সময়ের চিত্রপরিচালকরা যে বুদ্ধিমন্ত ছিলেন না তা নয়, কিন্তু বিশ্বজনীনতার তাগিদে তাঁরা বুদ্ধিকে লুকিয়ে রাখতেন ক্যামেরার পিছনে। আর সেই কারণেই সে-সব ছবিতে বাস্তব হয়ে

উঠতো কৃত্রিম ধরনের রোমাঞ্চ।

এখনকার ছবি সে তুলনায় অনেক বেশী 'ইনটেলিজেণ্ট' এবং 'পার্সোনাল'। কখনো কখনো এমনই পার্সোনাল যে দর্শক এবং সমালোচক উভয়ের পক্ষেই অনুধাবন অসাধ্য। এইভাবে নিজের এবং পরবর্তীকালের চিত্রসমালোচনার ভালো এবং মন্দ দুদিক ছুঁয়েই তাঁর হাঁটা।

সমালোচক বলবো কাকে? এ প্রশ্ন যাঁর, তিনি নিজেই সমালোচক। একজন বিশ্ববিশ্রুত চিত্রপরিচালক, আবার চিত্র সমালোচক হিসেবেও যাঁর প্রসিদ্ধি, তিনি নিজেই যখন জহুরী সেজে হাতে কষ্টিপাথর নিয়ে বসেন, স্বভাবতই আমাদের কৌতূহল যে তখন প্রস্থে আকাশ আর দৈর্ঘে নদীর মতো হয়ে উঠবে, তাতে সন্দেহ নেই।

সমালোচক বলবো কাকে?

এই গুরুভার প্রশ্নটি তোলার আগে অবশ্য ভূমিকা করে নিয়েছেন বেশ কিছু। নিজেকেই প্রশ্ন করেছেন তিনি—'ওয়জ আই এ গুড ক্রিটিক?' উত্তর প্রসঙ্গে তাঁর স্বীকারোক্তি—জানি না। তবে একটা বিষয়ে আমি সুনিশ্চিত যে, আমি সব সময়েই থেকেছি তাদের পক্ষে যারা নিন্দিত হয়, আর তাদের বিরুদ্ধে, যারা নিন্দে ছড়ায়। আর অন্যেরা যেখানে মুখ ঘুরিয়ে নেয় সেইখানেই আমি খুঁজে পাই সবচেয়ে আনন্দ: রেনোয়ার সুর বদলানো, অরসন ওয়েলসের বাড়াবাড়ি, পাগনোল অথবা গুইত্রি-র এলোমেলোমি, ব্রেসো-র নগ্নতা। আমি মনে করি না যে আমার রুচির সঙ্গে ভেজাল ছিল স্ববারির। Audiberti-র সঙ্গে আমি চিরদিনই একমত সবচেয়ে দুর্বোধ্য কবিতাও মূলত সকলেরই জন্যেই। যখন আমি চিত্রসমালোচক ছিলাম, ভাবতাম যে একটা সার্থক সিনেমা একই সঙ্গে ফোটায় 'এ্যান আইডিয়া অব দা ওয়ার্লর্ড' আর 'এ্যান আইডিয়া অফ সিনেমা'। আজ, আমি দাবী করি যে একটা ছবি প্রকাশ করে হয় 'জয় অফ মেকিং সিনেমা' নয় 'এ্যাগনি অফ মেকিং সিনেমা'। এর মাঝখানে যা, তার প্রতি কণামাত্র আগ্রহ নেই আমার। যে ছবি নিজে স্পন্দিত নয়, তার প্রতিও ঐ একই মনোভাব।

একথা স্বীকার করার সময় এসে গেছে যে আমার সময়ের চেয়ে এখন সমালোচক হওয়া অনেক বেশী কঠিন। বালক বয়সে আমি যেভাবে শুরু করেছিলাম সেখানে সত্যিকারের সাংস্কৃতিক ভিত্তির চেয়ে আবেগের তাড়না-

টাই ছিল বেশী, এখন যদি কেউ সেইভাবে শুরু করতে চায়, তার প্রথম লেখাটা ছেপে বেরোবে না কোনও দিনই। আঁদ্রে বাজাঁ আজ আর লিখতে পারবেন না, যে 'অল ফিল্মস আর বর্ন ফ্রি এ্যাণ্ড ইকোয়্যাল'। যুদ্ধের সময় রেনোয়া থেকে কক্‌তো ব্রেসো সকলেই ছবি করেছেন একই দর্শককে মনে রেখে। এখন গ্রন্থ প্রকাশনার মতো তার মধ্যে এসে গেছে নানা ভাগ-বিভাগ, এবং স্পেশালইজেশন। আজ খুব কম ছবিই তৈরী হয় সাধারণ দর্শককে মনে রেখে। আজ আমেরিকায় ছবি তৈরী হয় মাইনরিটি-র-জন্যে। তার কোনটা ছোটদের, কোনোটা টিন-এজদের, কোনোটা ব্ল্যাকস, কোনোটা আইরিসদের জন্যে। তারই কোনোটা আবার ক্যারাটে ফিল্মস। ফিল্ম প্রোডাকসনের মধ্যে যেমন এসে গেছে নানা বৈচিত্র, সেইভাবেই বদলে গেছে সিনেমার সমালেচেনা বা সমালোচকরাও। এখন সমালোচকরাও বিশেষ বিশেষ বিষয়ে পারদর্শী। কারো দক্ষতা রাজনৈতিক চলচ্চিত্রের বিশ্লেষণে, কেউ পছন্দ করেন সাহিত্য-ঘেঁষা ছবি। তৃতীয়জন হয়তো কাহিনীহীন এক্সপেরিমেণ্টালের অনুরাগী। কোনো সমালোচক, ছবির 'ইনটেনশন' যার কাছে বড়ো, তিনি সেইটুকু পেলেই একটা ছবির আকাশ-ছোঁয়া প্রশংসা করলেন। আর যে সমালোচকের কাছে 'ফর্ম' বা 'একজিকিউশন'-টাই মুখ্য, তিনি 'ইনটেনশন' বা 'এ্যাচিভমেণ্টে'র দিকে নজরই পাতবেন না হয়তো।

এইখানে পৌছেই ত্রুফো প্রশ্ন তোলেন চিত্রসমালোচক তাহলে কে? প্রশ্নটা তুলেই পরের লাইনে আমাদের মনে করিয়ে দেন এক হলিউডি প্রবাদ। এর মধ্যে মৃদু রসিকতার গন্ধ পাই যেন। হলিউডে প্রত্যেকটা লোকের নাকি দুটো কাজ। একটা তার নিজের আর একটা ছবির সমালোচনা।

এর পরেই ত্রুফোর নিজের কণ্ঠস্বর। ঈষৎ তিক্ত এবং কটাক্ষময়। সিনেমার সমালোচক হতে পারেন যে কেউ। সাহিত্য, শিল্প অথবা সঙ্গীতের সমালোচক হতে গেলে যে ধরনের জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার দরকার, তার দশভাগের একভাগ সম্বল করেও যে-কেউ নিজেকে জাহির করতে পারেন সিনেমা সমালোচক হিসেবে। একজন পরিচালককে বাঁচতে হবে এটা জেনেই যে, তাঁর সমলোচনা করছেন বা করবেন এমন একজন যিনি জীবনে কখনো মুরনাউ-এর ছবিই দেখেননি। আবার খবরের কাগজের এডিটরিয়াল স্টাফের যে-কেউই কৈফিয়ৎ চাইতে পারেন একজন সিনেমা সমালোচকের

কাছে। এডিটর-ইন-চীফ, যিনি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা দেখিয়ে থাকেন সঙ্গীত সমালোচককে, তিনিও কিন্তু অনায়াসে সিনেমা সমালোচককে করিডরে পাকড়াও করে বলতে পারেন

—ওঃ, তুমি তো লুই মালের ছবিটাকে পথে বসিয়ে দিয়েছ। আমার গিন্নী কিন্তু তোমার সঙ্গে আদৌ একমত নয়। তার তো বেশ ভালোই লেগেছে।

ত্রুফোর নিজের পছন্দ য়ুরোপীয়ের চেয়ে আমেরিকান সমালোচক। তারা অনেক বেশী প্রফেশনাল। আর অধিকাংশই সিনেমা জার্নালিজমের গ্রাজুয়েট। এরপরেই মৃদু হাসিতে ডোবানো মন্তব্য, নিজের দিকে তাকিয়ে।—

"বাই এ সিম্পল ল অফ লাইফ, উই কোয়োয়েট ইজিলি এ্যাডাপট নোশনস দ্যাট সার্ভ আওয়ার পারপাস। এ্যাণ্ড ইট ইজ ট্রু দ্যাট আমেরিকান ক্রিটিক হ্যাভ বিন মোর পজিটিভ এ্যাবাউট মাই ফিল্মস দ্যান মাই কমপ্যাটরিয়ট হ্যাভ বিন।" অবশ্য নিউ-ইয়র্ক সমালোচকদের সম্পর্কে আবার হলিউডী পরিচালকেরা অসন্তুষ্ট। কারণ নিজের দেশের হোমরা-চোমরা ছবির চেয়ে বিদেশের কোনো একটা ছোটোখাটো ছবির দিকেই তাদের যেন টান-ভালবাসা। অভিযোগটা সত্যি। কিন্তু এতে রাগ করার কিছু নেই। কারণ, ত্রুফো জানাচ্ছেন, আমেরিকার ছবি প্যারিসে এলে ঠিক ঐ রকমই ঘটবে। এটা মানুষের মজ্জাগত স্বভাব, যা বাইরের জিনিশ তার গলায় এই অতিরিক্ত সমাদরের সোনার হারটি পরিয়ে দেওয়া।

ত্রুফোর প্রবন্ধটি সত্যিই আশ্চর্য করে দেয় আমাদের। সত্য উচ্চারণে এমন দ্বিধাহীনতা যেন নিদর্শনহীন। একই সঙ্গে তিনি সমালোচক এবং পরিচালকের পক্ষে এবং বিপক্ষে। তাঁর সমগ্র রচনার সুস্বাদ এখানে ছড়িয়ে দেওয়া অসম্ভব। অল্প একটু আভাসই কেবল তুলে ধরা গেল এখানে। এবার আমরা শুনবো তাঁর শেষ মন্তব্য।

"একজন শিল্পীর সব সময়েই মনে রাখা উচিত যে কথাটা সেটা রেপুটেশন। বহু বছরের শ্রমে তিনি যে খ্যাতি অর্জন করেছেন, কোনো একটা বিরূপ সমালোচনাতেই সেটা ধসে পড়বে, এমন ভাবনাটা ভ্রান্ত। জন্মের মুহূর্তে 'সিটেজেন কেন' থেকে শুরু করে অরসন ওয়েলস-এর সব ছবিকেই মুখোমুখি হতে হয়েছিল তীব্র সমালোচনার। কিন্তু

পরিণামে অরসন ওয়েলস-এর সম্মান আজ সারা পৃথিবীতে অক্ষয়। একথা বুনুয়েল এবং বার্গম্যানের বেলাতেও সত্যি, একদা স্বদেশে-বিদেশে অন্যায় সমালোচনার শিকার হয়েছিলেন যাঁরা।"

আমার একাধিক হবির মধ্যে একটা হল, যে-কোন বিষয়ে ভালো মন্তব্য চোখে পড়লে, খাতায় টুকে রাখা। যখন ব্যস্ততার মধ্যে হাত খাতা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না, তখন তুলে রাখি মনের কুলুঙ্গিতে। ত্রুফোর এই বই-খানার কয়েকটা পাতা পড়েই যখন বুঝলাম, এর মধ্যে 'কুড়িয়ে-জমিয়ে রাখার মতো অজস্র মনি-মুক্তো, তখনই হাত বাড়িয়েছিলাম নোটবইয়ের দিকে। কিন্তু আরও দু-চার পাতা পড়ার পর বুঝলাম, এ হল সমুদ্রের কিনারে ঝিনুক কুড়োনোর মতো, যার শেষ নেই, যা ফুরোবার নয়। টুকতে গেলে গোটা বইটাই টুকে রাখতে হয়। ফুল ভালোবাসি বলে পথের ধারের বাগান থেকে টুক্ করে একটা গোলাপ কি দুটো বেল তুলে নিতে পারি। কিন্তু একটা ফুটন্ত বাগান হাতের মুঠোয় ভরবো কি করে? পাঠক হয়তো ভাবছেন, এসব অত্যুক্তি। ত্রুফো তো লিখেছেন চলচ্চিত্রের সমালোচনা। তাতে কি এমন কথামৃত থাকতে পারে, যা স্বাদে অনন্য এবং সংখ্যায় অগণ্য? এই সন্দেহটাই স্বাভাবিক। কারণ চিত্র-সমালোচনা বলতে আমরা আজন্ম আমাদের দেশে যা পড়ে থাকি, সেটা খবরের কাগজের নিত্য-নৈমিত্তিক রিপোর্টের চেয়ে আর কোনো উচ্চতাকে ছুঁতে পারেনি কখনো। সেখানে অক্ষর আছে, কিন্তু উপলব্ধি নেই। মন্তব্য আছে, কিন্তু মননে স্নাত নয়। সে-সব লেখার অধিকাংশই অপাঠ্য, আর যে-গুলো পাঠ্য তা একবার চোখ বোলানোর পক্ষেই যথেষ্ট। মনে রাখার পক্ষে মারাত্মক।

ত্রুফোর সমালোচনার জাত আলাদা। কোনো নির্দিষ্ট পত্রিকার পাতা-ভরানোর দায় থেকে জন্ম নয় তাদের। নিজেকেই যেন বেশী করে জানার তাগিদে কাগজে-কলমে উচ্চারিত হয়ে আত্মমগ্ন স্বগত-ভাষণ। সমালোচক হিসেবে তাঁর ভূমিকা অভিভাবকের নয়, আত্মীয়ের। তাঁর ছবি দেখা যেন পর্দার বাইরে বসে নয়, ভিতরে ঢুকে গিয়ে। নীচে তারই অল্প কিছু উদাহরণ।

চ্যাপলিন প্রসঙ্গে—

১। ঠিকই, চার্লি আর আজকাল আমাদের হাসান না। তার

বদলে, আমাদের হাসি জোগান চার্লির সমালোচকেরা।

২। 'এ কিং ইন নিউ ইয়র্ক'-কে যদি এমিউজিং মনে না হয়, তার কারণ জো ম্যাকার্থির আমেরিকা আমাদের সামনে তুলে ধরেছে একটা অসুস্থ পৃথিবী। এটা একটা আত্মচরিতমূলক ছবি, আর এখানে আত্মসন্তুষ্টির অবকাশ নেই। যা আশা ছিল, ওখানে যদি তার চেয়ে জীবনের অনেক মর্মান্তিক চেহারা দেখতে পাই, তার কারণ চ্যাপলিন জেনেছেন যে বর্তমান সময়ের সবচেয়ে যন্ত্রণাময় সমস্যা দারিদ্র নয়, প্রগতির নামে ক্ষতিকরতা নয়, বরং সাংবাদিকের স্বাধীনতার উপরে সুপরিকল্পিত আক্রমণ।

৩। তাঁর ছবি দু ভাগে ভাগ করা। ভ্যাগাবন্ড আর পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত মানুষ। প্রথম জনের প্রশ্ন, আমি কী জীবিত? দ্বিতীয় জনের, আমি কে? চ্যাপলিনের সমস্ত শিল্পসৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু, দা কোয়েশ্চন অব আইডেনটিটি!

জন ফোর্ড সম্পর্কে—

১। ফোর্ড ছিলেন সেই ধরনের 'শিল্পী', একজন কবি যিনি কখনো উচ্চারণ করেননি 'কবিতা'।

২। অনেকটা রাজকীয় ভঙ্গীতেই যেন, জন ফোর্ড জানতেন জনতাকে হাসাতে হয় কি ভাবে অথবা কাঁদাতে, আর যা তিনি জানতেন না সেটা হল তাদের বিরক্ত করতে হয় কী ভাবে।

জঁা রেনোয়া প্রসঙ্গে—

১। রেনোয়া হ্যাজ নেভার ফিল্মড স্পীচেস, জাস্ট কনভারসেশন।

২। রেনোয়ার সমস্ত সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে যা সেটা এক ধরনের গূঢ় রহস্য, বলতে পারি প্রফেশনাল সিকরেট : দরদ।

৩। য়ুরোপীয়ান আর হলিউডী সিনেমার মধ্যে প্রধান পার্থক্য হল, অতলান্তিকের দু পারেই যা রেনোয়ার ছবি সম্বন্ধেও সত্য। আমাদের ছবি প্রধানত ব্যক্তিকেন্দ্রিক, হলিউডের হল নির্দিষ্ট ঘটনার। ফ্রান্সে, আমাদের সহজাত প্রবৃত্তি আপাত-প্রতীয়মান সত্য আর মনস্তাত্ত্বিকতার দিকে। সেখানে আমেরিকানরা ভীষণ পছন্দ করে কি ঘটছে তার দিকে ঝুঁকে থাকতে, স্থান এবং কালকে নিয়ে, আর ঘটনা থেকে এক বিন্দু না সরে। যেহেতু একটা ছবি ছ' হাজার ইঞ্চি লম্বা একটা

সেলুলয়েডের ফিতে ছাড়া আর কিছু নয়, আমাদের চোখের সামনে দিয়ে যার আসা-যাওয়া, একে তুলনা করা যায় ভ্রমণের সঙ্গে। তাই বলতে পারি একটা ফরাসী ছবি এগিয়ে চলে অনেকটা হালকা গাড়ির মতো, খোলা-হাওয়ার পথে, আর আমেরিকান ছবি দৌড়োয় অনেকটা ট্রেনের মতো ধরা-বাঁধা লাইনের উপর দিয়ে। 'দি উওম্যান অন দা বীচ' একটা ট্রেন-ছবি।

৪। অনেকটা প্রতিবাদী সুরের মতো সংলাপ যেদিন চরিত্রদের মনের ভাবনার ভিতরে আমাদের প্রবেশের অধিকার দিল, তার আগে সিনেমা কখনো পুরোপুরি খাঁটি, পুরোপুরি নিজের ছিল না।

৫। রোনোয়া আইডিয়াকে নিয়ে ফিল্ম বানান না, বানান সেই সব নারী বা পুরুষকে নিয়ে যাদের আইডিয়া আছে।

ব্রেসোঁ প্রসঙ্গে—

১। ব্রেসোঁ ইজ এ্যান অ্যালকেমিস্ট ইন রিভার্স। তিনি গতি দিয়ে শুরু করেন যাতে পৌঁছতে পারেন স্থিরতায়। তিনি সোনা চেলে খোঁজেন বালি মিলবে কতটা।

২। ট্রাডিশনাল চিত্রপরিচালনার সঙ্গে ব্রেসোঁর ঠিক ততখানি ফাঁক, যতখানি ডায়ালগ এবং ইনটেরিয়র মনোলগের মধ্যে।

৩। সিনেমা-শিল্প সম্বন্ধে অনেক আবিষ্কারই এখনো বাকি, তার কিছু খুঁজে পাওয়া যাবে (ব্রেসোঁর) 'অ্যা কঁদমনে'।

কক্‌তো প্রসঙ্গে—

১। ডাইরেকশন হল চিত্রনাট্যের সমালোচনা, আর সম্পাদনা হল ডাইরেকশনের সমালোচনা।

২। কক্‌তোর কাছে সুখী মুহূর্ত যখন শ্যুটিং শুরু হয় তখন নয়, যখন জন্ম নেয় আইডিয়া। "আঃ, আমি এখন শ্যুটিং করবো সেই দৃশ্যের যেখানে কবি মুখোমুখি হবে কবির।"

জ্যাক তাতি প্রসঙ্গে—

১। তাতি, ব্রেসোঁর মতোই, ছবি করার সময় সিনেমাকে আবিষ্কার করে নেন, অন্যদের গড়া কাঠামো তাঁর কাছে বর্জনীয়।

বার্গম্যান প্রসঙ্গে—

১। তাঁর নারী চরিত্রেরা সীমাহীনরূপে সূক্ষ্ম, আর পুরুষ চরিত্রেরা প্রথাগত।

২। বার্গম্যানের শিক্ষা তিন দফা: সংলাপের স্বাধীনতা, ইমেজের আমূল পরিচ্ছন্নতা, আর মানুষের মুখাবয়বকে (অর্থাৎ ক্লোজ আপ) সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।

৩। বার্গমানের গোড়ার দিকের ছবিতে এসেছে সামাজিক সমস্যা, দ্বিতীয় পর্বে তাঁর বিশ্লেষণের পদ্ধতি হয়েছে ব্যক্তিগত, চরিত্রদের অথবা আত্মার ভিতরে গভীর চোখে তাকানো। আর শেষ কটা বছরের কাজে প্রধান হয়ে উঠেছে ভালো এবং মন্দের দ্বন্দ্ব আর মেটাফিজিক্স।

৪। তাঁর ইমেজের শুদ্ধতার কথা ভাবুন। কিছু পরিচালক আকস্মিকতাকে ঢুকতে দেন তাঁদের ইমেজে—সূর্য, চলমান পথিক, একটা সাইকেল (রসোলিনি, লেলুচ, হাসটন জাতীয় পরিচালকেরা)। অন্যেরা শাসন করতে চান পর্দার প্রত্যেকটা ইঞ্চি (যেমন আইজেনস্টাইন, ল্যাং, আর হিচকক)। বার্গম্যান আগে ছিলেন প্রথম পক্ষে, পরে বদলেছেন শিবির। তাঁর সাম্প্রতিক ছবিতে আপনার দৃষ্টি অন্য কোনো দিকে আকৃষ্ট হবে না কখনো, একজন পথযাত্রী এমন কি বাগানের একটা পাখির দিকেও। তাঁর ক্যানভাসে বার্গম্যান যা চান তার বাইরে আর কিছুরই ঠাঁই নেই।

বার্গম্যানের মুখ ও মুখোশ

"অগ্নি, যজ্ঞের পুরোহিত এবং দীপ্তিমান, অগ্নি, দেবগনের আহ্বানকারী ঋত্বিক এবং প্রভু রত্নধারী ; আমি অগ্নির স্তব করি।"

কেউ কেউ মনে করেন, তিনি মানুষ নন। দেবতা। কেউ কেউ মনে করেন তিনি দানব অথবা শয়তান। অন্য কারো কারো মনে হয় তিনি আধখানা মানুষ, বাকি আধখানা নেকড়ে। মানুষ অথবা সভ্যতাকে উপহার দেওয়ার জন্যে কি খুঁজছেন তিনি? কেউ মনে করেন অমৃত, কেউ বিষ। অন্য কেউ কেউ হতাশা এবং বিপন্নতাবোধ। শুদ্ধ জ্ঞান এবং স্বচ্ছ বিবেকের কথাও মনে পড়ে কারো কারো। তাঁর এক অন্তরঙ্গ বন্ধু বলেছিলেন অবশ্য ভিন্ন কথা: বার্গম্যান খুঁজছেন ঈশ্বরকে আর ঈশ্বর খুঁজছেন বার্গম্যানকে।

পৃথিবীর চলচ্চিত্রে এখন সবচেয়ে সম্মানিত নয় শুধু, সবচেয়ে জটীল নামটিই হল বার্গম্যান। কিংবা বার্গম্যান কোনো নাম নয়, বিরাট জিজ্ঞাসা চিহ্ন। তাঁর চলচ্চিত্র যেন দেখার নয়। দর্শনের। আর সে চলচ্চিত্রের মুখোমুখি হলে আমরা আক্রান্ত হই বিশ্লেষনহীন এক বোধে। আমরা স্থাপিত হই এমন এক কেন্দ্রে যার উর্দ্ধে আকাশ এবং ঈশ্বর, নিম্নে নরক এবং শয়তান, দক্ষিণে অমোঘ মৃত্যু, বামে অব্যাহতিহীন জীবন। মানুষকে কোনো বিশেষ আবেগে উদ্বুদ্ধ অথবা

বিশেষ আদর্শে দীক্ষিত করার জন্যে তাঁর চলচ্চিত্র নির্মান নয়। তিনি শুধু আমাদের চেতনায় সংক্রামিত করে দিতে চান এক গভীর সতর্কতা এবং সংকটের উপলব্ধি। কিংবা তিনি হয়তো এর চেয়েও নির্মম, হয়তো নির্বিকার এক হত্যাকারী। নিজের সৃষ্টি সম্বন্ধে হয়তো অনায়াসেই উচ্চারণ করতে পারেন তিনি ফক্‌নারের কাছ থেকে গ্রহণ করা শিক্ষা: তোমার সমস্ত প্রিয় কিছুকে হত্যা করো।'

শক্ত হাড়ের কাঠামো দিয়ে তৈরী তাঁর মুখের দুটো দিক নাকি দু-রকম। ডান দিকটা মৃত্যুর মত শীতল এবং স্থির। বাঁ দিকটা রক্তের মতো উজ্জ্বল ও উষ্ণ। তিনি নাকি বাঁ চোখেই দেখতে পান বেশি। বেশি শোনেন বাঁ কানে। তাঁর হাসিও নাকি নানারকম। যদিও বেশির ভাগ সময়ই তা বিষন্ন, ভয়াবহ কোনো স্বপ্ন দেখে জেগে-ওঠার পরের শূন্যতা দিয়ে ঢাকা। আবার কখনো ভালোবাসায় দীপ্ত। ক্রুদ্ধ এবং ক্ষীপ্ত হয়ে উঠতে তাঁর সময় লাগে সবচেয়ে কম। তখন তিনি মারাত্মক। যে-কোনো ধ্বংসের জন্যে অবিচলিতরূপে প্রস্তুত। অনায়াসে ছুঁড়ে দিতে পারেন হাতের টেলিফোন। টি. ভি. সেট ঝমঝমিয়ে ভেঙে যেতে পারে তাঁর ছুঁড়ে-মারা চেয়ারের ঘায়ে। ব্যবসার বিষয়ে তিনি বুর্জোয়া। আর প্রেমের ব্যাপারে প্রচণ্ড বোহেমিয়ান। বিয়ে করেছেন মোট পাঁচবার। যাদের সঙ্গে ঘটে যায় বিচ্ছেদ, তাদের সঙ্গে অনুরাগের শেষ বাঁধনটুকু কিন্তু ছেঁড়ে না কখনো। 'ক্রাইস অ্যাণ্ড হুইসাপর'-এ কোনো না কোনো ভাবে অংশ নিয়েছেন তাঁর প্রত্যেকটি পূর্ব পত্নী। পঞ্চম পত্নী ইনগ্রিড এ ছবিতে তাঁর সহকারী! চতুর্থ পত্নী বাজিয়েছেন আবহসঙ্গীতের পিয়ানো। যদিও বিবাহিত স্ত্রী নন, তবু বার্গম্যানের জীবনে লিভ উলম্যানের ঠাঁই অনেকটা জায়গা জুড়ে। প্রথম আলাপ ১৯৬৫ তে। ১৯৬৬-র ছবি 'পার্সোনা'-য় তিনি পেয়ে গেলেন একটা প্রধান চরিত্র। তারপরের ছবি 'দি সেম'-এও। পরে 'ক্রাইস এ্যাণ্ড হুইসপারে'। 'সীন্‌স ফ্রম এ ম্যারেজ'-এও লিভই নায়িকা।

দুজনের গাঢ় অন্তরঙ্গতার পরিনামে একদিন লিভের গর্ভে বার্গম্যানের সন্তান। লিভ লজ্জিতা নন বিন্দুমাত্র। স্বগর্বে জানালেন—

'আমিই এটা ঘটতে দিয়েছি। এটা কোনো অন্যায় নয়। আমি খুশি।'

লিভের নিজের দেশ নরওয়েয় এ নিয়ে তীব্র গুঞ্জন, তীব্রতর গঞ্জনা। কারো পরামর্শ, ঐ অবৈধ কন্যাকে ফেলে আসা হোক বনে। কারো উপদেশ, লিভের উচিৎ আত্মহত্যা করা। একটা বেশ্যার মর্যাদায় বেঁচে কি লাভ? এত ধিক্কারেও লিভের মুখে স্বচ্ছন্দ উচ্চারন—

"বার্গম্যান আমাকে দিয়েছেন আত্মবিশ্বাস, যা আগে আমার ছিল না। তিনি আমাকে পরিণত করেছেন শিল্পী হিসেবে। আমি খুঁজে পেয়েছি আমার আত্মপরিচয়। আমার বিবাহিত জীবন ছিল সংকীর্ণ।"

লিভের স্বামী ডাক্তার, মনোবিকলনবিদ্। নাম, হ্যাসান জাকেব স্ট্যাং। লিভের চেয়ে পাঁচ বছরের বড। তাঁরা দম্পতী ছিলেন পাঁচ বছরের। তারপরেই বিচ্ছেদ। লিভ ছিলেন মঞ্চাভিনেত্রী। বার্গম্যানের সঙ্গে পরিচয়ের পর থেকে চলচ্চিত্রের অদ্বিতীয়াদের অন্যতমা।

মাঝে মাঝেই মৃত্যুভয় গ্রাস করে বার্গম্যানকে। প্রত্যেক বসন্তকালে স্টকহল্মের কোনো হাসপাতালে আত্মগোপন করা তাঁর নিয়মিত অভ্যেসের একটা। তাঁর মনে হতো তিনি আলসারে আক্রান্ত। কিছুদিন চলতো এই কল্পিত আলসারের চিকিৎসা। হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে-শুয়েই তিনি তখন ডিকটেশন দেন চিত্রনাট্যের। এই-ভাবেই জন্ম তাঁর এক স্মরণীয় ছবি 'পার্সোনা'-র। ১৯৬৪-তে 'নাউ এ্যাবাউড দি উওম্যান' ছবির পর হাতে কোনো ছবি নেই। ছিল কেবল একটা চিত্রনাট্য, 'দি ক্যানিবল্স'-এর। চারঘণ্টার ছবি। সেই সময়েই অসুখ। প্রথম ঠাণ্ডা লাগা। পরে জ্বর। তারপর সেটা গড়িয়ে নিউমোনিয়ার দিকে। তখন রয়্যাল ড্রামাটিক থিয়েটারের পরিচালক। সেখান থেকে তিনমাসের ছুটি নিয়ে হাসপাতালে। শরীর ভাঙা। লিখবার বা পড়বারও ক্ষমতা নেই। টি, ভি-র দিকে পর্যন্ত পারেন না তাকাতে। ঘাড ঘোরালে মাথা ঘোরে। শুধু শরীরের নয়, ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন অনুভূতিরও। শুধু মাঝে মাঝে নির্দেশে পাঠান থিয়েটার সংক্রান্ত কাজকর্মের।

সেই সময়ে একদিন দেখা করতে এলেন বিবি অ্যাণ্ডারসন। সঙ্গে নরওয়ের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের একটা দল। তারা স্টকহল্মে এসেছে শিক্ষা-সফরে। দলের মধ্যে একটি মহিলার উপর দৃষ্টিটা আটকে গেল তাঁর। প্রশ্ন করলেন:

—তুমি কি আমার পরের ছবিতে কোনো চরিত্রে অভিনয় করবে ?

মহিলা রাজী।

বার্গম্যান 'দি ক্যানিবল্‌স'-কে নিয়ে ভাবছেন কি ভাবে কোন চরিত্রে খাপ খাওয়ানো যায় ঐ মহিলাটিকে। এর বেশ কিছুদিন পর প্রিয় বন্ধু ডাক্তার স্টুর হেলাণ্ডার-এর বাড়িতে বসে আছেন। ডাক্তার তাঁকে দেখাচ্ছেন নিজের তোলা স্লাইড। হঠাৎ একটা স্লাইড দেখে চমকে উঠলেন তিনি। বিবি অ্যাণ্ডারসন আর সেই মহিলা। দুজনেই যেন একই রকম দেখতে। একে অপরের প্রতিবিম্ব। সেই মুহূর্ত থেকেই মাথায় জুড়ে বসল অন্য এক চিত্রনাট্য সম্বন্ধে চিন্তা, দুটি নারীর একাত্মতা নিয়ে। "something about two people who lost their identity in each other." এই ভাবেই 'পার্সোনা-র জন্ম।

আর বার্গম্যানের জীবনে সেই মহিলার আগমন, যার নাম লিভ উলম্যান।

পরবর্তীকালের এক সাক্ষাৎকারে বার্গম্যান এ-ছবির জন্মকাহিনী সম্বন্ধে বলেছিলেন—

"একদিন আমি আমার সামনে দুজন মহিলাকে দেখেছিলাম। মহিলা দুজন কাছাকাছি বসে একে অন্যের হাতের সঙ্গে নিজের হাত মিলিয়ে দেখছিলেন। আমি তখন ভেবে নিয়েছিলাম এদের মধ্যে একজন মূক, একজন অবশ্যই কথা বলতে পারে। এই দেখা এবং ছোট্ট ভাবনাটি পুনরায় ঘুরে এল আমার মনে। আমি ভাবলাম এবং অবাক হলাম ভেবে, কেন এই চিন্তা আসছে বারবার ? সে কি এই কারনে যে আমি এর থেকেই শুরু করতে পারি আমার কাজ ? এখন আমি বুঝতে পারছি ঐ দৃশ্যের নেপথ্যে রয়ে গেছে অনেক কিছুই। এটা যেন কোন দরজার উপরে রাখা কোনো একটা দৃশ্য। আপনি যদি যত্ন করে দরজাটি খোলেন তাহলে দেখবেন একটা লম্বা বারান্দা ক্রমশ চওড়া হয়ে যাচ্ছে। দেখবেন তখন দৃশ্যগুলি আপনা থেকেই অভিনীত হতে শুরু করেছে। মানুষ কথা বলছে এবং ঘটনা দুদিক থেকেই ঘটতে আর এগোতে শুরু করেছে।"

এই 'পার্সোনা' থেকেই লিভ উলমান আর বার্গম্যান দুই সত্তা মিলেমিশে একাকার।

"বার্গম্যান কাজকর্মে বিদ্রোহী শিশুর মত। অত্যন্ত অভিমানী, আবেগপ্রবন, অত্যধিক সংবেদনশীল, সহজেই রুষ্ট, সন্দেহপ্রবন, জেদী, একগুঁয়ে, খামখেয়ালী, তাঁর ইচ্ছাশক্তি প্রবল।"

এই মন্তব্য সেভ্‌নস্‌ক ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রীর সভাপতি আন্দ্রে ডিমলিং-এর, বার্গম্যানদের প্রতিষ্ঠার পিছনে যাঁর উৎসাহ এবং প্রেরণার পরিমান বিপুল। এদের বন্ধুত্ব, নানা বিরোধ বা মতানৈক্য সত্ত্বেও, দীর্ঘস্থায়ী এবং নিবিড়। ডিমলিং-এর বর্ণনায় আমরা যে বার্গম্যানকে দেখতে পাই তা পরস্পরবিরোধীতায় পরিপূর্ণ। তবুও এ-তালিকায় আরও কিছু বিশ্লেষণ অনুপস্থিত, যার সম্পর্কে সত্য মন্তব্য করার অধিকার শুধু তাদেরই যারা বেশ কয়েক বছর ধরে বসবাস করেছেন তাঁর জীবনে অথবা সংসারে। সবচেয়ে আশ্চর্য, বার্গম্যানের কোনো স্ত্রীই বিয়ে করেননি বিচ্ছেদের পর। কেন? উত্তর, আমরা অবসন্ন। মনে হবে বার্গম্যান বুঝি তাদের সমস্ত প্রানশক্তিকে গ্রাস করেছেন গণ্ডুষে। অথচ এই মহিলাদেরই যদি প্রশ্ন করা হয়, আপনারা কি এখনো বন্ধু রয়ে গেছেন বার্গম্যানের, উত্তর আসবে, হ্যাঁ। যদি প্রশ্ন করা হয়, প্রেমিক হিসেবে তিনি কেমন, উত্তর পাওয়া যাবে, প্রেমিক হিসেবে তিনি জলন্ত আগুন। কিন্তু হৃদয়? সে তো বরফের মতো ঠাণ্ডা।

আর স্বয়ং বার্গম্যানকে যদি প্রশ্ন করা হয় তাঁর জীবনের ভূতপূর্ব রমনীদের প্রসঙ্গে, তিনি জানাবেন "প্রত্যেকটি নারীই, যারা আমার জীবনকে স্পর্শ করেছে, তাদের প্রত্যেকেই আমাকে মুগ্ধ করে। আমি চাই এদের দু-একজনকে আমি হত্যা করি, অথবা তারা কেউ আমাকে হত্যা করুক।"

বার্গম্যানের ব্যক্তিগত জীবনের অনেকখানিই তাঁর চলচ্চিত্রে। হয়তো সেই কারনেই তাঁর ছবি সম্পর্কে ওঠে মরবিডিটির এমনকি ভালগারিটির অভিযোগ। সুইডেন এবং পশ্চিম জার্মানীতে তাঁর 'দি সাইলেন্স' মুক্তি পাবার প্রশ্নের ঝড় ওঠে শুধু পত্র-পত্রিকায় নয়, দু-দেশের পার্লামেণ্টেও। প্রশ্নগুলো এই রকম—

১॥ এ ছবি শিল্প না পর্ণোগ্রাফী?

২॥ সমাজ-প্রতিফলনের নামে যৌন সঙ্গম ও যৌন ব্যাভিচার দেখানোর

অধিকার পরিচালকের আছে কি ?

৩ ॥ এটা নগ্ন ছবি, না সমাজের নগ্ন চেহারা ?

৪ ॥ সমাজের পক্ষে এ ছবি ক্ষতিকারক কি ?

৫ ॥ সেন্সার বোর্ডের হস্তক্ষেপ করা উচিত ছিল কিনা ?

সুইডিশ সেন্সার বোর্ডের রায়—

"সরকারী সেন্সার বোর্ডের কাজ কেবল কোনো শিল্প কর্মকে কাটা-ছেঁড়া করার নয়। আমরা বার্গম্যানের ছবিতে কাঁচি চালাতে পারি না। এ ছবির যৌন দৃশ্যগুলো জীবনেরই অখণ্ড অভিব্যক্তি, সমগ্র ছবির সঙ্গে মিশে গেছে অসম্ভব স্বাভাবিকতায়। এমন হলে তো গ্রীস ভাস্কর্য থেকে পুরুষাঙ্গ কেটে বাদ দিতে হয়। কিংবা শেক্‌সপীয়রের কিছু কিছু অংশ।"

'দি সাইলেন্স' যখন সেন্সার করা হয় তখন সুইডিস সেন্সার বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন ছুটিতে। ফিরে এসে ছবি দেখে তাঁর মন্তব্য—

"পর্ণোগ্রাফী আর শিল্পকর্মের মধ্যে সীমা নির্ধারণ করার জ্ঞান মানুষের থাকা উচিত। একটা সত্য, যা স্বাভাবিক জীবনের দৃশ্য এবং সমগ্র ছবির অংশবিশেষ, তা কখনো পর্ণোগ্রাফী হতে পারে না। যদি এ ছবি থেকে কিছু টুকরো টুকরো অংশ কেটে দেখানো হতো, তবে তা পর্ণোগ্রাফী হতে পারতো।"

বার্গম্যানের নিজের উত্তর—

"সেন্সার যদি আমার ছবির এক টুকরো কাটতো, তবে আগুন ধরিয়ে দিত আমার মনে। আমার শিল্পকর্মের উপর হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই কারো। আমি মেনে নিই সেই সেন্সারকে, যা শিল্পীর নিজের ভিতরেরই সংযম ও শক্তি। যাঁর শিল্পকর্ম, আর যিনি পূর্ণ-মাত্রায় স্বাধীন, বাইরের কোনো প্রকার ইঙ্গিত তাঁর পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

যদি শিল্পী নিজে না চান, তবে তাঁর সত্যিকারের শিল্পকর্মের এতটুকু অংশও কাটার অধিকার নেই কারো।"

—এ কি সেই ঝাঁকুনি দিয়ে আর একটা ঝাঁকুনিকে জাগানো ?

ডেনমার্কের জনৈক সাংবাদিক যখন এই প্রশ্ন নিয়ে বার্গম্যানের মুখোমুখি, তাঁর উত্তর—

"হ্যাঁ, ঠিক তাই। সব চেয়ে বড় প্রয়োজন যা তা হল মানুষের নিজেরই তার নিজের আন্দোলনকে বুঝতে পারা, তার আত্মার উদার দিগন্তে এক নতুন আলোকে বহন করে আনায়।

আমি মনে করি মানুষের মনের গভীরে তার চিন্তা, দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, আত্মসমালোচনা আর নতুন ভাবে জীবনে ঝাঁপিয়ে পড়ার শক্তি, তাকে সর্বতোভাবে উজ্জীবিত করার দায়িত্ব নাটক আর চলচ্চিত্রই গ্রহণ করতে পারে সবচেয়ে বেশি।"

পশ্চিম জার্মানীর 'The welt' পত্রিকা একটা বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করেছিল বার্গম্যানের 'দি সাইলেন্স' ছবির প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে। একজন সমালোচক তাঁর রচনা শুরু করেছিলেন কিয়েকেগার্ডের এই উক্তি দিয়ে—
"জীবনের যত বেশি গভীরে যিনি যত চিন্তান্বিত, তিনি তত বৃহৎ মানুষ।"

বার্গম্যান পৃথিবীর চলচ্চিত্রে আজ যে বৃহৎ মানুষ হিসেবে নিঃসংশয়ে প্রতিষ্ঠিত, তার কারণ জীবনের গভীরেই তাঁর অন্বেষণ। বাইরের বাস্তবতার সমস্যা নয়, তাঁকে আলোড়িত করে মানুষের অস্তিত্বের অভ্যন্তরের সংকট। তাই প্রায়শই দেখা যায় তাঁর চরিত্রেরা রক্ত-মাংসের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও, শেষ পর্যন্ত হয়ে যায় কোনো না কোনো জিজ্ঞাসার প্রতীক। সে জিজ্ঞাসা কখনো ঈশ্বর সম্বন্ধে মানুষের। কখনো ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধের। কখনো মানুষের অস্তিত্ব বিকাশের পক্ষে অন্তরায় অশুভ শক্তির। কখনো বা সেই আত্মদীর্ণ ক্রন্দনের, যা ঝরিয়েই মানুষকে ধুয়ে-মুছে নিতে হয় নিজের নিজের মুক্তির বেদী। ক্রমশ এক জিজ্ঞাসা থেকে আরেক গভীরতর জিজ্ঞাসার পথে তাঁর প্রস্থান তাই বুঝতে পারি কেন তিনি বলেন—

"সবচেয়ে মারাত্মক পথগুলিই হাঁটার একমাত্র পথ।"

আর মারাত্মক পথে হাঁটার এই আজন্ম প্রবণতার পরিণামে তাঁর সমস্ত সৃষ্টির ভিতরে রয়ে যায় এমন উত্তরহীন প্রশ্নের অগ্নিকণা, যার দিকে তাকিয়ে চোখ ধাঁধিয়ে যায় আমাদের। আমরা ফেটে পড়ি বুঝতে পারা না-পারার তীব্র-ঝংকারে। কলমে কলমে ঝলসে ওঠে সমালোচনা। মুখে মুখে স্তব যত, তিক্ত বিদ্রূপও ততোধিক। কিন্তু শেষ সিদ্ধান্ত এসে পৌঁছয় এইখানে—

"Like a cinematic Midas, he turns dross to gold,"

সংবাদপত্রে হঠাৎ এই সংবাদে তাঁর ছবির মুগ্ধ দর্শক মাত্রেই বিষন্ন : বার্গম্যান আর ছবি করবেন না। দুটি-একটি নির্ধারিত ছবির কাজ শেষ হলেই, এই প্রিয়-মাধ্যম থেকে তাঁর নাকি চিরবিদায়।

বার্গম্যানকে আমরা চোখে দেখিনি। কিন্তু যেদিন প্রথম তাঁর 'সেভেনথ সীল'-এর সঙ্গে পরিচয়, সেদিন থেকেই তিনি আমাদের আত্মীয় এবং অভিভাবক। একথা আদৌ সত্য নয় যে, তিনি যেভাষায় কথা বলেন, তা তৎক্ষণাৎ বুঝে যাই আমরা। বরং ঘটে উল্টোটাই। তাঁর ছবি যখন শেষ হয়, নীরবে, নিরুচ্ছাস মন্তব্যে, মাটির দিকে মাথা নুইয়ে, যেন বিশাল সব প্রশ্নের পাথর ঘাড়ে নিয়ে ঘরে ফিরতে হবে এই রকম বিপন্নতায় ভারাক্রান্ত চেতনাকে টানতে টানতে আলোকিত পৃথিবীর অন্ধকারে এসে দাঁড়াই। পরে মনে হয় আমরা ফিরে আসছি কোনো প্রার্থনা সভা থেকে। তাই কি? না বোধ হয়। আমরা ফিরে আসছি এমন এক স্যানাটোরিয়াম থেকে, যেখানে আমরাই শুয়েছিলাম অসুখের শয্যায় সাদা চাদরে মুড়ি দিয়ে আর বার্গম্যান ভালোবেসে খুলে দিয়েছেন সেই দরজাটা, যাতে মৃত্যুর বিছানায় শুয়েই জীবনের যাবতীয় পতন-অভ্যুদয়ের দৃশ্য দেখে নিতে পেরেছি আমরা।

নিজের জিজ্ঞাসা-জর্জর শিল্পে তিনি আমাদের জন্যে যা সাজিয়ে দিয়েছেন, তা এই পৃথিবীর ভিতরেই আরেক বিশাল পৃথিবী যেন।

নির্ঘণ্ট